জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গ

জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গ

সম্পাদনা

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র

জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গ
সম্পাদনা: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্রকাশক
সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র
দক্ষিণ ক্যাম্পাস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-৪৩৩১
০১৯৫৩৩২৩০৩০
connect.cscs@gmail.com
cscsbd.com

© সিএসসিএস

দ্বিতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০২০
প্রথম সংস্করণ: এপ্রিল ২০১৫

মূল্য
৩৫০ টাকা

JAMAATER SONGSKAR PROSONGA (Issues of Jamaat Reform), Edited by Mohammad Mozammel Hoque, Published by Centre for Social & Cultural Studies, South Campus, Chittagong University. Second Edition: April 2020, Copyright © CSCS. BDT 350.

উৎসর্গ

গঠনপর্ব হতে শুরু করে আগামী দিনের বাংলাদেশ প্রসঙ্গে
'ইসলাম' ও 'রাজনীতি'র অন্তঃসম্পর্ক পাঠে আগ্রহীদের উদ্দেশ্যে

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। পুনর্মুদ্রণের ব্যাপারে পাঠকদের কাছ থেকে তাগাদা ছিলো। নানান কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। অবশেষে, দীর্ঘ পাঁচ বছর পর বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে ভালো লাগছে।

এ সংস্করণে ২০০১০ সালে সংঘটিত ছাত্রশিবিরের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে জামায়াত নেতাদের ভূমিকা প্রসঙ্গে জামায়াতের সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল প্রয়াত মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের একটি চিঠি সংযোজন করা হয়েছে। জামায়াতের আরেকজন সাবেক সহকারী সেক্রটারি জেনারেল ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক জামায়াত থেকে পদত্যাগের প্রাক্কালে তৎকালীন জামায়াত আমীরকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, সেটিও এই বইয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও জামায়াত থেকে বহিষ্কৃত নেতা মজিবুর রহমান মন্জু কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে দলটির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে পাঠানো চারটি চিঠি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিতান্ত ভাষাগত বিচ্যুতি সংশোধনের বাইরে চিঠিগুলোতে অন্য কোনো সম্পাদনা করা হয়নি।

প্রথম সংস্করণে ‘রাজনৈতিক সংস্কার কৌশল’ শিরোনামের লেখাটি পরিশিষ্ট-১ হিসেবে সংকলিত ছিলো। এই সংস্করণে এটি তৃতীয় চ্যাপ্টার হিসেবে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

আশা করছি, আগ্রহী পাঠকদের জন্য নতুন সংস্করণটি কাজে আসবে।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০
দক্ষিণ ক্যাম্পাস
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
পরিচালক
সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বাংলাদেশ ও সমকালীন বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ইসলাম, রাজনীতি, ধর্মীয় রাজনীতি, রাজনৈতিক ইসলাম, মৌলবাদ, ইসলামী আন্দোলন– এ ধরনের কনসেপ্ট নিয়ে জানা ও গবেষণার কাজে যারা আগ্রহী হবেন তাদের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সিনিয়র সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের একটি চিঠি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গুরুত্বপূর্ণ দলীল হিসাবে বিবেচিত হবে।

প্রধানত যুক্তরাজ্য প্রবাসী জামায়াত নেতৃত্বের উদ্যোগে *'Bangladesh: Reclaiming the Narrative'* শীর্ষক একটি সংস্কার প্রস্তাবনা ২০০১ সালের পরে বাংলাদেশের শীর্ষ জামায়াত নেতৃবৃন্দের কাছে পেশ করা হয়। মুহাম্মদ কামারুজ্জামান কর্তৃক জেলখানা থেকে পাঠানো সুদীর্ঘ চিঠিটি দৃশ্যত এই ধারণাপত্রের আলোকে লিখিত। জামায়াত সংশ্লিষ্ট নানা মহলের সাথে যোগাযোগ করে ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধটির এক ধরনের অথেন্টিসিটির আভাস পাওয়া যায়। বিশেষ করে কন্টেন্ট বিবেচনা করে এই প্রবন্ধটিকে সংকলনে স্থান দেওয়া হয়েছে।

আলোচিত 'পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের' ঘটনা জামায়াত ঘরানার অনেকেই জানেন। এ নিয়েও প্রত্যক্ষ কোনো 'প্রমাণ' নাই। পরিশিষ্ট-১ এ গ্রন্থিত এ সংক্রান্ত কী-নোট পেপারটি নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে প্রাপ্ত। বিষয়টা নিয়ে নানা পর্যায়ে অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে মনে হয়েছে পাঠক ও গবেষকদের জন্য এটি প্রয়োজনীয় হতে পারে।

জেল থেকে পাঠানো জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের সংস্কার প্রস্তাবনা সম্পর্কে জামায়াতের জনশক্তির মাঝে স্বভাবতই ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতের মহিলা বিভাগের প্রধান শামসুন্নাহার নিজামী কোরআন-হাদীসের ব্যাপক উদ্বৃতিসহ *'বিবেচনায় আনতে হবে সবকিছু'* শিরোনামে একটা পাল্টা বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এই সাঁড়াশি আক্রমণে কামারুজ্জামানের সংস্কার প্রস্তাবনাটি ক্রমেই থিতিয়ে পড়ে।

জনাব শাহ আবদুল হালিমের *'Do Islamists Need a Way out?'* শীর্ষক এই প্রবন্ধটি নেতৃত্বকে সংগঠনের যুগোপযোগী সংস্কার গ্রহণের জন্যে সম্মত করানোর কাজে জামায়াতের বুদ্ধিজীবী মহলের দৃশ্যত ধারাবাহিক 'ব্যর্থতা'র অন্যতম নজীর। শীর্ষ জামায়াত নেতৃত্ব কখনো এসব সংস্কার প্রস্তাবকে ইতিবাচক হিসাবে বিবেচনা করেনি। বরং এ ধরনের লেখালেখিকে সুবিধাবাদিতা ও আপসকামিতা হিসাবে বিবেচনা করে তাদেরকে 'সাংগঠনিক রীতিনীতি ভঙ্গের' অভিযোগে তিরস্কার করেছে।

রিফর্ম ইস্যু নিয়ে এই পর্যায়ে সুপরিচিত আইনজীবী ও কেন্দ্রীয় জামায়াত নেতা ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক *'আরব বসন্ত ও দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলন'* শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। জামায়াত মহলে তাঁর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কারণে এবং জামায়াতপন্থী দৈনিক নয়া দিগন্তে প্রকাশিত হওয়ায় প্রবন্ধটি নিয়ে রীতিমতো হৈ চৈ পড়ে যায়। সংস্কারের এই ক্রমবর্ধমান চাপকে নিষ্ক্রিয় করার লক্ষ্যে এ পর্যায়ে পাল্টা বক্তব্য দিতে এগিয়ে আসেন অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ। জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় তিনি ব্যারিস্টার রাজ্জাক উপস্থাপিত সংস্কার প্রস্তাবকে খণ্ডন করে বক্তৃতা করেন। জামায়াত নেতৃত্বের মন-মানসিকতা বুঝার জন্য এটি সহায়ক হতে পারে। তিনি জামায়াতের সিনিয়র দায়িত্বশীল ছিলেন। আমৃত্যু তিনি ছিলেন জামায়াতের সম্ভবত একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক ফোরাম 'বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার'-এর পরিচালক। অঘোষিতভাবে তিনি ছিলেন জামায়াত-শিবিরের যে কোনো অভ্যন্তরীণ শীর্ষ পর্যায়ের নির্বাচনের একচ্ছত্র পরিচালনাকারী। ব্যক্তিজীবনে ছিলেন অত্যন্ত নির্মোহ। সংগঠনের ব্যাপারে ছিলেন 'সংগঠনবাদিতার' মূর্তপ্রতীক।

যাহোক, জামায়াতের সংস্কার ইস্যুর ওপর একটি সিদ্ধান্তমূলক নিবন্ধ লিখে পাঠান সংগঠনটির কারান্তরীণ এক নম্বর ব্যক্তি মাওলানা নিজামী। 'আবু নকীব' ছদ্মনামে লেখা *'ইসলামী আন্দোলনে হীনমন্যতাবোধের সুযোগ নেই'* শিরোনামে প্রত্যুত্তরমূলক এই নিবন্ধটি জামায়াতপন্থী পত্রিকা দৈনিক সংগ্রামে ছাপানো হয়। এটি লিফলেট আকারে জনশক্তির মাঝে ব্যাপকভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থাও করা হয়।

জনাব কামারুজ্জামানের সংস্কার প্রস্তাবনাটির সূত্রগত সত্যতা নিয়ে নানা মহলে, বিশেষ করে 'সংগঠনপ্রাণ' জামায়াতের জনশক্তির মাঝে, কিছুটা সংশয় ছিলো। এর কারণ হলো মূলধারার জামায়াত নেতৃত্ব কর্তৃক একে যথাসম্ভব অস্বীকার করার প্রবণতা। ইতোমধ্যে এই চিঠির পাণ্ডুলিপি অনলাইনে প্রকাশিত হওয়ায় তা বইটির পরিশিষ্টে সংযোজিত হলো।

কোরআন ও হাদীস মোতাবেক সামষ্টিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে দ্বিমতের বিষয়গুলো প্রকাশ্যে উপস্থাপন করার সীমা বা ক্ষেত্র যা-ই হোক না কেন, জামায়াত যে কোনো বিষয়ে তাবৎ দ্বিমত ও সমালোচনাকে যথাসম্ভব নিরুৎসাহিত করে। উপরন্তু এসব বিষয়কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গোপনীয় হিসেবে বিবেচনা করে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার মারফতে এর ভিতরকার অনেক কিছুই এখন প্রকাশ হয়ে পড়ছে। স্বীয় বৃহত্তর

জনশক্তির নির্দোষ সেন্টিমেন্ট এবং পরীক্ষিত ও ত্যাগী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সময়োপযোগী ও বিশ্লেষণমূলক কোনো পরামর্শকে সংগঠনটির শীর্ষতম নেতৃবৃন্দ কখনো সুনজরে দেখে নাই। সংগঠনবাদী ও সংস্কারপন্থীদের এই দৃশ্যমান দ্বন্দ্ব নিরসনে জামায়াত ভবিষ্যতে কী করবে তা কেবলমাত্র ভবিষ্যতেই জানা যাবে।

জামায়াত কখনো স্বতঃস্ফূর্ত ও স্থায়ী সংস্কারে ব্রতী হবে না– আজ থেকে পাঁচ/সাত বছর আগে খুব কম লোকেই তা বিশ্বাস করতো। আমি তাদের অন্যতম। ২০১০ সালে আমি 'সোনার বাংলাদেশ' ব্লগে জামায়াত সম্পর্কে আমার বক্তব্য তুলে ধরেছিলাম, যা 'ফোর পয়েন্টস' হিসাবে পরিচিত। তখন আমার বিভিন্ন লেখায় নানাভাবে তা তুলে ধরেছি। এর মূল কথা হলো:

(ক) জামায়াত কখনো কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ও মৌলিক পরিবর্তনকে গ্রহণ করবে না।

(খ) নানা কারণে এই মুহূর্তে বিকল্প জামায়াত প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও বাস্তবসম্মত নয়।

(গ) 'ইসলামী আন্দোলনে'র ধারণা মোতাবেক 'দেখি না কী হয়', 'অন্যরা করুক', 'আমি তো বলেছি' বা 'সবাই করলে আছি নয়তো নাই'– এই ধরনের মনোভাবও গ্রহণযোগ্য নয়।

(ঘ) অতএব, সংশ্লিষ্টদের উচিত নতুন শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের ধারণাকে পুনর্গঠনের কাজ করে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত কী হবে– তা সময়ই বলে দিবে।

২০১০ সাল হতে আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় জামায়াতের গঠনমূলক সমালোচনা এবং ইসলামী আন্দোলনের আগামী দিনের রূপরেখা কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা বলে আসছি। এসব লেখালেখির দুটি পৃথক সংকলন শীঘ্রই প্রকাশের ইচ্ছা আছে। অতএব, এই সংকলনকে আমার পক্ষ হতে 'জামায়াতের সংস্কার প্রস্তাবনা' হিসাবে মনে করা ঠিক হবে না। উৎসর্গে যেমনটা বলেছি, *গঠনপর্ব হতে শুরু করে আগামী দিনের বাংলাদেশ প্রসঙ্গে 'ইসলাম' ও 'রাজনীতি'র অন্তঃসম্পর্ক পাঠে আগ্রহীদের উদ্দেশ্যেই* এই সংকলন। এই লেখাগুলোর দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখকবৃন্দের। আমার অতীত রাজনৈতিক জীবনের সাথে এই সংকলনের কোনো প্রকার সম্পর্ক নাই। 'সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র' তথা সিএসসিএস-ই আমার বর্তমান মতাদর্শিক পরিচয়। আশা করি বিদগ্ধ পাঠক এ বইটিকে নিতান্ত একাডেমিক দৃষ্টিকোণ হতে দেখবেন।

১৭ এপ্রিল ২০১৫
দক্ষিণ ক্যাম্পাস
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
পরিচালক
সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র

সূচিপত্র

Bangladesh: Reclaiming the Narrative ১
- A reform proposal presented by UK Jammat

বহুল আলোচিত জামায়াত সংস্কারের সেই মিটিং ১৫
- আরিফুর রহমান

রাজনৈতিক সংস্কার কৌশল ১৯
– জামায়াতের সংস্কার বিষয়ক আরেকটি প্রস্তাবনা

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন কর্মকৌশল গ্রহণ সময়ের দাবি ৪৫
– মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

বিবেচনায় আনতে হবে সবকিছু ৬৫
– শামসুন্নাহার নিজামী

Do Islamists need a way out? ৭৯
– Shah Abdul Halim

আরব বসন্ত এবং দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলন ১০১
– ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক

জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাসূল (সা)-এর আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে ১০৭
– অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ

ইসলামী আন্দোলনে হীনমন্যতাবোধের সুযোগ নেই ১০৯
– আবু নকীব

শিবিরের অভ্যন্তরীণ সংকটে জামায়াতের হস্তক্ষেপ ১১৫
– মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের পদত্যাগপত্র ১২৯

মজিবুর রহমান মন্জুর চিঠি ১৩৫

পরিশিষ্ট ১৫৩

Bangladesh: Reclaiming the Narrative

A way forward strategy for the Islamic Project

Abstract

What follows are some ideas about how we get out of the present quagmire and make a decisive move to bring about the eventual change in our country which we all desire. The success of this very humble effort will lie if these tentative ideas lead to a concrete decision taken at the appropriate level.

It will not take the route of starting with SWROT analysis which is the traditional way of putting together a strategic plan. However, in developing this all earlier reviews and analysis, laboriously carried out over the years, were taken into account. It has also benefited from a pro-active, bottom-up process of consultation with the help of the numerous comments, suggestions and proposals received from our anxious colleagues from around the world.

It has to be said however, despite the current impasse we can Alhamdulillah, proudly point to a range of successes our movement has achieved over the years. These include, a dedicated workforce ready to give any sacrifice, a sizeable popular support base, making

[*] This reform proposal was presented by the UK-based Jamaat leaders to the central leadership of the party during the four-party coalition government (2001-06).

a presence almost in every profession, gaining reasonable popular recognition of Islam as an alternative system of life and governance, presenting a large selection of Islamic literature to the nation, making some electoral and political gains including two cabinet ministers who achieved wide spread acclaim for honesty even by the enemies; the list goes on. However, the tsunami that hits us today very quickly negated much of these and even threatens to consign us as a mere footnote to history. As a movement that has the courage of conviction to turn the tide we refuse to surrender to adverse conditions and are determined to translate threats into opportunities with sagacious visionary planning.

The paper argues that sustainable change will first of all require reclaiming the narrative we have lost. Part of this must focus on re-thinking the way we present Islam to the society with more emphasis on Islam's broad civilisational appeal and its contribution in building a tolerant, cohesive society. The new narrative must form the essential core of the initiatives for change. It proposes three distinct strands for the whole project. Each to deliver a number of allied objectives; it advocates plurality of organs rather than a monolithic centralised entity. In developmental strand, more emphasis to be placed on education and human resource development. The organisations to maintain arms length distance between each other with no apparent structural link. In the political field it presents a number of alternatives for the consideration of the policy makers.

Introduction

Our world is changing and changing fast. China and India are growing in strength while, according to the US National Intelligence Council's (NIC) most recent global trends review (2008), the European Union (EU) 'will be loosing clout by 2025 and will be left like a hobbled giant'. Europe because of its 'democracy gap' will be unable to translate its economic power into global influence. The report also predicts that by 2025 the United States will become 'less dominant and no longer be able to call the shots without the support of strong partnerships.' This may be one of many studies being published in recent times but the underlying conclusions remain almost same or

similar. That 'need of partnership' led the decaying powers to look for emerging powers in different parts of the world opening up new opportunities for local aspirants like India.

True, smaller nations such as Bangladesh may not figure in such analysis, as it is nothing more than a tiny speck in such a vast landscape. However, tomorrow's world is as important for the small nations as it is for the world powers, perhaps even more so. In terms of population Bangladesh is now fourth largest Muslim nation in the world, yet it stands in splendid isolation marooned from the rest of the Muslim Ummah. The strategic risks such isolation entails make visionary planning for a sustainable future an urgent policy imperative.

Project-Islam is undergoing a monumental crisis around the world, more so in Bangladesh. Muslim culture in the country today faces such a powerful adverse current as underlined by recent most disturbing developments, that it has the potential to strike a fatal blow to the future of Islam itself. The whole social narrative has shifted from 'Islamic-ideological' or at least 'Muslim-cultural' angle to 'secular-ideological, ethnic/linguistic nationalistic' angle. Wilful distortion and excess by a whole range of political, academic and cultural opportunists coupled with sustained cultural onslaught from across the borders has already contributed to unparalleled level of misinformation and stifling of truth. This has in turn contributed to widespread and artificial tension in the society culminating in the current crisis.

We have lost the Narrative

With the narrow support base and wide spread antagonism Muslim activism now faces it appears almost unthinkable that Islam will ever form the basis of a drive to reordering social change in the country. In spite of increased religiosity and noticeable level of ritualistic observances Islam in our society has already been reduced to private sphere and are forced to fight even to hold on to that little corner. Relentless surge continues to erase the last traces of Islam from our history, our culture and even our language, so much so that Islam is

now in real danger of being consigned to the archives of the Museums. In short Islamic movement in our society has lost the narrative.

It is only a matter of time before we lose the last remaining hold. It is not just non-Muslims who are wary about Islam, today large section of secular Muslim elite has also moved far away from it to the extent that Islam has ceased to be a key factor in our society. There was a time when the whole society rested on cultural and civilizational moorings of Islam – not any more. In the words of Ali Allawi, 'it appeared to be only a matter of time before Islam would lose whatever hold it might still have had on the peoples and societies of the Muslim world'. Nowhere it is truer than in Bangladesh.

The false narrative that underpins the entire thought process of today's Bangladesh and largely shapes the social, cultural and academic vistas of our society did not stem from 1971 war, it was planted in our soil long before that, if anything 1971 is a by-product of this narrative. What is remarkable is how durable this narrative has proven to be. In the forty years since 1971 it helped promote a hate-soaked formula that continues to drive our political and cultural discourse leading to a backlash and conflict and threatening the whole fabric of the society.

Planning for a beautiful tomorrow

This is not the time to point fingers or apportion blame, rather the priority today is to focus on a far-reaching visionary project which will, Allah willing, frustrate the schemers and ultimately turn the tide in favour of a beautiful tomorrow that our unfortunate land rightly deserve. There is no reason why small nations should not review their past and present and plan their future. At the end of the first forty years of the countries existence it is important to embark upon a mapping project to investigate all aspects of the nation and try to point to a future direction.

Mapping however is not an end in itself unless it leads to a carefully planned project to reclaim the lost narrative. For, it will be necessary

to evolve a new national consensus which will take its root from that reclaimed narrative in planning for a future direction of our nation. The project to reclaim the lost narrative will have three components governed by a central core which is reclaiming the narrative itself. It will look like something like this:

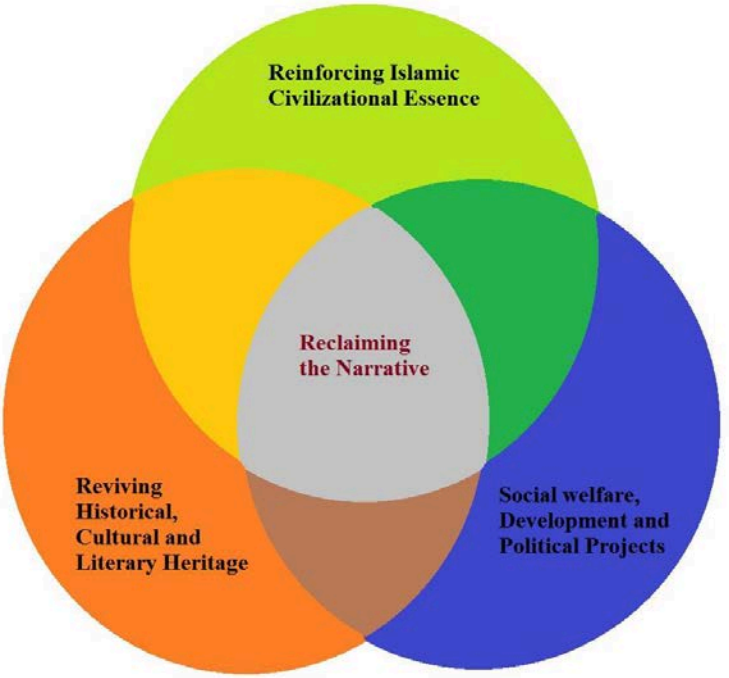

The three strands of the project will be driven by a vision that encompasses the final goal of this journey we set for ourselves.

Vision

The central purpose of the project will be:

"To change Bangladesh into a poverty-free, just and prosperous society firmly anchored to its Islamic civilizational moorings."

Narrative

Reclaim the lost Muslim cultural and civilizational narrative by dispelling the false anti-Muslim narrative that largely rule today's

thought process through extensive academic research, publication and subtle awareness building measures.

Planning Objectives

1. Think deep and discover the root causes of opposition
2. Develop insight into the history and socio-cultural trends
3. Regain the control of the academic narrative in all fields

Three central component or strands of the project has to be addressed next.

Reinforcing Islamic Civilizational Heritage

The deep antagonism that is endemic in our society about an idea which is in essence liberal liberating makes no sense. Is it to do with the way we present or mis-present Islam? Or is it because of the way society tried to make sense of the Islamic social order. Perhaps our own understanding of Islam and Islam-inspired social change may have something to do with it.

The ideological template we use to understand Islam makes it limited and limiting which impedes thinking about Islam in morally relevant ways, in turn it prevents others to feel solidarity to Islam and Muslims. The broad, inclusive nature of Islamic civilization was once able to accommodate communities and faith groups and lead a tolerant, understanding and cohesive society. That, and not the insistence on doctrinal limitation, was the key to our success both around the world and in Bangladesh.

Planning Objective

1. Carry out an audit of Islamic literature in Bengali and identify the gaps.
2. Through new research and produce literature articulating the core concepts of Islam guided by the universal and accommodating ideals of Islam.

Reviving Historical, Cultural and Literary Heritage

The very first thing in any project of shaping the future of a society has to begin with placing its history in correct footing. With the twist and turns of time history itself gets tempered with and finds itself far removed from reality. History is the single most important ingredient to motivate a society. Wrong interpretation of history stifles national spirit and curbs development and progress. Like the history of many countries around the world, history of Bangladesh also deserves to be cleansed from the layers of misrepresentation and analysed to re-establish the facts, because as journalist par excellence, Guardian editor CP Scott once famously commented, '...but fact is sacred' ... Not just written history and not just the history since the 1971, the history uploaded on the Wikipedia at great expenses by some interested parties deliberately distorts facts about our Muslim heritage. For example, in the Wikipedia, the Muslim liberator of Bengal Ikhtiar Uddin Muhammad Bakhtiar Khilji is depicted as an *'invader'* who has *'raided'* and *'destroyed'* and *'committed documented executions.'* Only a sentence in the **Legacy** section says, 'Bengali poet Al Mahmud composed a book of poetry titled **Bakhtiarer Ghora** meaning the Horses of Bakhtiar in early 1990 depicting Khilji as the ***praiseworthy*** figurehead of the conquest of Bengal.'

Language and Literature

For Bangladesh history of the language and literature is integral with the history of the nation itself and as important. A close look at the origin and development of the Bengali literature will dispel great deal of misconception which now not only prevails in the society but taken the status of conventional wisdom in this subject area.

Muslims played a key role in embracing peoples and cultures and bond them together into a cohesive society in Bangladesh. Islam came to Bengal through traders, travellers and Sufi saints long before the Muslim rule took its root in the country. Oppressed people of Bengal welcomed the new faith for its liberating concept of equality of men, justice and fairness. Communities were allowed ample

autonomy to grow according to their own religious, cultural and family values during the Muslim rule. For example, rulers like Alauddin Hussain Shah (late fifteenth to early sixteenth century) commissioned Hindu scholars to produce the very first Bengali translation of Hindu religious texts Ramayana and Mahabharata.

The history stands witness that Muslims rulers not only respected local faiths and cultures, they even provided for the upkeep of their places of worship and observation of their festivals. Tolerance and respect for each other promoted by Muslims helped create a cohesive society in Bangladesh for centuries.

Planning Objectives

1. Inculcate a culture of tolerance and cohesion by imitating once again the warmth and the open-arm embrace of the Master of Madina.
2. Produce properly evidenced publications on the Impact of Islam in shaping Bangladeshi culture.
3. Through research present the history of how Islam promoted a tolerant and inclusive society in Bengal.
4. It is important to embark upon a research project on compiling the true history of Bangladesh.
5. Reproduce the facts about Muslim nature of the original Bengali language, vocabulary and literature.

Social Welfare, Development, Educational and Political projects

Direct political participation is just one aspect of the vast agenda of bringing about a total social change. To achieve this, it will be necessary to temporarily move beyond a solo focus on party political project. It is crucial to understand that more and urgent emphasis on social welfare and developmental initiatives is a necessary re-balancing needed to ultimately reclaim the initiative in political field. As the Qur'an states Allah Subhanahu wa Ta'ala commands us to establish justice and welfare, the fundamental objective of Shari'ah or 'Maqasid al-Shari'ah' is defined as 'attainment of good, welfare

and warding off evil, injury and loss for the creatures'; it is imperative that is precisely where any project of Islamic change should initiate its journey. Participation in political process is nothing more than a means to attain this central goal. Whether to increase its scale and level or scale it down is merely an operational strategy.

Education

Making education available for all is an essential prerequisite in the attempt for attainment of common good. This is also necessary for transmitting the new narrative reclaimed and evolved by the first two strands of the project. The educational movement we propose will begin from Maktabs to post graduate research studentship. A massive country-wide network of Maktabs should be launched with a carefully constructed curriculam which will move on to understanding the meaning of Quranic texts and core concepts of Islam after students complete learning the reading of the Quran. A programme of non-formal learning should be introduced to fast-track education for millions of urban and rural dispossessed children urchins and drop-outs. The projects are to be delivered with minimum infra-structure costs by using making use of Mosque buildings during the time they remain largely unused (i.e.; from Fajr to Zuhr prayers). Through scholarships and supplementary tuition programmes secondary and college students to be empowered as well. Projects to direct talented students to specialisation and post-graduate qualification should also be launched.

In the Political Arena

Our greatest challenge however lies in the political arena. In order to capitalise on the benefit generated by the works of other strands we need to think deep and devise a political strategy that will ultimately achieve our core objectives risking a catastrophic setback. Rather than providing a definitive or prescriptive solution this paper presents the following alternatives for the consideration of the policy makers.

Option 1

Maintaining the present status	Advantage	Drawbacks
Party continues as before both in packaging and content, keeps the alliance intact. Participates in electoral politics and maintains its vocal opposition to the external forces.	▪ Will promote an undaunted image to some sections. ▪ Will be liked by the partner and opponents. ▪ Ensure continuity.	▪ Will continue to carry the burden of the past. ▪ Will be extremely hard to ignite the public enthusiasm. Risk of loosing substantial HR. ▪ Electoral outcome is unlikely to improve. ▪ Core objective will remain unattainable.

Option 2

Adopts a new name	Advantage	Drawbacks
Party repackages itself in a new name and constitution. Participates in electoral politics and maintains its vocal opposition to the external forces.	▪ Will temporarily confuse the critiques. ▪ Will initially be liked by opponents. ▪ Will preserve at least some of the HR.	▪ Burden of the past may still continue to hunt. ▪ Public participation may still remain marginal. ▪ Electoral outcome is likely to remain iritic. ▪ Chances of achievement of the core objective will still be remote.

Option 3

Adopts a new name	Advantage	Drawbacks
In the present climate political work could be handled by dividing work in two distinct parts: **First,** a scale down version of the present party retaining same name and a reduced existence while openly announcing its disengagement from electoral politics. **Second,** an organisation with a neutral name where most work force will congregate and engage primarily in social, cultural and welfare activities and	▪ Will help to keep our resources intact. ▪ It will act as a decoy to ensure that attention of others remain focused on it leaving the second to work smoothly without attracting much attention. ▪ Will satisfy the insistence of the opponents of making us disengaged in the politics, for now. ▪ Will help preserve most of our HR by relocating them. ▪ Will act as a moral power house. ▪ Will keep an arm's length distance with all other activities and not have any visible link with other organisations or activities, social, cultural or political. ▪ With political disengagement burden	▪ There will be no direct role in politics. ▪ Political disengagement may be considered as a climb down by some of us. ▪ Low level antagonism may still continue. ▪ Achievement of the core objective will be outsourced. ▪ May initially present a passive image. ▪ Keeping an arms-length distance with other organs may not prove to be easy. ▪ Politically motivated workforce may initially find it frustrating. ▪ Some may think it will lack the clout needed for

for the time being keeping away from electoral politics. It will be able to carry out most of the preparatory work for bringing about eventual change. It will be tasked to translate the changed narrative into political programme.	of the past will more or less disappear. ▪ The allies will be content to have access to our electoral power base without having to share seats. ▪ The disengagement in electoral process may allow time to construct a solid foundation in preparation to stage a meaningful re-entry. ▪ Rising above confrontational positioning will help build a wide coalition. ▪ Will be able to generate genuine popular appreciation through a social welfare network. ▪ Engagement in a wide ranging educational and human resource development project will help build a more sustainable foundation. ▪ Re-branding with a view to be Islamic in essence, not just in packaging will help achieve broader support base.	building coalition and network. ▪ May also be seen as making too many concessions to the others. ▪ Recalibrating external relations could be seen as sign of weakness. ▪ As our HR is not used to quick adaptation, they may find a new name strange at the beginning and take time to adjust with it. ▪ Rising above. Confrontational politics may prove to be hard to practice. ▪ Temptation of immediate involvement in electoral politics may prove too overpowering. ▪ Translating the narrative into practical political programme may prove to be a very

	▪ By bringing about a public relations revolution from within the existing media it will be able to repair the image problem. ▪ Charting a foreign policy strategy priority by recalibrating our relations with both global and local super-powers will make our future role more viable.	challenging undertaking. ▪ Allowing different organs (i.e.; Social, educational, economic and HR development) may prove difficult with our long-standing training of central-control.

Human Resource Development

Efficient development and use of human resource are the key in planning for our future success. It will be a part of the project under any of the above options but more importantly for the Second strand of the third option. Because during the uncertain time of managing change there will be real risk of disenchantment and large number of 'drop-outs'. It will be a crucial part of the programme of the Social, developmental and Political Strand to plan for human resource management without any wastage.

Such work will include:

- Effective planning and redistribution of existing HR.
- Retraining to adjust with new realities and new thinking.
- Recruitment through academic, cultural and social welfare initiatives.
- Channeling trained and motivated HR to crucial sectors to achieve agreed outcomes.

Social Welfare, Developmental and Economic Area

Welfare and developmental activities could be carried out by one or a number of separate welfare NGOs, in general understanding with, but not directly controlled by the second organisation. Together they will be responsible to create a selfless welfare culture helping, assisting, supporting and developing the fabric of the society and addressing its needs. The areas of work it/they should cover will be some of the following.

Planning Objectives

1. Mapping economic assets of Bangladesh and rethinking their innovative utilisation.
2. Developing ready-built low-cost housing.
3. Developing large-scale employment strategies and income generating enterprises.
4. Back to basics: developing strategies to reignite interest in agriculture and fishing.
5. Developing ideas for export oriented small-scale business.
6. Launching creative initiatives to help women to play a role in nation building.
7. Strategies for regenerating villages and making rural life sustainable and attractive again.
8. Developing self-sustaining energy programmes.

Conclusion

The above is by no means an exhaustive list of ideas and alternatives, they are just some pointers for our decision makers to think and decide our future course of action. Our task ahead is no doubt challenging and onerous, but Allah willing, challenge will never defeat the free spirit of Allah-conscious Mumin. Rethinking and revising, planning and charting a different yet effective strategy has always been a gift of prophetic wisdom. It is not bowing to pressure but a firmness of *Istiqamat.*

বহুল আলোচিত জামায়াত সংস্কারের সেই মিটিং

আরিফুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর নাম পরিবর্তন কিংবা নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা যায় কি না, তার একটি উদ্যোগ নিয়েছেন এই দলেরই নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। একাত্তর সালে স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকার জন্য জামায়াতের গ্রহণযোগ্যতা সাধারণ জনগণের কাছে নেই। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর লেখায় ইসলামী শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেই ব্যাখ্যা এদেশের হক্কানি আলেমদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা একে বাতিল মতবাদ বলে মনে করেন। এ ছাড়াও দলের রেজিমেন্টেড পরিবেশ ও দুর্বল নেতৃত্বের জন্য দীর্ঘ ৫০ বছর রাজনীতি করেও দলটি ক্ষমতাসীন হতে না পারার কারণে এর বিকল্প হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

উদ্যোক্তারা ঢাকায় ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি বৈঠকও করেছেন। এক পর্যায়ে পুরানা পল্টনে অবস্থিত তাদের একটি টেলিভিশন কেন্দ্রের রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোলটেবিল বৈঠকও করেন। এতে 'কেন এবং কীভাবে' জামায়াতের নাম পরিবর্তন করে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা যায়- তা নিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করা হয়। এ নিয়ে জামায়াতের প্রথম কাতারের নেতৃত্বে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। এই উদ্যোগের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের সতর্কও করে দেন দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব। চলতি বছরের ৯ জুন ঢাকার একটি বেসরকারি 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক' ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচন পর্যালোচনা করে একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ দাঁড় করায়।

---

* এটি মূলত দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনে প্রকাশিত 'বদলে যাচ্ছে জামায়াতের নাম' শিরোনামের একটি প্রতিবেদন, যেটি WITNESS UNTO MANKIND তথা আইএমবিডি নামের একটি ব্লগে উপর্যুক্ত শিরোনামে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ব্লগটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লেখাটির কার্যকর আর্কাইভ লিংক: https://web.archive.org/web/20120906014455/http://imbd.blog.com/

এতে তারা জামায়াত সম্পর্কে মন্তব্য করে এই বলে যে, 'জামায়াত বর্তমানে ইমেজ সংকটে ভুগছে। ভবিষ্যতে এই অবস্থার আরো অবনতি ঘটতে পারে। এমতাবস্থায় জামায়াতের রাজনীতির প্রতি অনুগত সব ব্যক্তি ও শক্তিকে কৌশল হিসেবে একটি নয়া প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে নতুন নামে রাজনৈতিক দল সৃষ্টির বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।' ওই থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, তাদের এই বিশ্লেষণ ইংরেজিতে অনুবাদ করে ঢাকার কূটনীতিক পাড়ায় বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতের কাছেও উপস্থাপন করা হয়। এই বিশ্লেষণটি জামায়াতের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেও দেওয়া হয়।

জামায়াত সাংগঠনিকভাবে এই বিশ্লেষণের প্রতি আগ্রহ দেখায়নি। তবে জামায়াতেরই একটি প্রভাবশালী অংশ "বাংলাদেশের রাজনীতির চালচিত্র" নামের এই থিসিসটি লুফে নেয়। জামায়াতের প্রভাবশালী নেতা মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মীর কাশেম আলী এ নিয়ে তার সমমনাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি তাদের সমর্থন পেয়ে এ ব্যাপারে আরো একটি নতুন থিসিস তৈরির দায়িত্ব দেন জামায়াতে তারই অনুগত একটি গ্রুপকে। তারা একটি ব্যাপকভিত্তিক থিসিস তৈরি করে দেখালে মীর কাশেম আলী থিসিসকে 'সামআপ' করতে বলেন। পরে একটি গোলটেবিল বৈঠকে এই থিসিসটি পাওয়ার পয়েন্ট হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

সূত্রটি জানায়, এই গোলটেবিল বৈঠকে মীর কাশেম আলী ছাড়াও জামায়াতের সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান এবং ছাত্রশিবিরের সাবেক বেশ কয়েকজন সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের এই খবর জামায়াতের আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী জানতে পেরে মীর কাশেম আলী ও মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের কাছে কৈফিয়ত তলব করেন বলে সূত্রটি নিশ্চিত করে।

মাওলানা নিজামী তাদের বলেন, কার অনুমতি নিয়ে এ ধরনের একটি কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া হলো? নিজামী ছাত্রশিবিরের নেতাদের এই বলে বোঝান যে, মীর কাশেম আলী ও মুহাম্মদ কামারুজ্জামান সুযোগসন্ধানী। তাদের কথায় কান না দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। নিজামীর এই কথার জবাব দেন ছাত্রশিবিরের ক'জন সাবেক সভাপতি। তারা নিজামীকে বলেন, তারা সুযোগ-সন্ধানী হলে তাদের জামায়াতের নেতৃত্বে রাখা হলো কেন? এর উত্তর আর নিজামী দিতে পারেননি বলে জানা যায়।

গোলটেবিল বৈঠকে যে পাওয়ার পয়েন্টটি উপস্থাপন করা হয়, তাতে মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলা হয়, 'সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোনো মুসলিম দেশেই সংসদ নির্বাচনে ইসলামী দলগুলো সরকার গঠনের মতো প্রয়োজনীয়সংখ্যক আসন লাভ করতে পারেনি। বরং দেখা যায় তাদের প্রাপ্য ভোটের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে আসছে।' ওই পাওয়ার পয়েন্টে বাংলাদেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর ভবিষ্যৎ

নিয়ে উপস্থাপন করা বক্তব্যে বলা হয়, 'বাংলাদেশের গত তিন-চার দশকের ইসলামী রাজনীতি প্রত্যাশিত সুফল বয়ে আনতে পারেনি। সেক্যুলার আওয়ামী লীগ, জাতীয়তাবাদী বিএনপি ও সুবিধাবাদী জাতীয় পার্টি ঘুরে-ফিরে বিভিন্ন মেয়াদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল। ইসলামী দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া অন্য দলগুলোর সাংগঠনিক ও জনভিত্তি উল্লেখ করার মতো নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জামায়াত নির্বাচনী দৌড়ে পিছিয়ে রয়েছে।

বাস্তবতা এমন দাঁড়িয়েছে, সততার সুনাম থাকা সত্ত্বেও বর্তমান নেতৃত্ব নিয়ে জামায়াতের পক্ষে ভবিষ্যতে এককভাবে সরকার গঠনের মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয় বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন। পাওয়ার পয়েন্টে জামায়াতে বেশ কয়েকটি সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরা হয়। বলা হয়:

এক, একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করায় জামায়াতের প্রথম সারির বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রচারণা থাকায় সর্বজনগ্রাহ্য জাতীয়ভিত্তিক ইমেজ তৈরি তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রায় চার দশক জামায়াতের বিরুদ্ধে এই প্রচারণা বন্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা আবার শুরু হয়েছে। এতে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জামায়াতের ব্যাপারে একটি বিরূপ প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে যুদ্ধাপরাধী বিষয়টি সামনে চলে আসায় এটি আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। এমতাবস্থায় জামায়াতের রাজনৈতিক ইমেজ পুনরুদ্ধার বা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

দুই, দলটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বে রয়েছে দুর্বলতা। তাদের কেউ কেউ বৃদ্ধ ও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। নতুন উদ্যমে দলকে এগিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই।

তিন, জামায়াতের পরিবেশ রুদ্ধদ্বার (রেজিমেন্টেড) ধরনের। এ জন্য ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন উদারনৈতিক ব্যক্তিরা এই দলে প্রবেশ করতে পারে না। দলটিতে সৎ মানুষের অভাব না হলেও দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেওয়ার মতো উপযুক্ত ও দক্ষ লোকের অভাব রয়েছে। জামায়াতের বাইরে যেসব সৎ ও দক্ষ লোক রয়েছে, তারা যে কোনো পর্যায়ে জামায়াতে যোগ দিতে উৎসাহবোধ করে না।

চার, জামায়াতের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচার-প্রচারণা বর্তমানে আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। এতে ভোটারের মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়েছে।

পাঁচ, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জামায়াতের বর্তমান নেতৃত্বের মধ্যে আধুনিক ধ্যান-ধারণার অভাব রয়েছে। সমস্যাসংকুল বাংলাদেশের বেশকিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে। সব দলই এসব বিষয়ে কোনো না কোনো বক্তব্য দিয়ে থাকে। এসব সমস্যার অগ্রাধিকার নির্ণয় করে জামায়াত উত্তম বিকল্প কোনো সমাধানের দিকনির্দেশনা জাতির সামনে পেশ করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির অসৎ নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে জামায়াতের নেতারা তাদের দলকে জাতির সামনে তুলে ধরতে পারেননি।

ছয়, ভোটের রাজনীতিতে বর্তমানে যে কৌশল নেওয়া হয়, তা নিতে জামায়াতের বেশ সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

সাত, জামায়াত নতুন প্রজন্মের চিন্তা-চেতনার আলোকে নিজেদের উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। নতুন প্রজন্মের ভোটারদের কাছে নিজেদের কর্মসূচি উপস্থাপনের জন্য যে ধরনের আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন, তা ব্যবহারে জামায়াতের ব্যর্থতা রয়েছে।

আট, নীতি ও আদর্শের সঙ্গে আপস না করেও কৌশলগত কারণে উদারনীতি অনুসরণ করে সমর্থনের পরিধি বৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গি জামায়াতের নেই।

নয়, বর্তমানে বিএনপির ভঙ্গুর অবস্থার কারণে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্য ভবিষ্যতে কতটা কার্যকর হবে তা বলা কঠিন।

এমনি এক পরিস্থিতিতে বিকল্প রাজনীতির সন্ধানের জন্য মত প্রকাশ করা হয় পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায়। এতে বলা হয়, দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর জামায়াত বাংলাদেশের মাটিতে কাজ করে ব্যাপক সাংগঠনিক ভিত্তি অর্জন করলেও ভোটারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমর্থন তৈরি করতে পারেনি। বিএনপিও এক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এ জন্য জনগণ আওয়ামী লীগের বিপরীতে বিএনপি ও জামায়াতের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি দেখতে চায়।প্রস্তাবিত এই দলটি কেমন হবে তারও একটা চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে পাওয়ার পয়েন্টে। এতে বলা হয়, দলটি ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা দেবে। তবে 'ইসলামী রাষ্ট্র' বা 'শরিয়াহ আইন' চালু করার মতো হার্ড লাইন অনুসরণ করবে না। এটি কোনো রেজিমেন্টেড বা ক্যাডারভিত্তিক দল হবে না। এই দলের নামকরণে কোনো ইসলামী শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করা ঠিক হবে না। প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণ করে তৃণমূল থেকে নতুন নেতৃত্ব বাছাই করতে হবে। এই দলকে পাশ্চাত্যের ধাঁচে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক অঙ্গন ছাড়াও বাংলাদেশেই নাম পরিবর্তন করে জামায়াতের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ইসলামী ছাত্রসংঘ নাম পরিবর্তন করে ইসলামী ছাত্রশিবির নামে কাজ করে আসছে। জামায়াতও মাওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বে ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ নামে কাজ করেছে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত।

রাজনৈতিক সংস্কার কৌশল

রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার ইতিহাস সুদীর্ঘ হলেও রাজনৈতিক দলের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। মাত্র অষ্টাদশ শতকে ইউরোপ ও আমেরিকায় রাজনৈতিক দল গঠনের সূচনা হয়। সপ্তদশ শতকে বৃটেনে হুইগ ও টোরি পার্টি জন্ম হলেও সেগুলোর তেমন প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব ছিল না। বৃটেনের বড় বড় ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে যে গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল তারাই পার্লামেন্টে হুইগ ও টোরি পাটি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এ সময় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিও তেমন বিকশিত হয়নি। ভোটাধিকার সীমিত ছিল উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবার সাথে সাথে রাজনৈতিক দলগুলোও ক্রমান্বয়ে সুশৃংখলভাবে গড়ে উঠতে থাকে। স্যার রবার্ট ফিলের নেতৃত্বে বৃটেনে ১৮৩০ সালে প্রথম কনজারভেটিভ পার্টি ক্ষমতায় আসে। পুরো অষ্টাদশ শতক জুড়ে কনজারভেটিভ পার্টি ও লিবারেল পার্টির মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলে। ১৯২০ সালে দিকে লিবারেল পার্টি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়লে লেবার পার্টির বিকাশ ঘটে।

আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন রাজনৈতিক দল গঠনের বিরোধী ছিলেন। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ইস্যুতে বিতর্ক দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতিতে দু'টো রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়: (১) উত্তরাঞ্চলের নেতা হ্যামিলটনের নেতৃত্বে ফেডারেলিস্ট পার্টি, এরা শক্তিশালী ফেডারেল/কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবক্তা ও আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে বৃটেনের সমর্থক; (২) দক্ষিণাঞ্চলের নেতা জেফারসনের নেতৃত্বে গঠিত হয় রিপাবলিকান পার্টি। এরা দুর্বল

---

* ২০০৮ সালে জামায়াতের সংস্কারপন্থীদের মধ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। এই বৈঠকটির কথাই আগের প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে। ওই বৈঠকে 'রাজনৈতিক সংস্কার কৌশল' শিরোনামের এই কী-নোট পেপারটি ছিলো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে এটি সংগৃহীত।

ফেডারেল/কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতি এবং আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে ফ্রান্সের সমর্থক।

এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যুদয় ঘটে প্রধানত উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সংঘবদ্ধ শক্তি হিসেবে। এদের অধিকাংশ নেতাই আবার পাশ্চাত্য দর্শনে শিক্ষিত ছিল; তবে তারা রাজনৈতিক সুবিধার জন্য মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনাকে কাজে লাগান। অবশ্য কোনো কোনো দেশে ইসলামী আদর্শকে ধারণ করেই শুরু থেকে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেন। লক্ষণীয় যে, প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশেই স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে। কিন্তু এ সকল দলের রাজনৈতিক শক্তি

অর্জনে যথেষ্ট সময় লেগেছে এবং তাদেরকে বহু কাঠখড় পোহাতে হয়েছে। স্বৈরশাসক ও সামরিক শাসকদের আমলে ইসলামী দলগুলো বহু নির্যাতন ও নিষিদ্ধ হওয়ার শিকার হয়।

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশের নির্বাচনী ফলাফল

২০০৮ সালের প্রথমার্ধে পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ার সংসদ নির্বাচনে ইসলামী দলগুলো হতাশাব্যঞ্জক ভোট পেলে একজন বিশ্লেষক মন্তব্য করেন যে, এশিয়ার কোনো মুসলিম দেশে নির্বাচনে জয়লাভ করতে হলে ইসলামী এজেন্ডাকে গোপন রাখতে হবে।

মালয়েশিয়ায় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালের মার্চ মাসে। এতে ইসলামী দল 'পার্টি ইসলাম-সে-মালয়েশিয়া' (পাস)-র আসন সংখ্যা ৬ থেকে ২৩টিতে বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ক্ষমতাসীন মহাজোটের আসন সংখ্যা বেশ কমে যায়। ১৯৬৯ সালের পর দলটির এরূপ বিপর্যয় আর ঘটেনি। মহাজোট নেতা প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ বাদাওয়ী নির্বাচনী প্রচারণায় ইসলামী উম্মাহর ঐক্যের আহ্বান জানান। পক্ষান্তরে পাস নেতারা অতীতের মত 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার শ্লোগান না দিয়ে 'স্বচ্ছ সরকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করেন। পাস নেতৃবৃন্দ আরো একধাপ এগিয়ে প্রথমবারের মত নারীদের হিযাব বাধ্যতামূলক করার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসেন এবং দলটি প্রথমবারের মত নির্বাচনে অমুসলিম ও নারীদের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়।

২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে পাশ্চাত্য বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেন যে, এ নির্বাচনে পারভেজ মোশাররফের ভরাডুবি হলেও প্রকৃতপক্ষে ভরাডুবি হয়েছে ইসলামপন্থীদের। তাদের মতে, আল-কায়েদা ও তালেবানদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ইসলামী দলগুলো ইতোপূর্বের নির্বাচনে যেখানে ১১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, এবারের নির্বাচনে তা কমে গিয়ে ৩ শতাংশে নেমে আসে। এর আগে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে ইসলামী জোটের সরকার ছিল। ২০০৮ এর নির্বাচনে সেটি দখল করে নেয় সেক্যুলার ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। ২০০১ সালে বাংলাদেশের

সাধারণ নির্বাচনে যেখানে ইসলামী দলগুলোর আসন সংখ্যা ছিল ২০টির উপরে এবং জোট সরকারে তাদের ২ জন মন্ত্রীও ছিল। ২০০৮ এর নির্বাচনে পার্লামেন্টে তাদের আসন সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ২টিতে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোনো মুসলিম দেশেই পার্লামেন্ট নির্বাচনে ইসলামী দলগুলো সরকার গঠনের মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন লাভ করতে পারেনি। বরং দেখা যায়, তাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। মালয়েশিয়ায় সংসদ নির্বাচন ইসলামী দলগুলো কখনোই ১১ শতাংশের বেশি ভোট পায়নি। একইভাবে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী দলগুলো সবাই মিলে কখনোই ১৭ শতাংশের বেশি ভোট পায়নি। বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলো নব্বই দশকে ১১-১২ শতাংশ ভোট পেলেও সাম্প্রতিককালে তা ৩-৪ শতাংশে নেমে এসেছে। আফগানিস্তানে তালেবান সমর্থকরা মাত্র ১১ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অবশ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত এ নির্বাচন কতটা অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিল, সে প্রশ্ন রয়েছে।

কয়েক বছর আগে পাশ্চাত্য বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেছিলেন, ইরানে সরকার মনোনীত প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যেতে তেমন আগ্রহী হয় না। যেমন, নব্বই দশকের শেষদিকে নির্বাচনে মাত্র ৪৬ শতাংশ ভোটার ভোট দেয় এবং এতে শহুরে ভোটার ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ। তেহরানে এই হার ছিল মাত্র ১৯ শতাংশ। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ইরানে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও তার ফলাফল নিয়ে বিদেশী ষড়যন্ত্র এমন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার জন্ম দেয় যা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে। এবারের নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি ৮৫ শতাংশের বেশি হওয়া এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, ইরানের নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এটাও ইঙ্গিত দেয় যে, মুসলিম দেশগুলোতে ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র ও মিডিয়ার প্রচারণা ভোটারদের বিভ্রান্ত করার জন্য সচেষ্ট থাকবে। আশার কথা যে, ইরানে অনুষ্ঠিত এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে পাশ্চাত্য যে নোংরা খেলা খেলেছে তা বুমেরাং হয়েছে এবং আহমেদী নেজাদ ও ইরানের ইসলামী সরকারের প্রতি মুসলিম দেশগুলোর সমর্থনকে দৃঢ়তর করেছে।

২০০৮ সালের নভেম্বরে জর্ডানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ইসলামিক এ্যাকশন ফ্রন্ট এর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা চার বছর আগের ১৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৫ শতাংশে নেমে আসে। তারা পূর্বেকার ১৭টি আসনের স্থলে মাত্র ৬টি আসন পায়।

প্যালেস্টাইনের গাজায় হামাসের জনপ্রিয়তা একেবারে তুঙ্গে। এতদসত্বেও তারা ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট পেয়েছে ৪৬ শতাংশ। তুরস্কে ইসলামপন্থী একে পার্টি ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট পেয়েছে স্মরণকালের সর্ব্বোচ্চ ৪৪ শতাংশ। অবশ্য তারা নির্বাচনী প্রচারণায় ইসলামী রাষ্ট্রের কথা না বলে সংবিধানে বর্ণিত সেক্যুলার নীতি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। তুরস্কের দেখাদেখি মরক্কোতে গঠিত হয় পার্টি অব জাস্টিস

এন্ড ডেভেলপমেন্ট। তারা তুরস্কের একে পার্টির বিশেষজ্ঞ পরামর্শও গ্রহণ করে। এতদসত্বেও দলটি নির্বাচনে মাত্র ১০ শতাংশ ভোট পায়।

আলজেরিয়ায় দু'টি ইসলামী দল ২০০৭ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট পেয়েছে মাত্র ১২ ভাগ। ইয়েমেনে গত ২০ বছর ধরে নির্বাচন হচ্ছে। সেখানকার ইসলামী দলগুলো সর্বোচ্চ ২৫ ভাগ ভোট পায়। ২০০৩ সালের নির্বাচনে তা আবার ২২ ভাগে নেমে আসে।

কুয়েতে মোটামুটি সুষ্ঠু নির্বাচনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সেখানকার ইসলামী দলগুলো সর্বোচ্চ ২৭ ভাগ ভোট এবং ৫০ আসনের পার্লামেন্টে ১৭টি আসন পায়। লেবাননে ২০০৫ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দু'টি ইসলামী দল সম্মিলিতভাবে ২১ ভাগ ভোট এবং ৯২ আসনের পার্লামেন্টে ২৮টি আসন পায়।

সম্প্রতি লেবাননে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচন ও তার ফলাফল নিয়ে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র ও মিডিয়ার প্রচারণা বেশ লক্ষ্যণীয়। আশা করা গিয়েছিল যে, হেজবুল্লাহর নেতৃত্বাধীন জোট জয়লাভ করবে। কিন্তু মার্কিনপন্থী সেক্যুলার জোটের জয়লাভ হতাশার জন্ম দিয়েছে। তবে এটাও শিক্ষনীয় যে, পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র ও দেশীয় দালালদের কারণে নির্বাচন কাংখিত লক্ষ্যে পৌছতে পারছে না।

উল্লেখিত তথ্যগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়, কোনো মুসলিম দেশেই ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো সরকার গঠনের মত ভালো ফল লাভ করতে পারছে না। এর কারণ গবেষণা ও অনুসন্ধানের দাবি রাখে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ গুলের মন্তব্য: "অধিকাংশ মুসলমান সেক্যুলার রাষ্ট্রকাঠামোতে ইসলামী সমাজে বাস করতে চায়।"

তুরস্ক

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দীর্ঘকাল যাবৎ আরব ও তুর্কী শাসকরা পারস্পরিক সহমর্মিতার ভিত্তিতে মুসলিম খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছে। তুর্কী খলিফার দরবারে অনেক আরব আলেম ও পণ্ডিতদের প্রাধান্য ছিল; তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো বিরোধ বা হীনমন্যতা পরিলক্ষিত হয়নি। ইউরোপের খ্রিস্টান ও ইহুদী বুদ্ধিজীবীরা অত্যন্ত সুকৌশলে আরব ও তুর্কী মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়। প্রাচ্য ইতিহাস বিশারদ বার্নার্ড লুইস লিখেছেন, তিনজন ইউরোপীয় ইহুদী তুর্কীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ধ্যান-ধারণার লেলিহান শিখা ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইংরেজ ইহুদী আর্থার লুমলে ডেভিড (১৮১১-১৮৩২) ইংল্যান্ড থেকে তুরস্কে এসে Priliminary Discourses নামে একটি বই লিখেন; এতে তিনি তুর্কী জাতিকে আরবদের চেয়ে উন্নত ও স্বাধীনচেতা হিসেবে তুলে ধরেন। বইটি তরুণ তুর্কীদের মধ্যে সাড়া জাগায়। বইটি তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করে ছড়িয়ে দেয়া হয়। ডিভিড লিয়ন কোহন নামের আরেকজন ফরাসী ইহুদী ১৮৯৯ সালে তুর্কী জাতীয়তাবাদের পক্ষে Generale a LHistoire de L'Asie নামে একটি বই লিখেন। এতে তিনি তুর্কীদের অতীত গৌরব তুলে ধরেন। বইটি তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করে অসংখ্য কপি বিতরণ করা হয়। 'ইয়ং

তুর্ক' নামে খলিফার বিরোধী একটি গ্রুপকে কাজে লাগানো হয় এবং এদের সমর্থকদের নিয়ে প্যারিস ও মিশরে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। এরাই তুর্কী জাতীয়তাবাদের পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকে। তৃতীয় ইহুদী ব্যক্তিটি ছিল হাঙ্গেরীয় আরমিনিয়াম ভ্যাম্বারী (১৮৩২-১৯১৮)। তিনি তুর্কী ভাষা, সাহিত্য ও জাতীয় ঐতিহ্যকে দেশপ্রেমের সাথে সম্পৃক্ত করে তুলে ধরেন। তিনি সমাজের উঁচুস্তরের রাজনীতিবিদ ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হন এবং ক্রমান্বয়ে তাদেরকে তুর্কী জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন।

প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদের লক্ষ্য ছিল তাদের কাংখিত ভূমি প্যালেস্টাইন পুনরুদ্ধার করা। এ জন্য তাদের প্রাথমিক কৌশল ছিল তুর্কী খিলাফতকে ধ্বংস করে দিয়ে প্যালেস্টাইনের দিকে অগ্রসর হওয়া। তাদের দৃষ্টিতে এ কাজটি সহজ করার জন্য প্রয়োজন ছিল আরব ও তুর্কী মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী বিভেদ জাগিয়ে তোলা। এদের চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে নামেক কামাল, জিয়া পাশা ও জোয়াদাত পাশার মত জাতীয়তাবাদী নেতারা বিষয়টিকে উগ্রতার পর্যায়ে নিয়ে যান। অপরদিকে আরবদের মধ্যে কোনো তুর্কী বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু তুর্কীদের মধ্যে আরব বিদ্বেষ তীব্র হয়ে উঠলে আরবরাও তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে রক্ষার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠে। এরূপ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ইহুদী ও খ্রিস্টানরা। বৃটিশরা আরবের খ্রিস্টান মিশনারি ও পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে আরব জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শানিত করে তোল। প্রথমে তারা সফল হয় মিশর, সিরিয়া, লেবানন ও জর্ডানে। বৃটেন ও ফ্রান্সের এজেন্ট নাজীব আজৌরি ১৯০৪ সালে প্যারিস থেকে আরব জাতীয়তাবাদের পক্ষে Le Revel de La Nation Arabe নামক এক বই লিখেন এবং প্যারিসভিত্তিক আরব জাতীয়তাবাদী সমিতি গড়ে তোলেন। তিনি একটি ম্যাগাজিনও প্রকাশ করেন।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে বৃটিশরা ১৯১৬ সালে তুর্কীদের বিরুদ্ধে জর্ডানের শরীফ হোসেনকে (বাদশা হোসেনের দাদা) যুদ্ধে প্ররোচিত করে এবং সর্বাত্মক সহায়তা দেয়। শরীফ হোসেন ছিল বৃটিশ এজেন্ট। তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ (বাদশা হোসেনের বাবা) বৃটিশ জেনারেল কিচনারের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। শরীফ হোসেন তুর্কী খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বৃটিশ সরকারী কর্মকর্তা টি.ই. লরেন্স ও প্যালেস্টাইনে নিযুক্ত বৃটিশ কমান্ডার জেনারেল এলেনবী তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরবদের পক্ষে নেতৃত্ব দেয়। পাশ্চাত্যের ইহুদী ও খ্রিস্টানদের প্ররোচনায় আরব ও তুর্কী মুসলমানরা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শরীফ হোসেন ও কয়েকটি আরব গুপ্ত সংগঠন বৃটিশদের সাথে চক্রান্ত করে আরব বিশ্বকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করে। এর ফলশ্রুতিতে প্রথমেই প্রতিষ্ঠিত হয় প্যালেস্টাইনের বুকের উপর অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্র। বৃটিশরা দখলে নেয় মিশর, সাইপ্রাস, এডেন, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক ও পারস্য উপসাগরীয় শেখ শাসিত রাজ্যগুলো। ফ্রান্স দখল করে আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া ও মরক্কো। রাশিয়া দখলে নেয় আর্মেনিয়া। ইটালি উপনিবেশ স্থাপন করে লিবিয়ায়। তুর্কী খিলাফত একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিশাল সাম্রাজ্য ইস্তাম্বুল ও আনাতোলিয়ার একাংশে সীমিত হয়ে পড়ে।

১৯২২ সালে তুর্কী জাতীয়তাবাদীরা গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলিতে সমবেত হয়ে সুলতানের পদ বিলোপ করে। ১৯২৩ সালে তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কামাল পাশা দেশের প্রেসিডেন্ট হন। তিনি তুরস্কের ইসলামী ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারা চালু করার পদক্ষেপ নেন। আরবি ভাষাকে অফিস-আদালত ও শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিদায় দেন। তিনি দেশে পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করেন এবং তাঁর দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিল। কামাল পাশা তুরস্ককে একটি সেক্যুলার (লায়েকিজম) রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তবে ইসলামী আইন-কানুন তুর্কী সমাজে এমন শক্তভাবে শেকড় গেড়েছিল যে তা সহজে উপড়ে ফেলার উপায় ছিল না। এটা উপলব্ধি করে কামালা পাশা কতিপয় ইসলামী আইন-কানুনকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসেন। তিনি 'দিয়ানেত' নামক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত একটি ধর্মীয় সংস্থা গঠন করেন। ১৯৩৭ সালে দেশটির পার্লামেন্ট যে সংবিধান অনুমোদন করে তাতে সেক্যুলারিজমকে (লায়েকিজম) রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সে নীতি এখনও বহাল আছে। দেশটির সেনাবাহিনী ও সাংবিধানিক আদালত এ নীতি বহাল রাখার পক্ষে অত্যন্ত শক্ত ভূমিকা নিয়ে থাকে।

কামাল পাশা ও তাঁর দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টি ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ একদলীয় ব্যবস্থায় তুরস্কের ক্ষমতায় ছিল। ১৯৪৬ সালে দেশটিতে বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৫০ সালে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ২৪টি দলের মধ্যে অন্তত ৭টি দল রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামের ভূমিকা থাকার পক্ষে অবস্থান নেয়। এই নির্বাচনে মেন্দারেসের নেতৃত্বে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি জয়লাভ করে। আদনান মেন্দারেস প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি ইসলামী মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য মসজিদ নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মেন্দারেসের ইসলামপ্রীতি সেনাবাহিনী ও কামালপন্থীরা ভালো চোখে দেখেনি। কামালপন্থী ও কম্যুনিস্টরা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৬০ সালে দেশটির সেনাবাহিনী এক অভ্যুত্থান ঘটায় এবং মেন্দারেসের সরকারকে উৎখাত করে। মেন্দারেসকে সেক্যুলারিজমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করায় মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তাঁর দল ডেমোক্রাটিক পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। এ সময় রাষ্ট্র পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব বহাল রাখতে 'জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল' গঠন করা হয়। সেই থেকে তুরস্কের সংবিধান তথা কামালতন্ত্র ও পররাষ্ট্রনীতির সংরক্ষক হিসেবে সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়।

ষাটের দশকে সামরিক সরকারের অধিকতর পাশ্চাত্যপ্রীতি তুর্কী জনগণ ভালো চোখে নেয়নি। এ সময় মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব বেড়ে গেলে সরকারবিরোধী মনোভাব প্রবল হতে থাকে। রাজনীতিবিদরা তাদের জাতীয় স্বকীয়তা নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকেন। লেখকরাও ইসলামী রাজনীতির পক্ষে লিখতে থাকেন। এরূপ ক্রান্তিকালে নাজমুদ্দিন আরবাকান নামের একজন প্রকৌশলী ইসলামী রাজনীতির প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি প্রথমে ক্ষমতাসীন জাস্টিস পার্টিতে যোগ দেন। ঐ দলে নেতৃত্বের লড়াইয়ে টিকতে না পেরে তিনি ১৯৭০ সালে মিল্লি নিজাম পার্টি (ন্যাশনাল অর্ডার পার্টি) গঠন করেন। এ সময় বিরোধী দলগুলো সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করে।

১৯৭১ সালে দেশটিতে দ্বিতীয় দফা সামরিক শাসন জারী হয়। সামরিক সরকার সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এক বছর পরে আরবাকান মিল্লি সালামত পার্টি (ন্যাশনাল স্যালভেশন পার্টি) নামে নতুন দল গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এ দলটি অপ্রত্যাশিতভাবে প্রায় ১২ ভাগ ভোট পেয়ে পার্লামেন্টে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কোন দলই নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফলে কোয়ালিশন সরকার ছিল অবধারিত। এ সময় একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটলো। আরবাকানের মিল্লি সালামত পার্টি ও ইসলামের প্রতি উদার সুলেমান ডেমিরেলের এপি পার্টির মধ্যে সমঝোতা হলো না। বরং কামালপন্থী বুলেন্দ এসিভিটের রিপাবলিকান পার্টি আরবাকানকে সরকার গঠনে সমর্থন দেয়। আরবাকানের সরকার ১৯৭৪ সালে ১১ মাস ক্ষমতায় ছিল। আরবাকান পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য বিরোধী অবস্থান নেন। মেন্দারেসের মতো তিনিও ইসলামী মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য মসজিদ নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তুরস্কে বার বার ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়। পুরো সত্তর দশক জুড়ে তুরস্কে ডানপন্থী, বামপন্থী ও ইসলামপন্থীদের মধ্যে মারাত্মক কলহ-বিবাদের ফলশ্রুতিতে ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সালেই প্রায় ৩ হাজার রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ সুযোগে সামরিক বাহিনী ১৯৮০ সালে আবার ক্ষমতা দখল করে। সামরিক সরকার পার্লামেন্ট ভেংগে দেয় এবং সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় এবং ৫১৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার লোককে বিদেশ যেতে বাধা দেয়া হয়। অপরদিকে ৩০ হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে তুরস্ক থেকে বহিস্কার করা হয়। ১৪ হাজার তুর্কী নাগরিকের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। হাজার হাজার সরকারী কর্মচারীর চাকরীহরণ করা হয়। ৬ শতাধিক ক্লাব/সমিতি বন্ধ করে দেয়া হয়।

সামরিক সরকার চরম নির্যাতনের পর নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হয়। ১৯৮৩ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে তুরগুত ওজালের নেতৃত্বে মাদারল্যান্ড পার্টি ৪৫ ভাগ ভোট পেয়ে জয়লাভ করে। তিনি ইসলামের প্রতি উদার ছিলেন। প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পর তিনি হচ্ছেন তুরস্কের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি ১৯৮৮ সালে মক্কায় গমন করে পবিত্র হজ্জ সম্পাদন করেন। তাঁর আমলে ইসলামী মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। তিনি ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী এবং এরপর ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ থাকলেও আরবাকান ১৯৮৩ সালে গোপনে রাফাহ পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করে রেখেছিলেন। ১৯৮৭ সালে এক রেফারেন্ডামের ফলে রাজনৈতিক দলগুলো পুনরুজ্জীবিত হয়। এ সময় (১৯৮৭) অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তুরগুত ওজালের মাদারল্যান্ড পার্টি ৩৬ ভাগ ভোট পেয়ে পুনরায় জয়লাভ করে। ১৯৮৩ সালে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাফাহ পার্টি বেশ ভালো ফল করে। আরবাকানের পার্টি নতুন আত্মবিশ্বাসে এগুতে থাকে। সত্তর দশকে আরবাকানের পার্টি ছিল অনেকটা প্রাদেশিক ধাঁচের; কিন্তু নব্বই দশকে সে দলটি একটি আধুনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাতীয় দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দলটি গতানুগতিক ইসলামী নীতির পরিবর্তে 'জাস্ট

অর্ডার' শ্লোগান দিয়ে ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রাফাহ পার্টি ২১.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৫৮টি আসনে (৫৫০টির মধ্যে) জয়লাভ করে। রাফাহ পার্টির এরূপ জয়লাভের পেছনে কারণ কী? বিশ্লেষকদের মতে, কুর্দী সমস্যা সমাধানে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের নীতি গ্রহণ, নারী সমাজের ব্যাপক সমর্থন, শহুরে দরিদ্রদের পুনর্বাসনের আশ্বাস ও সমাজসেবামুলক কাজ ইত্যাদি কারণে দলটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তারা সততা ও নৈতিকতার প্রতি জোর দেয়। এছাড়া ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারা নগরীর নির্বাচিত মেয়রদ্বয় ছিলেন এ দলের। যারা ব্যাপক নাগরিক সুযোগ-সুবিধামুলক কর্মকাণ্ড দ্বারা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

রাফাহ পার্টির প্রাপ্ত ১৫৮টি আসন সরকার গঠনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তানসু সেলারের ট্রু পাথ পার্টির সমর্থন নিয়ে ১৯৯৬ সালে আরবাকান সরকার গঠন করেন। কিন্তু সিলারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনেক অভিযোগ ছিল। আরবাকান নির্বাচনের আগে অধিকতর ইসলামীকরনের কথা বললেও ক্ষমতায় গিয়ে উদার নীতি গ্রহণ করেন। তথাপি তিনি অনেক ক্ষেত্রে ইসলামীকরনের কাজ হাতে নেন। কিন্তু তা দলের নেতাকর্মীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তারা বিভিন্ন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ আনে। ক্ষমতায় আরোহণের কয়েক মাসের মাথায় আরবাকানের সরকার কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। কোয়ালিশন সরকারের অংশীদার তানসু সিলারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্তের বিষয়টি পার্লামেন্টারি কমিটি বার বার আটকে দিচ্ছিল। বিরোধী দল এর কঠোর সমালোচনা করে। আরবাকান নিজ দলের মধ্যেও সমালোচনার সম্মুখীন হন। ১৯৯৭ সালের দিকে দলের নেতাকর্মীরা ইরানী স্টাইলে বিপ্লবের দাবি জানায়। বিষয়টি সামরিক বাহিনী, প্রেসিডেন্ট ও সিভিল সোসাইটি– এই তিন শক্তিকে উত্তেজিত করে তোলে। সামরিক বাহিনী আরবাকানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগের জন্য চাপ দিতে থাকে। সেনাবাহিনীর চাপে ট্রু পাথ পার্টির সদস্যরা পার্লামেনন্ট থেকে পদত্যাগ করে। ফলে আরবাকান সরকার পার্লামেন্টের আস্থা হারান এবং পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন আরবাকানের নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটে। ১৯৯৮ সালে তুর্কী সাংবিধানিক আদালত রাফাহ পার্টিকে সেক্যুলার নীতি ভংগের দায়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। রাফাহ পার্টির নেতা-কর্মীরা বিকল্প পথে ভারচু পার্টি নামে আরেকটি দল গঠন করে। তারা ১৯৯৯ সালে নির্বাচনে অংশ নিয়ে ১৫.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান দখল করে এবং পার্লামেন্টে বিরোধী দলের আসনে বসে। রাফাহ পার্টির নবতর সংস্করণ হচ্ছে ভারচু পার্টি– এ অভিযোগে ২০০১ সালে এ দলটিকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

নানা কারণে আরবাকান সরকারের ব্যর্থতার পাশাপাশি বার বার দল নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে পার্টির নেতাকর্মীদের মধ্যে দলের কৌশল গ্রহণ প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দেয়। আরবাকান ক্রমান্বয়ে দলে কোনঠাসা হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে দলে বিভক্তি দেখা দেয়। আরবাকান সমর্থক পুরানো ধাঁচের নেতৃত্ব সংঘবদ্ধ হয়ে গঠন করে ফেলিসিটি পার্টি এবং সংস্কারবাদীরা গড়ে তোলে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একে পার্টি)।

পার্লামেন্টে রাফাহ পার্টির ৪৮ জন ফেলিসিটি পার্টিতে এবং ৫৩ জন একে পার্টিতে যোগ দেন। ইস্তাম্বুলের মেয়র রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান একে পার্টির নেতা নির্বাচিত হন।

একে পার্টি নতুন উদ্যেমে যাত্রা শুরু করে। তারা তুর্কী সেক্যুলার নীতি, পাশ্চাত্যমুখী পররাষ্ট্র নীতি, ইইউ ও ন্যাটো জোটে অংশগ্রহণ ও মুক্তবাজার নীতি অনুসরণের ঘোষণা দেয়। তাদের নতুন কৌশল বেশ কাজ দিল। ১৯৯৯ সালে নির্বাচনে অংশ নিয়ে দলটি ৩৪.৩ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করে। তারা পার্লামেন্টের ৫৫০ টি আসনের মধ্যে ৩৬৩ টি আসন লাভ করে যা দুই-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি। আরবাকানের ফেলিসিটি পার্টি মাত্র ২.৫ শতাংশ ভোট পায়। এ সময় বিরোধী দলের সম্মিলিত ভোট ছিল প্রায় ৫৩.৪ শতাংশ। তারা এরদোগান সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে আন্দোলন করলেও ২০০২ সালে নির্বাচনে জনগণ পুনরায় একে পার্টিকে বিজয়ী করে। বিরোধী দলের সম্মিলিত ভোট কমে দাঁড়ায় ১৪.৬ শতাংশে। নতুন ও তরুণ ভোটার, গরীব জনগোষ্ঠী ও কুর্দীরা একে পার্টিকে ভোট দেয়।

মিশর

১৮৮১ সালে মিশর বৃটিশ উপনিবেশের অধীনে চলে যাবার আশংকা দেখা দেয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শরীফ পাশার নেতৃত্বে গঠিত হয় আল-হিযবুল ওয়াতানী (জাতীয়তাবাদী দল)। ১৮৮২ সালে বৃটেন ও ফ্রান্স মিশর দখল করে নেয়। উপনিবেশিক শাসকরা ক্ষমতা দখল করে জাতীয়তাবাদী নেতাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। ১৯১৭ সালে মোস্তফা কামাল নামক একজন আইনজীবীর নেতৃত্বে গঠিত হয় ন্যাশনাল পার্টি। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটেন মুসলিম খিলাফতের কেন্দ্র তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং মিশরকে আশ্রিত রাজ্য হিসেবে গন্য করে। এ সময় মিশরের জনগণের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী ক্ষোভ ধুমায়িত হতে থাকে। আরেক জাতীয়তাবাদী নেতা সা'দ জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিশরে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে বৃটিশ সরকার ১৯২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। ১৯২৩ সালে সংবিধান গৃহীত হয় এবং এর আওতায় মিশরে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯২৭ সালে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন এবং এতে সা'দ জগলুল পাশার নেতৃত্বে ওয়াফদ পার্টি জয়লাভ করে।

মিশরে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তার এক পর্যায়ে ১৯৫২ সালে দেশটিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। সামরিক সরকারের ছত্রছায়ায় গঠিত হয় লিবারেল র‍্যালি পার্টি। এ দলের ব্যানারে দীর্ঘদিন সামরিক সরকারের একদলীয় শাসন চলে। ১৯৭৭ সালে সরকারের এক আদেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০টি ছোটবড় রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। উপনিবেশিক আমল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ৭/৮ টি রাজনৈতিক দল গঠিত হলেও কালক্রমে সেগুলো টিকে থাকতে পারেনি। কোনো কোনোটি আবার নাম পরিবর্তন করে নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন ১৯২৮ সালে হাসানুল

বান্নার নেতৃত্বে গঠিত ইখওয়ানুল মুসলেমীন (মুসলিম ব্রাদারহুড) রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে সক্রিয় ছিল।

বলাই বাহুল্য যে, মিশরে ১৮৫০-১৯৫২ সাল পর্যন্ত উপনিবেশিক ও রাজতান্ত্রিক শাসন, ১৯৫৩-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসন ও ১৯৫৭-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কর্নেল জামাল নাসেরের নেতৃত্বে একদলীয় শাসন এবং ১৯৭৭ সাল থেকে অদ্যাবধি নিয়ন্ত্রিত বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ১৯৭৭ সালের সংবিধান অনুযায়ী দেশটিতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ। অবশ্য সংবিধানে আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে কোরআন ও সুন্নাহকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ইখওয়ানুল মুসলেমীন (মুসলিম ব্রাদারহুড) ছাড়াও কেফায়া আন্দোলনসহ কোনো কোনো ইসলামী দল বিভিন্ন নামে সরকারের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সক্রিয় রয়েছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের স্বেচ্ছাসেবকরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরকারী বাহিনীর চাইতে বেশি বীরত্ব প্রদর্শন করে। রাজা ফারুকের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে এবং সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতাকর্মীরা ছিল অগ্রগামী। নানাবিধ সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে দলটি জনগণের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৪৯ সালে ব্রাদারহুডের নেতা হাসানুল বান্না আততায়ীর হাতে নিহত হন। ১৯৫২ সালে রাজা ফারুকের বিরুদ্ধে জেনারের নাজীব ও কর্নেল জামাল নাসেরের নেতৃত্বে দেশটিতে সামরিক অভ্যুত্থান হলে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে।

সামরিক সরকার প্রথমদিকে কিছু ভালো কাজ করলেও অচিরেই তাদের নানা কর্মকাণ্ড সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। নাজীব ও নাসেরের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতাকর্মীরা সক্রিয় হয়ে উঠে। তাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে জামাল নাসের দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যা আজও অব্যাহত আছে। এরপর থেকে দলটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে কাজ চালাচ্ছে। তারা দেশের জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অন্য দলের নামে বা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশ নিচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে ২০০৫ সালের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নির্বাচনে ব্রাদারহুডের নেতাকর্মীরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিপুল বিজয় লাভ করে। মোট ৪৪০টি আসনের এক-পঞ্চমাংশ তথা ৮৮টি আসনে তারা বিজয়ী হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হলে তারা আরো অনেক বেশি আসনে জয়ী হতো। ব্রাদারহুডের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে হুসনে মোবারক সরকার দলটির নেতাকর্মীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন ও হয়রানির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি অনেক নেতাকর্মীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

২০০৬ সালের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরকার মারাত্মক জোর-জবরদস্তির আশ্রয় নেয়। মোট ৫২০০০ আসনের মধ্যে ৮০ ভাগ আসনে তারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। বিরোধী দলগুলোকে দেয়া হয় মাত্র ১০০০টি আসন। পর্যবেক্ষকদের মতে এ নির্বাচনে

ভোটার উপস্থিতি ছিল মাত্র ৫ ভাগ বা তারও কম। ২০০৮ সালের নির্বাচনে সরকারী অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিবাদে ব্রাদারহুড পৌরসভা নির্বাচন বয়কট করে।

মিশরে বর্তমানে (২০০৮) বৈধ ২৪টি রাজনৈতিক দল থাকলেও তারা সরকারী দমন-নীতির কারণে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। পার্লামেন্টে মাত্র ৪টি বিরোধী দলের মাত্র ১৬টি আসন রয়েছে। স্বতন্ত্র ১১২টি আসনের মধ্যে ব্রাদারহুডের সমর্থক আছেন ৮৮ জন। সাম্প্রতিককালে ব্রাদারহুডের প্রায় ৪০ জন নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে তাদেরকে সামরিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মিশরে প্রকৃত গণতন্ত্রের চর্চা তথা নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হলে ব্রাদারহুডের বিপুল বিজয়কে ঠিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। তবে মার্কিন সমর্থিত হুসনে মোবারক সরকার দমন নীতির মাধ্যমে কতদিন ক্ষমতায় থাকবে তা বলা কঠিন।

মালয়েশিয়া

১৮৬৭ সাল থেকে বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি মালয়েশিয়া শাসন করা শুরু করে এবং ক্রমান্বয়ে তা সম্প্রসারিত হতে থাকে। মালয়েশিয়ানরা ১৮৭৬ সাল থেকে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে জাপান মালয়েশিয়া দখল করে নেয়। বৃটিশ শাসকদের সহায়তায় গঠিত কম্যুনিস্ট পার্টি (প্রধানত চীনা বংশোদ্ভূত) জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। জাপানও তাদের সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হয়ে জাপান আত্মসমর্পণ করে এবং মালয়েশিয়ায় অভ্যন্তরীণভাবে মারাত্মক বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ সময় মালয়েশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতা গ্রহণের চেষ্টা করে এবং অধিকন্তু তারা জাপান সমর্থক মালয়দের উপর চরম নির্যাতন চালায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে চীন ও মালয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত দেখা দেয়। বৃটিশ সরকার কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে।

১৯৪৬ সালের দিকে বৃটিশ সরকার মালয়েশিয়ার স্বশাসনের প্রস্তাব দিলে তা বিবেচনার জন্য মালয়েশিয়ার প্রায় ৪১টি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন একত্রিত হয়ে ইউনাইটেড মালয়েজ ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (ইউমনো) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। ১৯৪৮ সালে মালয়, সাবাহ, সারওয়াক ও সিংগাপুর নিয়ে গঠিত হয় মালয় ফেডারেশন। উপনিবেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত হয় পৌরসভা নির্বাচন। এ নির্বাচনে ইউমনো ও মালয় চাইনিজ এসোসিয়েশন যৌথভাবে ১২টি আসনের মধ্যে ৯টি আসন লাভ করে। নিবাচনী ফলাফলে উৎসাহিত হয়ে এ দু'টি সংগঠন বৃহত্তর রাজনৈতিক জোট গঠনের উদ্যোগ নেয়। পরবর্তীতে মালয় ইন্ডিয়ান কংগ্রেসও জোটে যোগ দেয়। এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন টেংকু আবদুর রহমান। নতুন রাজনৈতিক জোট স্বাধীনতা লাভ ও বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য বৃটিশ সরকারের সাথে দেনদরবার চালাতে থাকে। ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় ফেডারেল নির্বাচন। এতে জোট ৫২টি আসনের মধ্যে ৫১টিতেই জয়লাভ করে। একমাত্র ইসলামী দল প্যান-মালয়ান ইসলামিক পার্টি মাত্র ১টি আসন পায়। ১৯৫৭ সালের ৩১ আগস্ট বৃটিশ

সরকারের কাছ থেকে মালয়েশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। সংবিধান অনুযায়ী দেশে পার্লামেন্টারি রাজনৈতিক পদ্ধতি চালু হয়। টেংকু আবদুর রহমান দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ইউনাইটেড মালয়েজ ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (ইউমনো) নেতৃত্বাধীন ১৩ দলীয় মহাজোট বরিসান ন্যাশনাল (গ্রান্ড কোয়ালিশন) মালয়েশিয়ার প্রতিটি নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। গ্রান্ড কোয়ালিশনের নেতৃত্ব দেন ডা. মাহাথির মোহাম্মদ। তিনি দীর্ঘদিন সরকারের নেতৃত্ব দিয়ে দেশটিকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়ণশীল দেশের সামনের কাতারে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। মাহাথির পাশ্চাত্যের কঠোর সমালোচক ও উন্নয়ণশীল বিশ্বের স্বার্থের পক্ষে একজন জোরালো প্রবক্তা হিসেবে বিশ্বে আলোচিত ব্যক্তিতে পরিণত হন। ২০০১ সালে তিনি ক্ষমতার ২০ বছর পূর্তি পালন করেন। দেশটিতে ১৯৫৭ সাল থেকে নির্ধারিত সময় অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হলেও ক্ষমতাসীনদের কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা ও কর্মকাণ্ড গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সহায়ক নয় বলে মনে করেন বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। কারো কারো মতে, মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক পদ্ধতিটি পুরোপুরি গণতান্ত্রিক নয়; বরং আধা-কর্তৃত্ববাদী (semi-authoritarian), আধা-গণতান্ত্রিক (semi-democratic or quasi-democratic)। জেসুডাসন নামক একজন বিশ্লেষক দেশটিকে syncretic-state নামে আখ্যায়িত করেন।

উল্লেখ্য, মালয়েশিয়ার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬৫ শতাংশ মালয়ী (ভূমিপুত্র) যাদের সকলেই মুসলমান, ২৬ শতাংশ চীনা বংশোদ্ভূত, ৮ শতাংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং ১ শতাংশ অন্যান্য নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠী। মহাজোট তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাফল্যের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে পাশাপাশি পশ্চাৎপদ সংখ্যাগরিষ্ঠ মালয় মুসলিমদের স্বার্থরক্ষা ও তাদের অধিকতর উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। ডা. মাহাথির ও তাঁর উত্তরসূরি আবদুল্লাহ বাদাবি উভয়ই ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত করার দৃঢ়নীতি অনুসরণ করেন। তারা আধুনিকতা, শিল্পায়ন ও ইসলামী শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের কৌশল গ্রহণ করেন।

ইসলামিক পার্টি অব মালয়েশিয়া (পাস) দেশটির প্রধান ইসলামী রাজনৈতিক দল। ছাত্র ও যুবকদের মধ্যেও ইসলামী সংগঠনের তৎপরতা রয়েছে। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী যুব সংগঠন আংকাতান বেলিয়া ইসলাম মালয়েশিয়া (আবিম)-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আনোয়ার ইব্রাহিম। একজন পার্লামেন্ট সদস্যের পুত্র আনোয়ার ইব্রাহিম তাঁর প্রতিভা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে দারুন জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মাহাথির তাঁকে সরকারে অন্তর্ভুক্ত করেন। আনোয়ার তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতা দ্বারা একে একে অর্থমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী পদে পৌছে যান। মাহাথির তাঁকে নিজের উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচনা করতে থাকেন। কিন্তু কিছু কিছু নীতিগত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মাহাথিরের সাথে তাঁর মতপার্থক্য দেখা দিলে ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁকে উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও সমকামিতার

অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। আনোয়ার বলেন, মতপার্থক্য ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য তাঁকে অপসারণ করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন আদালত তাঁকে ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে বিভিন্ন দফায় মোট ৯ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

১৯৯৯ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনে মহাজোট পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়। তবে তাদের আসন সংখ্যা পূর্বের ৯৪ থেকে ৭২টিতে নেমে আসে। অপরদিকে ইসলামী দল পাস এর আসন সংখ্যা ৪২টিতে বৃদ্ধি পায়। দলটি পূর্বের মত কেলাংতান প্রদেশে ক্ষমতা ধরে রাখে এবং অধিকন্তু তেরেঙানু প্রদেশেও সরকার গঠনে সক্ষম হয়। ২০০৩ সালে মাহাথীর রাজনীতি থেকে বিদায় নেন। ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনেও মহাজোট পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়। এবারে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি তেরেঙানু প্রদেশেও ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে। জোট এ নির্বাচনে অবিশ্বাস্যভাবে ৯২ শতাংশ ভোট পায়। এরূপ নিরংকুশ বিজয়ে মাহাথির বলেন,

"I believe the country should have a strong government, but not too strong. A two-third majority like I enjoyed when I was Prime Minister is sufficient; a 90% majority is too strong... we need an opposition to remind us if we are making mistakes. When you are not opposed you think everything you do is right."

বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্বেও মহাজোটের বিরুদ্ধে নির্বাচনে কারচুপি, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক সংকট বিশেষত মুদ্রাস্ফীতি, অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি ও জাতিগত উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা ইত্যাদি অভিযোগে বিরোধী দলগুলো আন্দোলন ও প্রতিবাদ গড়ে তোলে। আনোয়ার ইব্রাহিমের স্ত্রী আজিজার নেতৃত্বে গঠিত হয় পিপলস জাস্টিস পার্টি।

২০০৬ সালে আনোয়ার ইব্রাহিম কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদার করেন। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনে মহাজোটের বিরাট বিপর্যয় ঘটে। কোনোভাবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে পারলেও ১২টি রাজ্যসভার ৫টি চলে যায় বিরোধী দলের হাতে। ইসলামী দল পাস এর আসন সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পায়। আনোয়ার ইব্রাহিম প্রথমে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে না পারলেও পরবর্তীতে উপনির্বাচনে জোটের শক্তিশালী প্রার্থীকে ১৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। আনোয়ার রাজনীতিতে পুরোদমে পুনর্বাসিত হন। উল্লেখ্য যে, মালয়েশিয়ার ইসলামী দলগুলো ক্রমান্বয়ে ভালো করলেও তারা কিন্তু সরাসরি ইসলামী রাষ্ট্রের কথা না বলে 'সুশাসন' ও 'ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি জোরের সাথে উল্লেখ করেন।

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশজ ও বাহ্যিক উপাদান যেমন; ধর্ম, উপনিবেশিকতা, জাতীয়তাবাদী চেতনা ইত্যাদি সংমিশ্রণে বিকশিত হচ্ছে।

১৭৯৯ সালে ডাচরা দেশটির শাসনভার দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও সময় জাপান ইন্দোনেশিয়ার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জাপান আত্মসমর্পন করলে জাতীয়তাবাদী নেতা ড. সুকর্ন ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পার্লামেন্টারি পদ্ধতির রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলে যাত্রা শুরু করলেও সুকর্ন ১৯৫৯ সালে তথাকথিত 'নির্দেশিত গণতন্ত্র' চালু করেন। স্বাধীনতার পর থেকেই এ অঞ্চলে কম্যুনিস্ট মতাদর্শের বিস্তার রোধে যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়াকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছিল।

১৯৬৫ সালে জেনারেল সুহার্তো কম্যুনিস্ট অভ্যুত্থান প্রতিহত করার কথা বলে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি দীর্ঘ ৩৩ বছর একচ্ছত্র ও স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ শাসন করেন। তাঁর আমলে রাজনৈতিক নিপীড়ন এত বেশি ঘটে যে, বলা হয়ে থাকে, তিনি প্রায় ১০ লক্ষ রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করেন। অবশেষে ১৯৯৮ সালে তিনি গণআন্দোলনের মুখে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর বিজে হাবিবি (১৯৯৮-৯৯), আবদুর রহমান ওয়াহিদ (১৯৯৯-২০০১) ও মেঘবতী সুকর্নপুত্রী (২০০১-০৪) প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেন সুসিলো বামবাং। সামরিক বাহিনী সমর্থিত গোলকার পার্টি তাঁকে সমর্থন দেয়।

তিনটি প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার আইনসভা গঠিত: (১) ৫৫০ সদস্য বিশিষ্ট হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ, (২) ১২৮ সদস্য বিশিষ্ট রিজিওনাল রিপ্রেজেনটেটিভ কাউন্সিল, ও (৩) উক্ত দু'টো সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত পিপলস কনসালটেটিভ এসেম্বলী। শেষোক্ত সংস্থাটি সংবিধান সংশোধন ও প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অনাস্থার বিষয় বিবেচনা করে।

ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনী দেশটির রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান। এমনকি পার্লামেন্টেও তাদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীকে উপেক্ষা করা কঠিন। দেশটির রাজনীতি ও সমাজ জীবনে ঐতিহাসিকভাবে ইসলামী মূল্যবোধের একটি বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। উপনিবেশিক আমলে ১৯১২ সালে মোহাম্মদীয়া পার্টি ও ১৯২২ সালে নাহদাতুল উলেমা পার্টি গঠিত হয়। এ দু'টো সংগঠনেরই বহু শাখা-প্রশাখা ও জনপ্রিয়তা ছিল। আধুনিক শিক্ষিত লোকদের ইসলামী পার্টি ছিল মাসজুমী পার্টি। ১৯৫৯ সালে মাসজুমী পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

সাম্প্রতিককালে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী চেতনার ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পিকেএম জাস্টিস পার্টি ইসলামী দল হিসেবে ভোটারদের মধ্যে কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে এ দলটি মাত্র ১টি আসন পায়। ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনে এ দলটি ২০ ভাগ ভোট পেয়ে ৪৫টি আসন লাভ করে। এ নির্বাচনে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের কথা না বলে সুশাসনের প্রতি বেশি জোর দিয়েছিল। ২০০৬ সালের

নির্বাচনে তাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৯ শতাংশে নেমে আসে। ২০০৬ সালে পরিচালিত এক জনমত জরিপে দেখা যায়, দেশটির ৪৩ ভাগ ভোটার সেক্যুলার পার্টিকে সমর্থন করে। মাত্র ৫ ভাগ ভোটার ইসলামী শাসন চায়। ইন্দোনেশিয়ায় অন্যান্য ইসলামী দলের মধ্যে রয়েছে: হিযবুত তাহরীর ও ইসলামিক ডিফেন্ডারস ফ্রন্ট। দু'টো দলই বেশ সক্রিয়।

সুদান

১৮২১ সালে মিশর সুদান দখল করে। পরবর্তীতে মিশর ও বৃটেন যৌথভাবে দীর্ঘদিন দেশটি শাসন করে। ১৮৮১ সালে মুহাম্মদ আহমদ নামে একজন সুদানী মুসলিমের নেতৃত্বে দেশটির জনগণ মিশর ও বৃটেনের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এরপর ১৯৪০-১৯৫২ সালের সময়কালে সুদানের স্বাধীনতা আন্দোলন বেগবান হয়। ১৯৫৬ সালের ১ জানুয়ারী মিশর ও বৃটেন সুদানের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতা আন্দোলন ও পরবর্তীকালে দেশটিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে জেনারেল ইব্রাহিমের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে এবং সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৬৪ সালে গণআন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব পুনরায় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়।

মাত্র ৫ বছরের ব্যবধানে আবার ১৯৬৯ সালে জেনারেল জাফর নিমেরীর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। তিনিও সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। নিমেরী ১৯৭১ সালে দেশটির প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৭৩ সালে সুদানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। এতে প্রেসিডেন্টকে প্রভূত ক্ষমতা দেয়া হয়। মাত্র একটি রাজনৈতিক দল অনুমোদন পায়। সেটি সুদানী সোসালিস্ট ইউনিয়ন এবং প্রেসিডেন্ট নিমেরী নিজেই তার প্রধান হন। বেশ কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক দল সক্রিয় ছিল। তাদের তৎপরতায় নিমেরী ইসলামপন্থীদের সমর্থন লাভের জন্য দেশে শরীয়াহ আইন চালু করার উদ্যোগ নেন। পাশাপাশি তিনি প্রাদেশিক সরকার পদ্ধতি বাতিল করে দেন। দক্ষিণাঞ্চলের খ্রিস্টানরা এর বিরোধিতা করে।

১৯৮৫ সালে জেনারেল আবদুল রহমান আলদাহার আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি পার্লামেন্টারি পদ্ধতি বাতিল ও সোসালিস্ট ইউনিয়ন পার্টিকে নিষিদ্ধ করেন। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত হয় পার্লামেন্ট নির্বাচন। ইসলামী দল উম্মাহ পার্টি নির্বাচনে জয়লাভ করে সাদেক আল মাহদীর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। ১৯৮৯ সালে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওমর হাসান আল বশীর আরেক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটান। তিনি পার্লামেন্ট বাতিল করেন এবং ১৩ সদস্যের বিপ্লবী সামরিক কাউন্সিল গঠন করেন। উম্মাহ পার্টির নেতা সাদেক আল মাহদী ও ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট নেতা হাসান আল তুরাবীসহ বহু রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। দেশের ৪০টি প্রকাশিত পত্রিকার ৩৬টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। সামরিক জান্তা ওমর হাসান আল বশীর কয়েক মাসের মধ্যেই বুঝতে পারেন যে, তাঁকে

ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে ইসলামিক গ্রুপের সহায়তা নিতে হবে। এক পর্যায়ে তিনি ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট নেতা হাসান আল তুরাবীর সাথে সমঝোতায় উপনীত হন এবং তুরাবীর নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের এক পরিষদ গঠন করেন। ১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্টের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি। কিন্তু জেনারেল বশীরের সাথে তুরাবীর সুসম্পর্ক বেশিদিন টিকেনি। ১৯৯৯ সালে তাদের বিরোধ তুঙ্গে পৌছে। তুরাবী পদত্যাগ করেন। জেনারেল বশীর পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন, সংবিধান স্থগিত করেন এবং দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

জরুরি অবস্থার মধ্যেই ২০০০ সালে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালে পার্লামেন্ট পুনরুজ্জীবিত হলেও জরুরি অবস্থা বহাল থাকে। ১৯৯৮ সালে সুদানের দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহীরা সুদানীজ পিপলস লিবারেশন আর্মি গঠন করে। বিদ্রোহীদের সাথে একটা সমঝোতায় উপনীত হতে হাসান আল তুরাবী একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। জেনারেল বশীর এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তুরাবীকে গ্রেফতার করেন। ২০০৫ সালে প্রেসিডেন্ট বশীর দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহীদের নিয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। পাশাপাশি সরকার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করে। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনার ঝড় উঠে। ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক আদালত প্রেসিডেন্ট বশীরের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের জন্য গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হরে।

মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

তুরস্ক, মিশর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে নির্বাচনে ভোটারদের আচরণে একটি অভিন্ন প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, তুরস্ক ব্যতীত অন্যান্য দেশগুলোর এক সময় ইউরোপীয় উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধীনে দীর্ঘকাল যাবৎ শাসিত হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। উপনিবেশিক শক্তি শুধু শাসন করেই ক্ষান্ত হয়নি; তারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে গেছে যার নেতিবাচক প্রভাব আজও তাদেরকে বহন করতে হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, প্রায় প্রতিটি দেশই উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে স্বাধীনতা অর্জন করে। এরূপ আন্দোলন সংগ্রামের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা। কোনো কোনো দেশের আন্দোলনে আলেম সমাজ বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয়ত, সকল দেশই বৃটিশ পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করে স্বাধীন দেশের কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু পরে কোনো দেশেই তা তেমন টেকসই হয়নি। স্বৈরতান্ত্রিক ও সামরিক শাসনের যাঁতাকলে প্রায় প্রতিটি দেশকেই নিস্পেষিত হতে হয়েছে। একমাত্র মালয়েশিয়া বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যেও পার্লামেন্টারি পদ্ধতিকে

নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে নিতে পেরেছে। অন্যান্য দেশে চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তেমন একটা আসেনি। অবশ্য সাম্প্রতিককালে তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কিছুটা স্থিতিশীলতা পাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

চতুর্থত, একমাত্র মালয়েশিয়া ব্যতীত অন্যান্য দেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছে এবং তা এখনো চলছে। সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল, সংধিান বাতিল বা স্থগিতকরণ, জরুরি অবস্থা জারীকরণ, নানা ছলছুতায় দীর্ঘকাল ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকা ইত্যাদির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্যাহত করা মুসলিম দেশগুলোর সাধারণ রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

পঞ্চমত, সকল দেশই পার্লামেন্টারি পদ্ধতির আওতায় বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাত্রা শুরু করে। মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্বলিত দলগুলোর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হলেও পরবর্তীতে উদার গণতান্ত্রিক, সমাজতন্ত্রী-কম্যুনিস্ট, ইসলামপন্থী সকল মতাদর্শের রাজনৈতিক দলের বিকাশ ঘটে। এর মধ্যে ইসলামপন্থী ও কম্যুনিস্টরা আবার অপেক্ষাকৃত অধিকতর নিপীড়নের শিকার হয়।

ষষ্ঠত, প্রায় প্রতিটি দেশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আর্থিক ও সামরিক সহায়তা পেয়ে আসছে। একমাত্র ইরান যুক্তরাষ্ট্রের চোখ রাঙানিকে ভয় না করে এখনও মাথা উঁচু করে চলেছে। সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক মর্যাদাপূর্ণ নয়। মিশর, তুরস্ক, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনীর উপর মার্কিন প্রভাব সকলের কাছে দৃশ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রের চাপে মিশর ও তুরস্ক ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের 'ওয়ার এগেইনস্ট টেরর' নীতির অন্যতম সহযোগী হিসেবে গণ্য করা হয়। মালয়েশিয়ার রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রভাব বিশেষভাবে দৃশ্যমান না হলেও সম্প্রতি তারাও ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনীর সাথে 'ওয়ার এগেইনস্ট টেরর' কর্মসূচিতে সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। মালয়েশিয়ার নেতা মাহাথির মোহাম্মদ পাশ্চাত্যকে তেমন পাত্তা দিতেন না। বরং কখনো কখনো কঠোর সমালোচনাও করতেন। সুদানের প্রেসিডেন্ট বশীর ইতোমধ্যে পাশ্চাত্যের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছেন। এর আগে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফী এবং সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদ ও পরবর্তীতে তাঁর ছেলে প্রেসিডেন্ট বাশারও পাশ্চাত্যের কাছে অপ্রিয়ভাজন বলে চিহ্নিত হয়েছেন। তুরস্কের এরদোগান সরকার পাশ্চাত্যের সাথে কৌশলগত আপস করে চলেছে। সব ক'টি দেশই ইউএসএআইডি, আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংক থেকে উন্নয়ন কার্যক্রম ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অর্থায়ন সহায়তা নিয়ে থাকে।

সপ্তমত, প্রায় প্রতিটি দেশেই জাতীয়তাবাদ ও সেকুলারিজম বেশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। তুরস্কে সাংবিধানিকভাবেই ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা রাখা হয়েছে। মিশর ও তুরস্কে ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন করা যায় না। তুরস্ক ব্যতীত সকল দেশেই ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। প্রায় সকল দেশেই

শক্তিশালী ইসলামী রাজনৈতিক দল রয়েছে। আবার সকল দেশেই আইনের উৎস হিসেবে শরীয়াহকে কমবেশি স্বীকৃতি দেয়া হয়।

অষ্টমত, প্রায় প্রতিটি দেশেই আঞ্চলিক, নৃতাত্বিক বা ধর্মীয় কারণে গোষ্ঠীগত সংঘাতের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এ জন্য তাদেরকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে বা হচ্ছে। তুরস্কের কুর্দী বিদ্রোহী, সুদানের দারফুর বিদ্রোহী, ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুর ও আচেহ প্রদেশের সংঘাত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জাতিগত সংঘাত (১৯৭১), মালয়েশিয়ায় চীনা ও ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ইত্যাদি এসব দেশের রাজনীতিতে মতপার্থক্য ও স্বার্থগত দ্বন্দ্বকে মাঝে মধ্যে জটিল করে তুলে এবং বিদেশী শক্তি তা থেকে সুবিধা নেয়।

নবমত, প্রতিটি দেশেই শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলন বা রাজনৈতিক দল রয়েছে। তারা ক্রমান্বয়ে অধিকতর জনভিত্তি গড়ে তুলছে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক দক্ষতা অর্জন করছে। তাদের এই শক্তি বৃদ্ধি আবার তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কোনো কোনো দেশে তারা সরকারী নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। মিশরের ব্রাদারহুড, সুদানের হাসান আল তুরাবীর ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি এবং তুরস্কে আরবাকানের পার্টিকে সামরিক সরকারের কোপানলে পড়ে বার বার নাম পাল্টাতে হয়েছে। সুদান ও পাকিস্তানের ইসলামী দল সামরিক সরকারের সাথে ক্ষমতার অংশীদার হলেও তার ফল ভালো হয়নি।

দশমত, আলোচ্য দেশগুলোর পার্লামেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বলে গন্য করার সুযোগ কম থাকলেও স্পষ্টতই লক্ষ্যনীয় যে, পূর্ণাংগ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীতির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ দলগুলো নির্বাচনে ভোটারদের মধ্যে বিশেষ একটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারছে না। এ পর্যন্ত কোনো দেশেই ইসলামী নামধারী দলগুলো গড়ে ২০ ভাগের বেশি ভোট পায়নি। কোনো এক নির্বাচনে মোটামুটি ভালো ফল করলেও তা আর টেকসই হয়নি। অধিকাংশ দেশেই পূর্ণাংগ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীতির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ ভোটার সংখ্যা মাত্র ৫-৭ ভাগের মত। সেক্যুলার বা জাতীয়তাবাদী দলগুলোর প্রতি ভোটারদের আকর্ষণ বেশি বলে প্রতীয়মান হয়। পাশাপাশি প্রায় সব দেশেই সমাজতন্ত্রী বা কম্যুনিস্ট মতাদর্শের দলগুলোর ভোট প্রাপ্তির হার বেশ হতাশাব্যঞ্জক।

একাদশত, ট্রাডিশনাল বা প্রচলিত পুরানো ধাঁচের ইসলামী দলগুলোর চাইতে যে সব ইসলামী দল সমাজকল্যাণমূলক কাজ এবং সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বেশি বলছে ভোটাররা তাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে। তুরস্কের এ কে পার্টি ও মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মালয়েশিয়ায় আনোয়ার ইব্রাহিমের নবগঠিত জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির কথাও বলা যেতে পারে। তবে পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামী দীর্ঘকাল অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশে কাজ করেও কেন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারছে না তা এক গবেষণার বিষয়। একইভাবে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীই বা কেন তেমন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে না তাও পর্যালোচনার দাবি রাখে।

দ্বাদশত, মুসলিম দেশগুলো বহু সমস্যা মোকাবিলা করে পার্লামেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষতার সাথে এগিয়ে নিতে চাইলেও পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র ও দেশীয় কুচক্রীদের

কারণে তা টেকসই হতে পারছে না। বিভিন্ন সময়ে মিশর, তুরস্ক, আলজেরিয়া, প্যালেস্টাইন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও সাম্প্রতিককালে ইরানে বিদেশী ষড়যন্ত্র নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নানাভাবে হুমকির মুখে ফেলেছে।

বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোর ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশে গত তিন-চার দশকের ইসলামী রাজনীতি প্রত্যাশিত সুফল বয়ে আনতে পারেনি। সেক্যুলার আওয়ামী লীগ, জাতীয়তাবাদী বিএনপি ও সুবিধাবাদী জাতীয় পার্টি ঘুরে ফিরে বিভিন্ন মেয়াদে ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু এ তিনটি দলের বৈশিষ্ট কম-বেশি একই। মূলত ক্ষমতার মোহ, বস্তুগত স্বার্থলিপ্সা, অসততা ও অদক্ষতা, প্রতিহিংসা পরায়ণতা ইত্যাদি কারণে জাতি খুব বেশি আগাতে পারেনি। ইসলামী দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া অন্যান্য দলগুলোর সাংগঠনিক ও জনভিত্তি উল্লেখ করার মতো নয়।

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর কোনো বিকল্প আপাতত দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সবচেয়ে পুরানো রাজনৈতিক দল হওয়া সত্বেও জামায়াত নির্বাচনী দৌড়ে বেশ পেছনে পড়ে আছে। বাস্তবতা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সততার সুনাম থাকা সত্বেও বর্তমান নেতৃত্ব নিয়ে জামায়াতের পক্ষে ভবিষ্যতে এককভাবে সরকার গঠনের মত জনপ্রিয়তা অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয় বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন। জামায়াতে ইসলামীর সীমাবদ্ধতা নিয়ে নিম্নের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা যেতে পারে:

(এক) ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করায় জামায়াতের প্রথম সারির বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রচারণা থাকায় সর্বজন গ্রহণযোগ্য জাতীয়ভিত্তিক ইমেজ বিল্ডিং তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে, যে কোনো দেশে বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। ১৯৭১ সালে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল এবং বলাই বাহুল্য ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও দেশের জনগণ আওয়ামী লীগের পক্ষে বিরাট সমর্থন দিয়েছিল। গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী আওয়ামী লীগেরই সরকার গঠনের অধিকার ছিল। কিন্তু পাকিস্তানী সামরিক জান্তা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা সৃষ্টি করে এবং অধিকন্তু পাশবিক ও নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞ চালায়। কোনো বিবেকবান মানুষ তা সমর্থন করতে পারে না। জামায়াত ভারতের আধিপত্যবাদী আচরণের আশংকা থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করার বিষয়টি রাজনৈতিক মতপার্থক্য হিসেবে গন্য করা গেলেও পাকিস্তানী সামরিক জান্তার পক্ষে যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল তা দেশের জনগণ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হয়নি। পাকিস্তানী সামরিক জান্তার পরাজয়ের সাথে সাথে জামায়াতের রাজনৈতিক কৌশলেরও পরাজয় ঘটেছে। কোনো পরাজিত শক্তির পক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের নেতৃত্ব দেয়ার নৈতিক অধিকার থাকে না। প্রায় চার দশকের ব্যবধানে বিষয়টি জাতি ভুলতে বসেছিল; কিন্তু সেক্যুলার রাজনৈতিক দল, মিডিয়া ও সিভিল সোসাইটি বিষয়টিকে প্রচার-প্রপাগান্ডার

মাধ্যমে আবার জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এর কারণ হলো: আওয়ামী লীগের পরিবর্তে বিএনপির সাথে জামায়াতের রাজনৈতিক জোট গঠন করা। বিষয়টি সাধারণ জনগণের মধ্যে কতটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা পরিমাপ করা না গেলেও নতুন প্রজন্মের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তা বলা যেতে পারে। এর পেছনে প্রতিবেশী দেশ ও আন্তর্জাতিক স্বার্থান্বেষী মহলের মদদ রয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি সামনে চলে আসায় এটি আরো জটিল আকার ধারণ করতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন, আশা করা যায় জামায়াত নেতৃত্বকে দোষী সাব্যস্ত করা সহজ/সম্ভব হবে না, তাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে বিষয়টি একবারে চিরদিনের জন্য সুরাহা হয়ে যাবে। কিন্তু ভিন্নমতও রয়েছে। তাদের ধারণা সরকার ইস্যুটিকে সহজে শেষ করবে না। বরং নানা অজুহাতে এটাকে জিইয়ে রাখতে চাইবে। কারণ সরকার আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নিজ স্বার্থেই বিষয়টিকে ঝুলিয়ে রাখবে। পাশাপাশি নেতিবাচক প্রচার-প্রপাগান্ডা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। এমতাবস্থায়, জামায়াতের রাজনৈতিক ইমেজ পুনরুদ্ধার বা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

(দুই) শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বের দুর্বলতা

দলটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বে কেউ কেউ বৃদ্ধ ও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং নতুন উদ্যমে দলকে এগিয়ে নেয়ার মতো সামর্থ তাদের নেই।

(তিন) সংগঠনে রেজিমেন্টেড এনভায়রনমেন্ট

জামায়াতের বদ্ধদুয়ার পরিবেশ (রেজিমেন্টেড এনভায়রনমেন্ট) থাকায় ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন উদারনৈতিক ব্যক্তিরা ঐ দলে প্রবেশ করতে পারে না। দলটিতে সৎ মানুষের অভাব না হলেও দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেয়ার মতো উপযুক্ত ও দক্ষ লোকের অভাব রয়েছে। জামায়াতের বাইরে যেসব সৎ ও দক্ষ লোক রয়েছে তারা যে কোনো পর্যায়ে জামায়াতে যোগ দিতে উৎসাহবোধ করে না। এর প্রধান কারণ- প্রথমত, জামায়াতের বদ্ধদুয়ার পরিবেশ; দ্বিতীয়ত, জামায়াতের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা।

(চার) নেতিবাচক প্রচার-প্রপাগান্ডা

বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম ও কতিপয় বুদ্ধিজীবী জামায়াতকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, স্বাধীনতাবিরোধী ইত্যাদি অভিধায় আখ্যায়িত করে দলটিকে মোটামুটি বিতর্কিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। জামায়াত নেতাকর্মীরা এটা সরাসরি কতটা উপলব্ধি করে, তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভোটারদের মধ্যে এর বেশ প্রভাব পড়েছে।

(পাঁচ) রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আধুনিক ধ্যান-ধারণার অভাব

বিশ্বায়নের পরিবর্তনের ধারায় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আধুনিক ধ্যান-ধারণা নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে জামায়াত নেতাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আইন প্রণয়ন, উন্নয়ন কৌশল, অর্থনীতি ও পররাষ্ট্র নীতির মত মৌলিক বিষয়ে জামায়াতের বক্তব্য

জনগণের কাছে যেমন স্পষ্ট নয়; তেমনি আকর্ষনীয়ও নয়। সমস্যা সংকুল বাংলাদেশের বেশ কিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে। সব দলই এসব বিষয়ে কোনো না কোনো বক্তব্য দিয়ে থাকে। এসব সমস্যার অগ্রাধিকার নির্ণয় করে জামায়াত উত্তম বিকল্প কোনো সমাধানের দিকনির্দেশনা জাতির সামনে পেশ করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির অসৎ নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে জামায়াত নেতারা তাদের দলকে জাতির সামনে তুলে ধরতে পারেননি।

(ছয়) ভোটের রাজনীতিতে কৌশলের অভাব

বাংলাদেশে ভোটের রাজনীতিতে কিছু কৌশলের আশ্রয় না নিলে নির্বাচনে জয়লাভ করা যায় না। এক্ষেত্রে জামায়াতের বেশ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, জামায়াত ভোটারদের চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কথা বলার পরিবর্তে ইসলামী আদর্শের প্রতি ভোটারদের বেশি আহ্বান করে যা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের নির্বাচনী সংস্কৃতির সাথে খাপ খায় না। দ্বিতীয়ত, ভোটের রাজনীতিতে বিপুল অর্থ ব্যয়, অপব্যয় ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়। এসব প্রবণতা যেমন ইসলামী আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, তেমনি সেগুলো না করলে নির্বাচনী সাফল্য লাভ করাও কঠিন।

(সাত) নতুন প্রজন্মের চিন্তা-চেতনার আলাকে নিজেদের উপস্থাপনে ব্যর্থতা

নতুন প্রজন্মের ভোটারদের চিন্তা-চেতনা ও আশা-আকাংখা বর্তমান মিডিয়া প্রচারণার দ্বারা বহুলভাবে প্রভাবিত। গতানুগতিক ধারায় ইসলামী আদর্শের প্রতি আহ্বান জানানোর কৌশল কার্যকর হচ্ছে না। এ জন্য প্রয়োজন আধুনিক পরিভাষার ব্যবহার ও উপস্থাপনার নতুন আংগিক। বিষয়টি অনুধাবনে জামায়াত নেতারা খুব একটা সফল হননি।

(আট) ভূমন্ডলীয় রাজনীতি ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন নতুন কৌশল

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বন্ধুহীন হয়ে কোনঠাসা ও একলা চলো নীতি গ্রহণ করে টেকসই রাজনীতি করা বাস্তবসম্মত নয়। নীতি ও আদর্শের সাথে আপস না করেও কৌশলগত কারণে উদারনীতি অনুসরণ করে সমর্থনের পরিধি বৃদ্ধির দৃষ্টিভংগি জামায়াতের নেই।

(নয়) জোটের শরীক বিএনপির ভবিষ্যৎ

ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ও ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী বিএনপি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের পক্ষে একটি সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা ও ইমেজ বিএনপির সবচেয়ে বড় সম্পদ। সম্ভাব্য ভারতীয় আধিপত্যবাদী আগ্রাসন মোকাবিলায় জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্য একান্ত অপরিহার্য। বিগত কেয়ারটেকার সরকার সারা দেশে বিএনপি নেতৃত্বের উপর যে দুর্নীতির কলংক লাগিয়ে দিয়েছে, বিশেষ করে বেগম জিয়ার দুই ছেলের উপর যে অপবাদ আরোপিত হয়েছে, তা দলটির বিশেষ ক্ষতি করেছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারও তাদের পিছু ছাড়বে না। দলটির সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী স্টান্ডিং

কমিটির অধিকাংশ নেতাই বর্তমানে বয়সের ভারে ন্যুজ এবং অনেকটা অকার্যকর। মধ্যবয়সী সাহসী নেতাদের অনেকেই মামলা-মোকদ্দমায় দিশেহারা। ছাত্রনেতা-তরুণদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। বেগম জিয়া শারীরিকভাবে দিনে দিনে দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। দলের মধ্যে তারেক রহমানের বিরাট জনপ্রিয়তা থাকলেও তিনি আগামী ৫ বছরে দেশে ফিরতে পারবেন কিনা তা নিশ্চিত নয়। দলের ভেতর অভ্যন্তরীণ কোন্দল এত বেশি যে, নতুন কমিটি গঠন নিয়ে কলহ আরো বাড়তে পারে। সর্বোপরি দলটির নেতাকর্মীদের মধ্যে স্বার্থের লড়াই যত তীব্র, রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার তেমন নেই। ফলে ভবিষ্যতে দেশের সংকটকালে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের পক্ষে দলটি কতটা ভূমিকা রাখবে তা জোর দিয়ে বলা যায় না। এমতাবস্থায় বিএনপি ক্ষয়িষ্ণু হবার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এরূপ ঘটলে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্য ভবিষ্যতে কতটা কার্যকর হবে তা বলা কঠিন।

বিকল্প রাজনীতির সন্ধানে

দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মাটিতে কাজ করে ব্যাপক সাংগঠনিক মজবুত ভিত্তি অর্জন করলেও ভোটারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমর্থন তৈরী করতে পারেনি। এর বহুবিধ কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে। কিন্তু এরূপ ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার প্রতিক্রিয়া কর্মীবাহিনীর মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অপরদিকে বিএনপির মত জাতীয়তাবাদী শক্তি দুর্নীতি ও কৌশলগত ব্যর্থতার জন্য জিয়াউর রহমানের ইমেজকে কাজে লাগাতে পারেনি। এজন্য দেশের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সচেতন, দেশপ্রেমিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী নাগরিক রয়েছেন যারা বিএনপির কর্মকাণ্ডে হতাশ। তারা বিএনপি ও জামায়াতের ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার জন্য বিকল্প রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাচ্ছে না। এ জনগোষ্ঠী/ভোটার মূলত আওয়ামী লীগ বিরোধী। এমতাবস্থায় তাদের সামনে নিম্নের বিকল্পগুলো রয়েছে:

প্রথমত: জামায়াতের কর্মকৌশলে ব্যাপক সংস্কার আনা।

দ্বিতীয়ত: বিএনপির অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, পুরানো ও দুর্নীতিবাজ বলে পরিচিত নেতৃত্বকে পরিবর্তন করা ও ব্যাপক সংস্কার আনা।

সন্দেহ নেই বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। দলটির স্বার্থান্বেষী চক্র কোনো ভালো সংস্কার হতে দেবে না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, দেশপ্রেমিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী নাগরিকরা বিএনপির কাছে এটাই প্রত্যাশা করে। বিএনপি নেতৃত্ব এ বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হলে তাদেরকে ভবিষ্যতে তার খেসারত দিতে হবে।

তৃতীয়ত: দেশপ্রেমিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী নাগরিকরা এবং জামায়াতের সম্ভাবনাময় জনশক্তির একটি অংশ বিএনপিতে যোগ দিতে পারে এবং দলটিকে একটি আদর্শবাদী দলে পরিণত করার চেষ্টা করতে পারেন।

তবে এ বিকল্পটি তেমন বাস্তবসম্মত মনে হয় না। কারণ বিএনপির বর্তমান নেতৃত্ব নতুনদের দলে নেতৃত্বের আসন দিতে চাইবে না।

চতুর্থত: জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তথা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যকার জোটের সম্পর্ক আরো জোরদার করা। একটা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে জোট নেতৃবৃন্দ উভয় দলের মধ্যে ব্যাপক সংস্কার করে এগিয়ে যেতে পারেন। এ বিষয়ে উভয় দলের শুভাকাংখী সিভিল সোসাইটি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

পঞ্চমত: স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ, জনকল্যাণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে একটি উদারনৈতিক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা যেতে পারে।

- প্রস্তাবিত দল ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা দেবে; তবে 'ইসলামী রাষ্ট্র' বা 'শরীয়াহ আইন' চালু করার মত হার্ডলাইন অনুসরণ করবে না।

- প্রস্তাবিত দল কোনো রেজিমেন্টেড বা ক্যাডারভিত্তিক দল হবে না। দলের নামকরণের ব্যাপারেও কোনো ইসলামী শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করা ঠিক হবে না। এ ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশগুলোর অভিজ্ঞতাকে সামনে রাখা যেতে পারে।

- প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণ করে তৃণমূল থেকে নতুন নেতৃত্ব বাছাই করতে হবে যাতে সঠিক নেতৃত্ব বাছাই করা যায়। পাশ্চাত্যের ধাচে অত্যন্ত সুশৃংখল একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

- দলটিতে জামায়াতের জনমুখী নেতৃত্বদানের যোগ্য বেশকিছু নেতাকর্মী যোগ দিতে পারে। অপরদিকে বিএনপির সৎ ও নিষ্ঠাবান ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী নেতাকর্মীরা যোগ দেবে বলে আশা করা যায়। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃত্বকে গুরুত্ব দিতে হবে।

নতুন রাজনৈতিক কৌশলের যৌক্তিকতা

কোনো দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দলের নাম পরিবর্তন নতুন কিছু নয়। মূল লক্ষ্য ঠিক রেখে কৌশল পরিবর্তন কোনো কোনো সময় অপরিহার্য বলে বিবেচিত হতে পারে। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দলের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শাসক গোষ্ঠীর নিপীড়নের মুখে তারা নাম পরিবর্তন করে ভিন্ন অবয়বে নতুন দল আত্মপ্রকাশ করেছে। বিভিন্ন দেশে বামপন্থী দলগুলো নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তারা নতুন নামে নতুন নেতৃত্বে বা অন্য দলে অনুপ্রবেশ করে তাদের কাজ চালিয়ে গেছে। একইভাবে ইসলামী দলগুলো তাদের কৌশল পরিবর্তন করেছে। উদাহরণ হিসেবে

তুরস্কের কথা বলা যায়। তুরস্কের ইসলামী নেতা নাজমুদ্দিন আরবাকান প্রথমে ক্ষমতাসীন জাস্টিস পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সুলেমান ডেমিরেলের সাথে মতপার্থক্য হওয়ায় ১৯৭০ সালে মিল্লি নিজাম পার্টি গঠন করেন। ১৯৭০ সালে সামরিক আইন জারী হলে সকল পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এক বছর পরে ১৯৭১ সালে আরবাকান মিল্লি সালামত পার্টি নামে নতুন পার্টি গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে দলটি নির্বাচনে প্রায় ১২ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বামপন্থী রিপাবলিকান পার্টির সমর্থনে তিনি সরকার গঠন করেন। ১৯৮০ সালে তুরস্কে পুনরায় সামরিক আইন জারী হলে আবার সকল পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৮৩ সালে আরবাকান রাফাহ পার্টি (ওয়েলফেয়ার পার্টি) নামে আরেকটি নতুন পার্টি গঠন করেন। এ নতুন দলটি 'জাস্ট অর্ডার' শ্লোগান দেয়ে ভোটারদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। ১৯৯৬ সালে দলটি একক সংখ্যাগরিষ্টতা না পেলেও তানসু সিলারের ট্রু পাথ পার্টির সমর্থনে সরকার গঠন করে। ১৯৯৮ সালে সাংবিধানিক আদালত সেক্যুলার নীতি ভংগের দায়ে রাফাহ পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আরবাকান ও রাফাহ পার্টির অনুসারীরা ভার্চু পার্টি নামে বিকল্প পার্টি গঠন করে। দলটি রাফাহ পার্টির নতুন সংস্করণ– এ অজুহাতে ভার্চু পার্টিকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ইতোমধ্যে নীতি ও কৌশলের প্রশ্নে দলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। সংস্কারপন্থী বলে পরিচিতরা আলাদা হয়ে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একে পার্টি) এবং আরবাকানপন্থীরা ফেলিসিটি পার্টি (সাদাত পার্টি) গঠন করেন। পুরাতন রাফাহ পার্টির ১০১ জন পার্লামেন্ট সদস্য দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান। ২০০২ সালের নভেম্বরে একে পার্টি বিপুল ভোট পেয়ে সরকার গঠন করে।

অপরদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টির্র (বিজেপি) ইতিহাস বলছে, দলটি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বর্তমান পর্যায়ে পৌছেছে। ১৯২৫ সালে উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ (আরএসএস) গঠিত হয়। দলটি মহাত্মা গান্ধীকে মুসলিমপ্রীতির জন্য কঠোর সমালোচনা করতো। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলেও সব সরকারই দলটিকে উগ্র সাম্প্রদায়িক বলে বিবেচনা করতো। মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর হাতে নিহত হলে আরএসএসকে দায়ী করা হয় এবং এর ১৭০০০ কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। এ সময়ে তারা কৌশল পাল্টে ১৯৫১ সালে ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনসংঘ (বিজেএস) গঠন করে। নতুন নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তারা ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৬৭ সালে নির্বাচনে তারা আরো ভালো ফল পায়। তারা বহু রাজ্যে কম্যুনিস্টদের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। ১৯৭১ সালে বাজপেয়ীর নেতৃত্বে দলটি 'দারিদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' শ্লোগান দিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারী করলে আরএসএস-এর বহু কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে চরণ সিংহের নেতৃত্বে জনতা পার্টি, জনসংঘ ও অপর কয়েটি পার্টি নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। জনসংঘ নেতা বাজপেয়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও এলকে আদভানী তথ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু কোয়ালিশন সরকার সফল হতে পারেনি। ১৯৮০ সাল জনসংঘ আলাদা নামে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) গঠন করে।

নতুন দল গঠনের চ্যালেঞ্জ

Strength

- অপেক্ষাকৃত তরুণ ও নতুন নেতৃত্ব প্রস্তাবিত দলকে এগিয়ে নেবেন।
- যুদ্ধাপরাধের অপবাদ আছে বা অভিযুক্ত হয়েছেন এমন কাউকে নেতৃত্বে বা দলে নেয়া হবে না।
- দুর্নীতির অপবাদ আছে বা অভিযুক্ত হয়েছেন বা নৈতিক সুনামের অভাব রয়েছে এমন ব্যক্তিদের নেতৃত্বে বা দলে নেয়া হবে না।
- প্রস্তাবিত দল কোনো রেজিমেন্টেড বা ক্যাডারভিত্তিক দল হবে না। উন্মুক্ত ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দলে রিক্রুটমেন্ট ও নেতৃত্ব বাছাই করা হবে।
- বাংলাদেশকে একটি সত্যিকার কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করার প্রত্যয় নিয়ে নতুন ধ্যানধারণা সহকারে নতুন দল একটি উঁচুমানের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি চালু করবে।
- প্রস্তাবিত দল একটি উন্নত থিংক ট্যাংক প্রতিষ্ঠা করবে। এ সংস্থা গবেষণা, সমীক্ষা ও রিভিউ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে নীতি-নির্ধারণ করবে।
- সার্চ পদ্ধতিতে সারাদেশ থেকে মেধাবী, সৎ ও দক্ষ নেতৃত্ব বাছাই করা হবে।

Weakness

- প্রস্তাবিত দল গঠনে প্রধান সমস্যা হবে শীর্ষ নেতৃত্ব নির্ধারণ করা; কারণ বাংলাদেশে ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক নেতৃত্বের বাইরে অন্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন।
- পর্যাপ্ত তহবিল ছাড়া নতুন দল গঠনের কাজ এগিয়ে নেয়া কঠিন হবে।
- রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব বাছাইয়ে সরকার পরিচালনার উপযুক্ত যোগ্য নেতৃত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।
- সকল স্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব পাওয়া কঠিন হবে।

Opportunities

- দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু থাকায় নতুন দল গঠনে কোনো প্রকার আইনগত সমস্যা হবে না। আইন অনুসরণ করেই দল গঠনের কাজ এগিয়ে নিতে হবে।
- নতুন দলের নাম কোনো ধর্মীয় পরিভাষা অনুসারে হবে না। ফলে প্রচারমাধ্যমে অযথা অপপ্রচার হবে না বলে আশা করা যায়।

- নতুন দলে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ও দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী লোক পাওয়া কঠিন হবে না। কারণ জামায়াত ও বিএনপিতে সক্রিয় নয়– এরূপ ভালো লোক পাওয়া কঠিন হবে না।
- আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির বাইরে এসে নতুন ধ্যান-ধারণা নিয়ে নতুন দল গঠন রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন চমক সৃষ্টি করতে পারে।

Threats

- নতুন দল গঠনের উদ্যোগকে সরকার ভালো চোখে নাও দেখতে পারে। সেক্ষেত্রে সমস্যা মোকাবিলা করতে হতে পারে। তবে এরূপ উদ্যোগকে সরকার বিএনপি বা জামায়াতের ভাঙ্গন বলে মনে করলে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে বলে প্রতীয়মান হয় না।
- প্রধানত বিএনপি-জামায়াত থেকেই নতুন দলে লোক আসবে, সে ক্ষেত্রে ঐ দুটো দল নতুন দল সম্পর্কে অপপ্রচার চালাতে পারে।
- ছাত্রশিবিরের প্রাক্তন নেতাকর্মীরা ব্যাপক হারে নতুন দলে যোগ দিতে থাকলে জামায়াতের সাথে বিরাট ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে।

সুপারিশ:

১. প্রস্তাবিত নতুন রাজনৈতিক দলটি জামায়াতের কোনো বিকল্প দল হবে না এবং এটি কেবল নির্বাচনী রাজনীতির জন্য একটি বিকল্প প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে– এ শর্তে জামায়াত নীতিগত সমর্থন দিতে পারে।

২. প্রস্তাবিত নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করা যেতে পারে।

৩. প্রস্তাবিত নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য কলাকৌশল নির্ধারণ ও অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি এখনই শুরু করা যেতে পারে।

৪. প্রস্তাবিত নতুন রাজনৈতিক দল কখন আত্মপ্রকাশ করবে তার একটি উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন কর্মকৌশল গ্রহণ সময়ের দাবি

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

১.

বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ইতিহাসের একটি কঠিনতম সংকটকাল অতিক্রম করছে। ১৯৭১ সালে একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর মাত্র দুই দশকের মধ্যে ইসলামী আন্দোলন পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার মাত্র নয় বছরের মাথায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বাংলাদেশে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। অর্ধ শতাব্দীর বেশিকাল যাবত মিসরের ইসলামী আন্দোলন আল-ইখওয়ানুল মুসলেমুন বা মুসলিম বাদারহুড এখনও পর্যন্ত নিষিদ্ধই রয়ে গিয়েছে। তুরস্কের ইসলামী আন্দোলন অনেকবার নাম পরিবর্তন করে অনেকটা সেক্যুলার আদলে কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরও বাস্তব কারণেই এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করেছে।

২.

এত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী স্বনামে আবির্ভূত হয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হওয়ার পিছনের মূল কৃতিত্ব ঐ সব তরুণদের যারা অকপটে ইসলামের জন্য জীবন দান করেছে এবং শাহাদাত

---

* লেখক জামায়াতের তৎকালীন সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল। কারাগার থেকে তাঁর পাঠানো এই চিঠিটির মূল বক্তব্য ২০১১ সালে প্রথমে দৈনিক কালের কণ্ঠে, পরবর্তীতে বিভিন্ন ব্লগ ও অনলাইন সাইটগুলোতে প্রকাশিত হয়। তারপর WITNESS UNTO MANKIND তথা আইএমবিডি নামের একটি ব্লগ পুরো চিঠিটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে। এটি বর্তমানে বন্ধ থাকায় বিকল্প হিসেবে আইএমবিডি ব্লগের সূত্রে প্রকাশিত 'প্রিয় বই' নামে একটি সাইটের লিংক দেয়া হলো: https://priyoboi.blogspot.com/2010/04/blog-post_14.html

বরণ করেছে। শতাধিক শাহাদাতের ঘটনা ইসলামী আন্দোলনকে আধ্যাত্মিক শক্তি যুগিয়েছে। জামায়াতে ইসলামী বর্তমান পর্যায়ে আসার জন্য দ্বিতীয় যে শক্তি তাহলো সারাদেশে জামায়াত ও শিবিরের নিবেদিতপ্রাণ সক্রিয় কর্মীগণ। শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র ইসলামের জন্যই তারা এই আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এতবড় মুখলেছ কর্মীবাহিনী পৃথিবীতে খুব কমই দেখা যায়। তৃতীয়ত, জনগণের মধ্যে একটি বিপুল অংশ যাদের সংখ্যা কম করে হলেও ১০-১৫% ভাগ হবে তারা ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সমবেদনা পোষণ করেন।

৩.

কিন্তু বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী তথা বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন যে সংকটের মুখোমুখি তা খুবই ব্যতিক্রমধর্মী। জামায়াতে ইসলামীকে দল হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী এবং উপরন্তু দলের বর্তমান নেতৃত্বকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে বিশেষ এক পরিস্থিতিতে একটি ইসলামী দল হিসাবে বিশ্বের অন্যতম প্রধান একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করার বিপক্ষে তথা পাকিস্তান নামক দেশটিকে এক রাখার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল জামায়াত। তখনকার জামায়াত মনে করতো পাকিস্তান এক রেখে এখানে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ব ও পশ্চিমের অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার অবসান হবে। জামায়াতের আরও আশঙ্কা ছিল পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ আলাদা হলে এখানে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু জামায়াতের এবং আরো যারা পাকিস্তানকে এক রাখার পক্ষে ছিলো তাদের ইচ্ছার বিপরীতে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানের ৯৫ হাজার সৈন্য ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের সেনাপতি জগজিত শিং অরোরার নিকট নতুন স্বাধীন দেশ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে। জামায়াত যদিও বা পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে ছিল তথাপি বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নেয়। বাংলাদেশের সরকার জামায়াতসহ ধর্মভিত্তিক দলসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৭৯ সালের ২৫শে মে জামায়াত নিজস্ব নামে আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করে।

৪.

১৯৪৭ সালে বৃটিশ দখলদারিত্বের অবসানের সময় উপমহাদেশে রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল। অনেকেই ভারত বিভাগের বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তান দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠিত হয় ভারতকে খণ্ডিত করে। যারা পাকিস্তান চেয়েছিলেন তাদের অনেকেই ভারতেই থেকে যান। কেউ তাদের স্বাধীনতা বিরোধী আখ্যায়িত করেনি। যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে সেই মুসলিম লীগ দেশ ভাগ হবার পর এক অংশ ভারতেই থেকে যায় এবং অদ্যাবধি ভারতে মুসলিম লীগ রয়েছে। তাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী বলা হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে

স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ ও বিপক্ষকে নিয়ে এমনভাবে প্রচারণা চালানো হয় যার ফলে গোটা জাতিকেই বিভক্ত করে ফেলা হয়। রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দাবী ছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সবাইকে সাথে নিয়ে দুর্ভেদ্য জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা। কিন্তু যে শক্তি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের তদানীন্তন নেতৃত্বকে আলোচনার টেবিলে বসে রাজনৈতিক মীমাংসার পথ অনুসরণ করতে দেয়নি সেই শক্তিই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার পরিবর্তে অনৈক্য, বিভেদ এবং প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার পথে দেশকে ঠেলে দেয়। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিভাজন ও বিভক্তি জিইয়ে রাখাটা হচ্ছ একটি আধিপত্যবাদী কৌশল। বাংলাদেশে যাতে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি না হয় তার জন্যই জাতিকে বিভক্ত করে রাখার এই কৌশল গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ যদি রাজনৈতিক হানাহানি মুক্ত হয় তাহলে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও স্বনির্ভরতা অর্জন করবে। বাংলাদেশের বিশাল বাজার যারা দখলে রাখতে চায় তারা কিন্তু এটা চায় না যে রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল ঐক্যবদ্ধ এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হোক বাংলাদেশ। সত্যিকথা বলতে কি আধিপত্যবাদী শক্তি এ ব্যাপারে শতকরা একশত ভাগ সাফল্য অর্জন করেছে।

আজ বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলা হয়েছে। বাংলাদেশে আজ কল্পিত স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি আবিষ্কার করে দেশকে স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ দুইভাগে বিভাজন করে রাজনৈতিক প্রচারণা চালানো হচ্ছে এবং নতুন প্রজন্মকে সেভাবেই বোঝানো হচ্ছে। অথচ ভারতে তো দেশ বিভাগের বিরোধী এবং দেশবিভাগের পক্ষের শক্তি বলে কিছু নেই। বরং তারা জাতীয় ইস্যুতে নিজেরা ঠিকই ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি এবং কংগ্রেস নেতারা জাতীয় দিবসে একসাথে বসছে, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি এলকে আদভানী ও কংগ্রেসের নেতারা হাত ধরাধরি করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে। অথচ আদভানীদের দলই গান্ধীকে হত্যা করে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই। তারা তাদের জাতীয় স্বার্থে জাতীয় ঐক্য রক্ষা করছেন যথারীতি। কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৭১ কে কেন্দ্র করে যে মতদ্বৈততা ছিল বা পক্ষ-বিপক্ষ ছিল তা জিইয়ে রাখার জন্য সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারতপন্থী এবং ভারতবান্ধব লোকেরা। সারা ভারতের মুসলমানদের সংগ্রামের ফসল পাকিস্তানের ব্যাপারে ইসলামী দলগুলোর একটা দুর্বলতা ছিল এটা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর সকল ইসলামী দল ও ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিয়ে গঠনমূলক কাজ করছে। আর তাছাড়া ১৯৪৭ সালে যদি পাকিস্তান না হতো তাহলে তো আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ হতো না। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম না হলে আজকের বাংলাদেশ হয়তো বা একটি প্রদেশের অংশ হতো। ঢাকাও স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানীর মর্যাদা পেতো না।

৫.

জামায়াতে ইসলামীর জন্য সংকটটি সৃষ্টি হয়েছে এই জায়গায় যে, ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নতুনভাবে একটি দল হিসাবে আত্মপ্রকাশের পরও আধিপত্যবাদী শক্তি এবং ইসলামের দুশমন অধার্মিক ও ধর্মহীন শক্তি এই সংগঠনকে বাংলাদেশ বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বলে চিত্রায়িত করে দেশের জনগণের এক বিপুল অংশের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকেও জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী দল হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সাহিত্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, সিনেমা, টিভি চ্যানেল, পত্র-পত্রিকায় অব্যাহতভাবে অনেকটা একতরফা জামায়াত বিরোধী প্রচারণা চলে এবং জামায়াতের নেতৃবৃন্দের চরিত্রহনন করা হয়। স্বাধীনতা বিরোধিতার অভিযোগ বা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ খুবই গুরুতর এবং স্পর্শকাতর অভিযোগ। বাংলাদেশে জামায়াত অত্যন্ত সততার সাথে সৎ ও যোগ্য লোকদের সমন্বয়ে নিয়মতান্ত্রিক ও গঠনমুখী কার্যক্রম আন্তরিকতার সাথে পরিচালনা সত্ত্বেও জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী হিসাবে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ শক্তি পুরোপুরি সফলকাম হয়েছে। সাধারণ জনগণের নিকট বিষয়টির খুব একটা আবেদন না থাকলেও কিংবা জনগণ এসব নিয়ে না ভাবলেও সমাজের রাজনীতি সচেতন এবং এলিট শ্রেণী যারা আসলেই দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে সক্রিয় রাজনীতি চর্চা করেন তাদের একটি বিপুল অংশই জামায়াতের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন।

৬.

দেশপ্রেমিক এবং সমাজের তুলনামূলকভাবে সৎ মানুষদের এই দলটির দুর্ভাগ্য বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি রং সাইডে পড়ে গিয়েছে। মিসরের ইখওয়ানের এই সমস্যা নেই বরং মিসরের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে দলটি অংশগ্রহণ করেছে। তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ইয়েমেনে সেখানকার ইসলামী আন্দোলন দুই ইয়েমেনকে একত্রিত করে আধুনিক গণতান্ত্রিক ইয়েমেন প্রতিষ্ঠায় সরাসরি অবদান রেখেছেন। নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া ও সুদানে সেখানকার ইসলামী আন্দোলনসমূহ স্বাধীনতা অর্জনে ইতিবাচক অবদান রেখেছেন। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় ইসলামী আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। পৃথিবীর সর্বত্রই ইসলাম স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের এটা একটা ট্রাজিডি যে দেশটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে ইসলামের দোহাই দিয়ে ইসলামকেই কলংকিত করেছে এবং আন্তরিকভাবে যারা দেশটার সংহতি রক্ষার পক্ষ অবলম্বন করেছে তারাও নিজেদের গায়ে কলংক লেপন করেছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান নেতৃত্ব যারা দিচ্ছেন তারা ১৯৭১ সালে জামায়াতের নেতৃত্বে ছিলেন না এবং অধিকাংশই জামায়াতের সদস্যও ছিলেন না তথাপি তারা স্বাধীনতা বিরোধিতার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং তাদেরকেই যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে।

৭.

এ কথা ঠিক যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি একটি মীমাংসিত ইস্যু। মরহুম শেখ মুজিব নিজেই বিষয়টি নিষ্পত্তি করে গিয়েছেন। পাকিস্তানের ১৯৫ জন সামরিক কর্মকর্তার বিচারের জন্য ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট পাস করা হলেও ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত এই ত্রিদেশীয় চুক্তির মাধ্যমে ১৯৫ জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীকে ক্ষমা করে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়া হয়। এর আগে দালাল আইনে স্থানীয় সহযোগীদের যে বিচার হচ্ছিল বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এতে আটক সাতত্রিশ হাজারের মধ্যে পঁচিশ হাজার যাদের নামে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল না তাদের মুক্তি দেয়া হয়। ২৮০০ এর বিচার হয় এবং এতে ৭৫২ জনের বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি হয়। আটক অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকায় যখন মামলা চলছিল না, এরকম একটি পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম ১৯৭৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কথিত দালাল আইনটি বাতিল করেন। ফলে দালাল আইনে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আইনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু এরপর ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ যুদ্ধাপরাধ ইস্যু সামনে আনেনি। ৩৯ বছর পর কেন এবার যুদ্ধাপরাধের মত একটি মীমাংসিত এবং স্পর্শকাতর ইস্যু এতটা গুরুত্বের সাথে সামনে আনা হলো? বিষয়টি খুবই পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশে জনগণের মধ্যে প্রতিহিংসা জাগিয়ে তোলার জন্য এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যই সামনে আনা হয়।

৮.

২০০১ সালের নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্যের ফলে চারদলীয় জোটের বিজয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক তাৎপর্যময় ঘটনা। এই ঐক্য যদি অব্যাহত থাকে এবং আরো সম্প্রসারিত হয় তাহলে ভারতবান্ধব ধর্মহীন বা অধার্মিক সরকার ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ হয়ে যায়। ভারতীয় লবী এই বিষয়ে এখানে নানা কৌশল গ্রহণ করে। একদিকে তারা জামায়াতকে বলে যে, "আপনাদের মত একটি সৎলোকের দল বিএনপির মত একটি দুর্নীতবাজদের দলের সাথে জোট গঠন করে আপনাদের ভবিষ্যৎ কেন ধ্বংস করছেন। আপনাদের উচিত বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট থেকে বের হয়ে আসা।" অন্যদিকে তারা বিএনপিকে বলতে থাকে 'আপনারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একটি দল' আপনাদের দলে আছেন অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতকে সাথে নিয়ে আপনারা কেন বদনামের ভাগী হচ্ছেন। যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসিত করে আপনারা জনসমর্থন হারাচ্ছেন। তাদের এই প্রচারণার ফলে চারদীয় জোটের ঐক্যের সমস্যা না হলেও বিএনপির কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্র সংগঠন পর্যায়ে কিন্তু বিএনপি-জামায়াত ঐক্যের মত ঐক্য গড়ে উঠে নাই। ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে ঐক্য যতটা সুদৃঢ় হওয়া উচিত ছিল তার অভাব ছিল। যেহেতু জামায়াত ও বিএনপির ঐক্য সুদৃঢ় হলে রাজনীতিতে

বিএনপি হবে বিনিফিশিয়ারী এবং ক্ষমতার লড়াইটা বর্তমানে যেহেতু বিএনপির সাথে তাই একাত্তরের ইস্যুতে জামায়াতকে ঘায়েল করা সম্ভব হলে তা কার্যত বিএনপিকে কোণঠাসা করতেই সহায়ক হবে।

৯.

১৯৯১ সালে জামায়াতের সমর্থনে বিএনপি সরকার গঠনের পরও আওয়ামী লীগ খুবই রাজনৈতিক পরিপক্কতার সাথে এক পর্যায়ে জামায়াতের সাথে রাজনৈতিক সখ্যতা গড়ে তোলে। জামায়াতের সমর্থনে সরকার গঠনের পরও বিএনপি জামায়াতকে সাথে ধরে না রেখে আওয়ামী লীগের দিকেই ঠেলে দেয়। আওয়ামী লীগ অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে জামায়াত ও জাতীয় পার্টিকে সাথে নিয়ে যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তুলে এবং রাজনৈতিকভাবে বিএনপিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির মধ্যে কোনো ধরনের সমঝোতা হতে পারেনি।

জামায়াত ৩০০ আসনেই নির্বাচন করে। নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেণে দেখা যায় খুবই অল্প ভোটের ব্যবধানে বিএনপি ও জামায়াত ৫৮টি আসনে পরাজিত হয়। যদি কোন সমঝোতা হতো এবং বিএনপি ও জামায়াতের ভোট ভাগাভাগি না হতো তাহলে কোনক্রমেই আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর সরকার গঠন করতে পারতো না। ২০০১-এর নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট হবার ফলে আওয়ামী লীগের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় ফিরে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই আওয়ামী থিংকট্যাঙ্ক এবং তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা রাজনৈতিক বিবেচনায় যুদ্ধাপরাধী ইস্যু সামনে নিয়ে আসে।

১০.

মিডিয়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ইস্যুটিকে এতটাই সামনে এনেছে যে, আওয়ামী লীগের পক্ষে এই ইস্যুকে পিছে ঠেলে দেয়ারও কোনো উপায় নেই। প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেই ফেলেছিলেন যে, বিচার তো জনগণই করে দিয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু ভারতীয় লবি, বামপন্থী ধর্মহীন গোষ্ঠী এবং তাদের সমর্থক মিডিয়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ইস্যুটিকে এমনভাবে হাইলাইট করেছে যে, সরকার এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। মেনিফেস্টোতে এটা ছিল। জাতীয় সংসদে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব হিসাবে সরকারের শীর্ষ মহলের অনাগ্রহ সত্ত্বেও সংসদে প্রস্তাব পাস করা এবং ভারতীয় অর্থে লালিত বিভিন্ন সংস্থার প্রচারণার ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক ট্রাইন্যুনাল আইনটি সংশোধন করা, ট্রাইব্যুনালের বিচারক, তদন্ত টিম, প্রসিকিউটর ইত্যাদি নিয়োগ দান এবং সরকারের মন্ত্রীদের বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে এই ইস্যুটিকে এমন এক পর্যায়ে আনা হয়েছে যাতে যে কোনভাবেই হোক যুদ্ধাপরাধের বিচার করা সরকারের জন্য এক অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

১১.

জামায়াতের বর্তমান নেতারা ১৯৭১ সালে ২/৪ জন ছাড়া কেউই জামায়াতের সদস্য ছিলেন না, তারা সশস্ত্রবাহিনীতে ছিলেন না, সরকারের কোনো পর্যায়েরও দায়িত্বশীল লোক ছিলেন না, বা অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধেও অংশ নেননি। এসব বিষয় আওয়ামী লীগ নেতারাও জানেন। কিন্তু রাজনীতি এমনি এক জিনিস যাতে ক্ষমতার স্বার্থে অনেক কিছুই করতে হয়। জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে প্রচারণা চালিয়ে মিডিয়া ট্রায়াল ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। মিথ্যা প্রতিবেদন ছেপে তাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা, খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের মিথ্যা মামলা সাজানো হচ্ছে। বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করার পর আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল বেআইনীভাবে জামায়াতের পাঁচজন শীর্ষ নেতাকে আটক রাখার কথা ঘোষণা করেছে। মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করার পর ৭৩-এর তথাকথিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল এক্টের বিধি নতুন করে সংশোধন করেছে। ১৯৭০-এর এই তথাকথিত আইনটি একটি কালো আইন। এই আইনে সাক্ষ্য প্রমাণের কোন প্রয়োজন নেই। বিবাদীর মৌলিক অধিকার এই আইনে সংরক্ষণ করা হয়নি। সংবিধানের মৌলিক অধিকার খর্ব করে আইনটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে (সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে) সরকার যে কোন লোককে গ্রেফতার করে বিচারের নামে প্রহসন করে শাস্তি দিয়ে দিতে পারে।

১২.

ইতোমধ্যেই সরকার দলীয় লোকদেরকে ট্রাইব্যুনালের বিচারক, প্রসিকিউটর এবং তদন্তকারী সংস্থার সদস্য হিসাবে নিয়োগ দিয়েছে। এসব লোক ইতোমধ্যেই জামায়াতের গ্রেফতারকৃত কয়েক নেতার জেলা এবং নির্বাচনী এলাকা ঘুরে এসে মিডিয়ায় মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে বলেছে যে জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে অনেক হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী পাওয়া গিয়েছে। এই ট্রাইব্যুনাল গঠনই করা হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য। তাছাড়া সরকার যে সব নির্বাচনী অঙ্গিকার করেছিল তার কোনোটাই পূরণ করতে পারেনি। সন্ত্রাস-হত্যা, ধর্ষণ অপরাধ ও দুর্নীতি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। সরকার দলীয়দের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি, চাকরি বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, দুর্নীতি অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে। চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নাগামহীনভাবে বেড়ে চলছে। ক্ষমতাসীনদের প্রশ্রয় ও ছত্রছায়ায় ইভটিজিং সামাজিক ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। সরকারী দল নিজেরাই খুনাখুনি করছে এবং ক্ষমতার দাপটে বিরোধী দলকে অনেক জায়গায় হামলা করছে এবং বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের হত্যা করছে। সরকার সমর্থক সন্ত্রাসীদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছে। রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা আখ্যায়িত করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ১০ হাজারের অধিক মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। দেশের জন্য কিছু করতে না পারলেও ট্রানজিট, বন্দরসহ প্রতিবেশী দেশকে সকল সুযোগ-সুবিধা দান করার ব্যবস্থা করেছে এবং জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তি সম্পাদন করেছে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য। এমতাবস্থায় জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য এবং দেশে যাতে কার্যকর

আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সে জন্য জামায়াতকে নেতৃত্বশূন্য করার জন্য তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রহসন করছে। ফলে জামায়াত একটা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

১৩.

এই পরিস্থিতিতে কী হতে পারে? জামায়াতের করণীয় কী?

এক. সরকারের আরো তিনবছর সময় আছে। এই সময়ের মধ্যেই যে কোনোভাবে প্রহসনের বিচার করে জামায়াতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে পারে। জামায়াতের কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের ঘাবড়ে দেয়ার জন্য মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারে এবং অনেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে পারে। আবার সম্ভাবনাময় জামায়াত নেতাদের নির্বাচনে দাঁড়ানোর অযোগ্য ঘোষণা করতে পারে এবং এমনকি তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে। আদালতের রায়ের অযুহাতে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করতে পারে অথবা রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারে।

দুই. বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে তাদের ভাবমর্যাদা খতম করে নির্বাচনী রাজনীতিতে জামায়াতকে একটি অকার্যকর দলে পরিণত করতে পারে।

তিন. একটা পর্যায়ে গিয়ে আন্তর্জাতিক চাপের কথা বলে এবং বঙ্গবন্ধু যেহেতু ক্ষমা করেছিলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমা করতে জানে বলে ঘোষণা দিয়ে ক্ষমা করে জাতীয় ঐক্যের ডাক দিতে পারে।

চার. জামায়াতকে বিএনপি জোট ত্যাগ করার জন্য চাপ দিতে পারে এবং এর বিনিময়ে বিচারের বিষয়টি শিথিল করার প্রস্তাব দিতে পারে।

মোদ্দাকথা হলো, বিষয়টি যেভাবেই উপসংহার টানা হোক না কেন তাতে জামায়াত রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই। যদি সরকারের বর্তমান ঘোষণা অনুযায়ী বিচারকার্য চলে তাহলে জামায়াত যুদ্ধাপরাধীদের দল হিসাবে দেশেবিদেশে চিহ্নিত হয়ে যাবে। মিডিয়া ইতোমধ্যেই জামায়াতকে যুদ্ধাপরাধীদের দল বানিয়ে ফেলেছে। বিচার না করে সরকার যদি মুক্তিদান করেও দেয় তারপরও স্বাধীনতা বিরোধী এবং যুদ্ধাপরাধী হিসাবে যে কালিমা লেপন করে দেয়া হয়েছে ইতোমধ্যেই, সে কারণে দেশের জনগণ কি স্বাচ্ছন্দে জামায়াতের প্রতি আস্থা আনবে? কিংবা বিশাল ধর্মহীন শক্তি তারা জামায়াতকে মেনে নিবে বা জামায়াত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করুক অথবা রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আসুক এটা কি তারা চাইবে? নতুন প্রজন্মের সামনে জামায়াতকে যেভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে তাতে জামায়াত কি বৃহত্তর জনতার আস্থা অর্জন করতে পারবে?

১৪.

পরিস্থিতি যাই হোক বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় জামায়াতের গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দ মুক্তি পাবেন না এটা মোটামুটি নিশ্চিত। সামনেও নির্বাচনে যে সরকার পরিবর্তন হবেই এমনটি নিশ্চিত করে বলা যায় না। যদি সরকার পরিবর্তন হয় তবুও নতুন সরকার জামায়াতের সাথে কী আচরণ করবে তা নিশ্চিত নয়। বর্তমান সরকার তো জামায়াতকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রেখেছে। জামায়াতকে স্বস্তির সাথে কোন কর্মসূচী পালন করতে দিচ্ছে না। রাজপথে নামতে দিচ্ছে না। ছাত্রশিবিরকে নির্বিঘে কাজ করতে দিচ্ছে না। কয়েকশত জামায়াত-শিবির নেতাকর্মী এখনও কারাগারে। জামায়াত বা শিবির কোথাও ঘরোয়া বৈঠক করলেও পুলিশ সেই বৈঠককে গোপন বৈঠক আখ্যা দিয়ে গ্রেফতার অব্যাহত রেখেছে।

ইসলামী বইপুস্তককে জিহাদী ও জঙ্গি বই বলে পত্রপত্রিকায় খবর দিচ্ছে। জেএমবি, হারকাতুল জেহাদ ও লস্করে তৈয়্যেবার সাথে জামায়াতের সম্পর্ক এবং জামায়াত দেশব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত– এমনসব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন খবর অহরহ প্রচার করছে মিডিয়ার একটি অংশ। সরকারের মন্ত্রীরাও জামায়াতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতায় মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতি প্রদান করছে এবং বিটিভিসহ সংবাদপত্রেও তা ব্যাপকভাবে প্রচার করছে। প্রকাশ্যেই জামায়াতকে নির্মূল ও খতম করার হুংকার দেয়া হচ্ছে। সরকার ও তার মিত্ররা বাস্তবেই জামায়াতকে খতম করতে চায়।

১৫.

এই উদ্ভুত পরিস্থিতিতে জামায়াতের সামনে কী পথ বা কৌশল থাকতে পারে তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে।

এক. একটি কর্মপন্থা এই হতে পারে যে, দেখি শেষ পর্যন্ত কী হয় বা জামায়াতের ভাগ্যে কী ঘটে। যে অবস্থায় ছিলাম সে অবস্থাতেই অপেক্ষা করতে থাকি। যদি জামায়াতের নামে কাজ করা সরকার বন্ধ করে দেয় তাহলে তখন দেখা যাবে কী করা যায়। সরকার বন্ধ করে দেয়ার আগে নিজেরা বন্ধ করা ঠিক নয়।

দুই. যেহেতু রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তি জামায়াতকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে, যেহেতু জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী এবং যুদ্ধাপরাধীদের দল হিসাবে চিহ্নিত করে দলটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, যেহেতু একশ্রেণীর লোকের মধ্যে জামায়াত সম্পর্কে রিজার্ভেশন আছে, ভুল ধারণা আছে, নেতিবাচক ধারণা আছে, যেহেতু বর্তমান জামায়াতের নেতৃবৃন্দ দলের লোকদের নিকট জনপ্রিয় ও নির্দোষ হলেও তাদের ভাবমর্যাদাকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে এবং যেহেতু এক ধরনের লোকের মাঝে জামায়াত নামটার প্রতিই এলার্জি আছে এবং পক্ষান্তরে জামায়াতের প্রতি আস্থা রাখে এবং জামায়াতের সততা ও আন্তরিকতার কারণে জামায়াতকে

ভালোবাসে এমন একটি জনগোষ্ঠীও দেশে আছে যাদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়– এইসব সামগ্রিক বিবেচনায় রেখে জামায়াতের আন্দোলনের কৌশল পরিবর্তন করা সময়ের দাবী।

জামায়াত যেভাবেই আছে থাকুক তবে একটি নতুন রাজনৈতিক প্লাটফর্ম গড়ে তোলা এবং ধর্মহীনতার যে সয়লাব আসছে তার বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। জামায়াতের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে পিছনে থেকে একটি সংগঠন গড়ে তোলা। অন্যথায় জামায়াতের লোকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

তৃতীয় বিকল্প হচ্ছে, জামায়াতের যেসব নেতৃবৃন্দকে ১৯৭১ সালের সাথে সম্পৃক্ত করে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে জামায়াতের নেতৃত্ব থেকে তাদের সকলেরই সরে দাঁড়ানো এবং সম্পূর্ণ নিউ জেনারেশন নিয়ে জামায়াত গঠন করা। নতুন নেতৃত্বের হাতে জামায়াতকে তুলে দেয়া এবং যেহেতু ১৯৭১ সালের ভূমিকার কারণে অন্যায়ভাবে জামায়াতের উপর জুলুম করা হচ্ছে তাই এদেশে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা এবং গতিশীল করার স্বার্থে বর্তমান নেতৃত্ব যদি সরে দাঁড়ান তাহলে ইসলামের দুশমনদের বলার কী থাকবে? তবে ইসলামের জন্য যারাই কাজ করবে তাদের বিরুদ্ধে অধার্মিক ও ধর্মহীন শক্তির অভিযোগের কোন অভাব হবে না।

১৬.

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী ছাত্রশিবির নতুন সংগঠন হবার কারণেই এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে। পুরনো কোন সংগঠন হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কাজ করারই সুযোগ পেতো না। ছাত্রশিবির যেহেতু ইসলামী আন্দোলনের প্রধান রিক্রুটিং সেন্টার তাই শিবিরকেও বিতর্কিত করেছে ধর্মহীন শক্তি। শিবিরের অগ্রযাত্রায় আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী বেশী আতঙ্কিত। শিবিরের নামেও চলছে লাগামহীন মিথ্যাচার। ছাত্রদের মধ্যে আর যেসব সংগঠন আছে তাদের হাতে কোনো আদর্শ নেই। ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতায় যেতে আগ্রহী দলের ও ব্যক্তিবিশেষের লেজুড়বৃত্তি ছাড়া ওসব ছাত্র সংগঠনের জাতিকে দেবার মত কিছু নেই। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখল বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, সিট বাণিজ্য ওসব সংগঠনের জীবনীশক্তি। উন্মত্ত ব্যক্তিপূজার যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি চলছে তা থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হলে আদর্শিক রাজনীতির কোনো বিকল্প নেই।

রাজনৈতিক বিকল্প সন্ধানের পাশাপাশি ছাত্র অংগনেও পরিবর্তনের চিন্তা করতে হবে। ছাত্রদের রাজনীতিমুখী সভা ও রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি থেকে বের করে আনতে হবে। জ্ঞান চর্চা, মেধার বিকাশ, খেলাধুলা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উন্নত নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। লেজুরবৃত্তির রাজনীতি, নেশা ও মাদককে 'নো' বলতে হবে।

১৭.

জামায়াতের সামনে যে তিনটি বিকল্পের কথা আমি উল্লেখ করেছি আমার মতে প্রজ্ঞার পরিচয় হবে যদি দ্বিতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করা হয়। জামায়াত যেহেতু ৬০ বছরের অধিককাল থেকে এদেশে কাজ করছে এবং দেশের কমপক্ষে ১০% জনগণের একটি সমর্থন জামায়াতের প্রতি আছে তাই এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে জামায়াতের অবমূল্যায়ন করা হয়। কারণ বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির যে একটা অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে তা জামায়াতের আন্দোলনেরই ফসল। জামায়াতের সাথে অনেক মানুষের একটা আবেগের সম্পর্ক রয়েছে এবং জামায়াতের প্রবীণ নেতাকর্মীরাই জামায়াতকে এই পর্যায়ে আনার ব্যাপারে একটা অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের আন্তরিকতা এবং সততার ফলেই জামায়াত বাংলাদেশের সবচাইতে বড় ইসলামী দলের মর্যাদা লাভ করেছে। জামায়াত যদি একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার পিছনে সর্বাত্মক শক্তি নিয়োজিত করে এবং সেই সাথে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে যত্নবান হয় তাহলে সেই প্লাটফর্মকে রাজনৈতিকভাবে সরাসরি আক্রমণ করতে পারবে না কেউ।

১৮.

জামায়াতের যত বদনামই ধর্মহীন শক্তি করুক না কেন জামায়াতকে অগ্রাহ্য করে কোন কিছু করা সঠিক হবে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৌশল অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত জামায়াতকেই নিতে হবে। চিন্তার বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে দেয়া যাবে না। ১৯৪১ সালে পাকিস্তান আন্দোলন যখন বলতে গেলে তুঙ্গে উঠেছে, লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে গোটা ভারতবর্ষের মুসলমানরা একটি স্বাধীন আবাসভূমির দাবীতে ঐক্যবদ্ধ ও সোচ্চার সেই সময় নতুন একটি দল জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের আগে কয়েকটি আঞ্চলিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিভক্ত ভারতে জামায়াতের কর্মপন্থা কি হবে সে ব্যাপারে পূর্বাহ্নেই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়। জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা নিজে কিছুসংখ্যক সদস্যসহ পাকিস্তান চলে আসলেও জামায়াতের একটি বড় অংশ ভারতেই থেকে যান। তারা সেখানে এক ধরনের কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে যান। কিন্তু পাকিস্তানে জামায়াত তার কর্মসূচীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। জামায়াত রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ জামায়াতের কর্মপন্থায় বিরাট পরিবর্তন আনা হয়।

এক সময় জামায়াত আইনজীবদেরকে সদস্য করতো না। কিন্তু কৌশল বদলানো হয় এবং বাস্তবতার দাবী মেনে নিয়েই আইনজীবীদের দলের সদস্য করা হয়। প্রচলিত নির্বাচনে জামায়াত অংশ নিতো না এমনকি ভোটও দিত না। ভারতীয় জামায়াত এখনও নির্বাচনে অংশ নেয় না। শুধুমাত্র ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক জরুরী অবস্থা জারীর জাতীয় প্রেক্ষিতে জামায়াতের সদস্যদের ভোট দেয়ার অনুমতি দান করা হয়েছিল। কাশ্মীর জামায়াত হিন্দুস্থান জামায়াত থেকে আলাদা অর্থাৎ স্বাধীন জামায়াত হওয়ায়

তারা নির্বাচনে অংশ নিয়ে থাকে। এক সময় জামায়াত তার রুকন ছাড়া কাউকে নির্বাচনে মনোনয়ন দিত না। এখন এই নীতির পরিবর্তন করা হয়েছে। রুকন ছাড়াও মনোনয়ন দেয়া হয় এখন। মহিলাদেরকে সংসদে পাঠানোর সিদ্ধান্তও নিয়েছে। এমনকি নির্বাচনে মহিলাদেরও মনোনয়ন দান করেছে। বিগত উপজেলা নির্বাচনে ২৪ জন মহিলা প্রার্থী ছিল জামায়াতের, এর মধ্যে ১২ জন নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। জামায়াত নির্বাচনী প্রচারণা সাথে প্রার্থীর ছবি ব্যবহার করতো না। এখন ছবি ব্যবহার করছে। গঠনতন্ত্র সংশোধন করে অমুসলিমদের জামায়াতের সদস্য হবার পথে বাধা দূর করা হয়েছে। এখন একজন অমুসলিমও চাইলে জামায়াতের সদস্য হতে পারবেন। জামায়াতের মহিলা সদস্যদের মজলিশে শূরার সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে। এসবই করা হয়েছে প্রয়োজন, সময়ের দাবী এবং বাস্তবতার আলোকেই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

১৯.

জামায়াত বর্তমান সময়ে যে ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে গিয়েছে তাতে গা ছেড়ে বসে না থেকে বিকল্প পথের সন্ধান করা হিকমত ও দূরদৃষ্টির দাবী। এটা কোনো ধরনের বিচ্যুতি নয়। বরং আন্দোলনের ক্রমবিকাশের ধারাতেই নতুন কৌশল অবলম্বন করা। এক্ষেত্রে মিসরের ইখওয়ানের কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে ইখওয়ান পুনরুজ্জীবিত না করেও তারা অন্যদল বা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করছেন। ইখওয়ান নাই অথচ ইখওয়ান আছে। ধৈর্যের সাথেই তারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং নির্বাচনও করছেন। জর্দানে ইখওয়ান প্রশাসনের সাথে মোটামুটি সহনশীলতা বজায় রেখে সেখানকার রাজনীতি ও নির্বাচনে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এককথায় তারা কোয়ালিশন সরকারেও অংশ নিয়েছিলেন।

আলজেরিয়ায় ইখওয়ানের নেতৃত্ব মূল ইখওয়ান থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে ইসলামিক ফ্রন্ট গঠন করে কাজ করছেন। ইয়েমেনে ট্রাডিশনাল ইসলামপন্থীদের সাথে নিয়ে আল-ইসলাহ পার্টি গঠন করে সেখানে কাজ করছেন। এককথায় কোয়ালিশন সরকারেও ছিলেন। কিছুদিন আগে কোয়ালিশন থেকে বের হয়ে এসেছেন। মরক্কোতে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপম্যান্ট পার্টি নাম দিয়ে কাজ করছেন। এখন প্রধান বিরোধী দল হিসাবে আছেন। সামনের নির্বাচনে আরও ভালো করার কথা। সুদানে ইসলামিক মুভমেন্ট অব সুদান নামে জেনারেল হাসান আল বশিরের সাথে জোট গঠন করে সরকার পরিচালনা করছেন। অবশ্য একজন সিনিয়র নেতার সাথে তাদের মতদ্বৈততা রয়েছে এবং তিনি সরকারের বাইরে আছেন। তিনি হলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. হাসান তুরাবী।

তুরস্কে ইসলামী আন্দোলন বার বার নাম পরিবর্তন করেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দিন আরবাকানের সাথে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ায় দ্বিধাবিভক্তি আসার পরও জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি, যাকে বলা হয় একে পার্টি, তারা সরকার গঠন করে

সাফল্যের সাথে দেশ চালাচ্ছে আব্দুল্লাহ গুল এবং রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের (রজব তৈয়ব এরদোয়ান) নেতৃত্বে। কিন্তু পিছন থেকে শক্তি ও সমর্থন যোগান দিয়ে যাচ্ছে সাঈদ বদিউজ্জামান নুরসীর নূর জামায়াতের লোকেরা। সাম্প্রতিক রেফারেন্ডামে একে পার্টি জয়লাভ করার পর প্রধানমন্ত্রী এরদোগান ফতেহ উল্লাহ গুলেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই ফতেহ উল্লাহ গুলেন হলেন সাঈদ নুরসীর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের নেতা। বলতে গেলে পর্দার অন্তরাল থেকে তুরস্কের ইসলামী আন্দোনকে এগিয়ে দিচ্ছেন। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াতেও ইসলামী আন্দোলন পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তাদের কর্মপন্থা ও কৌশল গ্রহণ করেই এগিয়ে চলছে। সুতরাং বর্তমান সংকট সন্ধিক্ষণে এসে বাংলাদেশের জন্যও একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আন্দোলনকে একটি নতুন অধ্যায়ে নিয়ে যাওয়ার।

২০.

যেহেতু স্বাধীনতার বিরোধিতা ও যুদ্ধাপরাধের মিথ্যা অভিযোগ এনে সম্ভাবনাময় একটি ইসলামী আন্দোলনকে গলাটিপে হত্যা করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে, এবং যেহেতু বিষয়টি আমরা মিটমাট করতে পারিনি অথবা এই রাজনৈতিক বিরোধটি নিরসন করতে পারিনি, যেহেতু আমরা অনেকেই মনে করেছিলাম এটা এক সময় এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে, যেহেতু আমাদের অনেকের চিন্তার গন্ডি অতিক্রম করে এটাকে একটি জ্বলন্ত ইস্যু হিসাবে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেহেতু সরকারও এ বিষয়ে অবশ্যই একটা কিছু করতে বদ্ধপরিকর এবং যেহেতু কিছু না হলেও দল ও নেতৃত্বের ভাবমর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠিত হয়েছে এবং জনমনে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে, সেহেতু সামগ্রিক বিবেচনায় নতুন কর্মপন্থা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করা সময়ের অনিবার্য দাবী।

আমরা যদি নতুন কর্মকৌশল গ্রহণে ব্যর্থ হই ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না এবং আমরা ইতিহাসের কাছে দায়ী হয়ে যাবো। কারণ এক বিপুল সংখ্যক মানুষের মাঝে আমরা আশাবাদ জাগিয়েছিলাম। আমাদের আন্দোলনের সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। আমাদের ছাত্র তরুণদের বিরাট এক কাফেলা জীবন দিয়েছে, শহীদ হয়েছে, পঙ্গু হয়েছে, অনেকে তাদের জীবন ও যৌবন এই পথে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

সুতরাং, এক নম্বর যে বিকল্প উল্লেখ করা হয়ছে সেভাবে হাল ছেড়ে দিলে আমরা অথর্ব প্রমাণিত হবো। তখন সময় চলে যাবে। সুতরাং সময় থাকতেই আমাদের সতর্ক হতে হবে। তিন নম্বর যে বিকল্পের উল্লেখ করেছি সেটাও সমাধান নয়। শুধু স্থানীয় অধার্মিক শক্তি নয় বরং আন্তর্জাতিক ধর্মহীন শক্তিও আমাদের জন্য বড় অন্তরায়। তারাও ওৎ পেতে আছে কিভাবে আমাদের অগ্রযাত্রা রুখে দেয়া যায়। আর এ কারণেই এই বিকল্প পন্থা এখন আমাদের জন্য খুব সহায়ক হবে না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনের দিকটা সামনে রেখেই কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

২১.

পরিস্থতি খুব নাজুক। নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে। নিজেকে সম্পৃক্ত করে চিন্তা করলে সমস্যার সমাধান হবে না। আপাতদৃষ্টিতে জামায়াতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে এমনটি মনে হলেও ক্ষতির কিছু নেই। বরং হেকমতের খাতিরে তেমন একটা কিছু করে হলেও নতুন আন্দোলন দাঁড় করানোর ঝুঁকি গ্রহণ করা উচিত।

এক: বাংলাদেশের সংবিধান সামনে রেখে যে ধরনের সংগঠন হলে কোনো প্রশ্ন থাকবে না সে ধরনের সংগঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে ন্যায়বিচার এবং সুশাসন কায়েমকে অবলম্বন করতে হবে। একে পার্টির গঠনতন্ত্র এবং মেনিফেস্টোর দৃষ্টান্ত সামনে রেখে দলের গঠনতন্ত্র তৈরি করতে হবে। তবে তাদের গঠনতন্ত্র ও মেনিফেস্টোতে অনেক কিছু পুনরাবৃত্তি আছে এবং বেশ দীর্ঘও বটে। ওটাকে সংক্ষেপ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট সামনে এনে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও চুম্বক বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করতে হবে। জনগণের অতি প্রয়োজনীয় কিছু ইস্যুকে হাইলাইট করতে হবে।

দুই: ছায়া মন্ত্রীসভার কনসেপ্ট গ্রহণ করতে হবে। যতটা মন্ত্রণালয় আছে ততটি ডিপার্টমেন্ট করে প্রতি ডিপার্টমেন্টে কমপক্ষে দুইজন সদস্যকে দায়িত্ব দিতে হবে। একজন প্রধান দায়িত্বশীল হবেন এবং অপরজন হবেন তার সহকারী দায়িত্বশীল। এদেরকে নিয়েই কেন্দ্রীয় কমিটি হতে হবে। এক ব্যক্তিকে একাধিক দায়িত্ব দেয়া পরিহার করতে হবে। ব্যাপক কেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

তিন: একটি অভিভাবক পরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। সিনিয়র সিটিজেন, বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ এর সদস্য থাকবেন।

চার: একটি ওলামা কাউন্সিল বা শরীয়া বোর্ড থাকবে। নানা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চালাবে এবং নতুন প্রশ্ন সৃষ্টি হলে তা নিরসন করবেন। যে কোনো মূল্যে ইসলামী ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এবং এ জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

পাঁচ: তিন টার্মের বেশি কেউ একাধারে কেন্দ্রীয় সভাপতি বা জিলা সভাপতি থাকতে পারবেন না। পদ পদবী বা দায়িত্বের ব্যাপারে বাংলা পরিভাষাই ব্যবহৃত হবে। সংগঠনের সকল পর্যায়ে আইটি-এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ছয়: কেন্দ্রীয় কমিটিতে সকল পেশার লোকদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। এসব ক্ষেত্রে জনশক্তি পরিকল্পনা করতে হবে। প্রতিবছর কোন ক্ষেত্রে কি পরিমাণ প্রোডাক্ট চাই তা নির্ধারণ করতে হবে।

সাত: একটি সেক্রেটারিয়েট থাকবে যারা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করবেন না। সমন্বয় করবেন কিন্তু কোনোকিছু চাপিয়ে দিবেন না।

আট: সকল ডিপার্টমেন্টের কমিটি থাকবে এবং ওসব কমিটি অনেকটা স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সকল ডিপার্টমেন্ট সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

নয়: একটি লিগেল এইড কমিটি থাকবে। আইনগত সহযোগিতা ছাড়াও সংগঠনের অভ্যন্তরে কোনো সমস্যা দেখা দিলে হলে এই কমিটি দ্রুততার সাথে তার নিরসন করবে এবং কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শালিস হিসাবে কাজ করবে।

দশ: অগ্রাধিকার দিতে হবে :- (১) শিক্ষা, (২) সমাজসেবা, (৩) স্বাস্থ্য, (৪) মিডিয়া, (৫) ব্যবসা-বাণিজ্য ও (৬) ছাত্র আন্দোলন।

এগার: নির্বাচনের জন্য প্রথমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য সম্ভাবনাময় লোকদের এখন থেকে তৎপরতা চালাতে হবে।

বার: জেলা পর্যায়ে স্বাধীন পেশা-ব্যবসা, ওকালতি, শিক্ষকতা ইত্যাদির ব্যাপারে লোকদের পরামর্শ দিতে হবে। দায়িত্বশীলের সামাজিক পরিচিতি থাকতে হবে– শুধুমাত্র দলীয় পরিচিতি নয়।

তের: জামায়াত একটি অবকাঠামো করেই রেখেছে বিশেষ করে অনেকগুলো সহযোগী প্রতিষ্ঠান আছে। এগুলোকেও যথাযথভাবে গতিশীল করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠান ঝিমিয়ে আছে এবং পরিবর্তন অনিবার্য। যেমন- মসজিদ মিশন, ইসলাম প্রচার সমিতি, এডুকেশন সোসাইটি, আধুনিক, দারুল আরাবিয়া ও দারুল ইফতা, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, চাষী কল্যাণ সমিতি, মওদুদী একাডেমী, সোনার বাংলা প্রকাশনী, আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, দারুল ইসলাম ট্রাস্ট, তামিরুল মিল্লাত ট্রাস্ট, মারুফ একডেমী, ফয়সল ইন্সটিটিউট, মানারাত স্কুল এন্ড কলেজ, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইবনে সিনা ট্রাস্ট এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান। বিআইসির কথা উল্লেখ করলাম না কারণ এখানে যিনি আছেন তিনি পরিবর্তনে বিশ্বাসী নন। এ সকল প্রতিষ্ঠানেই সম্পদ আছে। ক্রমান্বয়ে এসব প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন আনতে হবে এবং গতিশীল করতে হবে। জেলা পর্যায়েও অনেক ট্রাস্ট ও প্রতিষ্ঠান আছে যা কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। মানারাত ও বাদশাহ ফয়সল স্কুল এন্ড কলেজ অথবা তামিরুল মিল্লাত টঙ্গিকে কেন্দ্র করেও বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান করা যায়, সফিপুরে ওয়ামীর একটা জায়গা পড়ে আছে সেখানেও বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব। তাছাড়া বিভাগীয় হেডকোয়ার্টারগুলোতে যেসব প্রতিষ্ঠান আছে ওসব প্রতিষ্ঠানকে আরো সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

প্রত্যেক জেলায় প্রথম শ্রেণীর স্কুল ও ইন্টারমেডিয়েট কলেজ গড়ে তোলার মাধ্যমে মেধাবীদের রিক্রুট করা সম্ভব।

মোদ্দাকথা আমাদের যে শক্তি, অর্থ, মেধা রয়েছে তা উল্লেখিত অগ্রাধিকার খাতসমূহে ব্যয় করার মাধ্যমে পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যেই আমরা একটা পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারি। বাইরে অবস্থানরত জনশক্তিকে প্রয়োজনে দেশে ফেরত আনতে হবে। আবার উচ্চতর শিক্ষা ও আন্দোলনের প্রয়োজনে জনশক্তি বাইরে রফতানি করতে হবে।

চৌদ্দ: ক্রিকেট, ফুটবল ও হকি টিম গঠন করতে হবে ইয়ুথ ডিপার্টমেন্টের অধীনে অথবা ছাত্রদের সহায়তায়। এ জন্য প্রয়োজনে ক্লাব স্থাপন করা যেতে পারে।

পনর: একটি আন্তর্জাতিক ভাষা ইন্সটিটিউট করা যেতে পারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে। স্পোকেন ইংলিশ, আরবী, ফ্রেন্স, জার্মান, ম্যান্ডারিন, জাপানী, কোরিয়ান, বাহাসামালয়া ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করা যেতে পারে।

ষোল: সর্বাবস্থায় 'ইউনিভার্সিটি অব থট' ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এটাকে সম্প্রসারিত ও গতিশীল করতে হবে।

সতের: 'ভোরের ডাক' পত্রিকাটি কিনে নিয়ে একটি রাজধানী কেন্দ্রিক ৪ পৃষ্ঠার সফল কাগজ করা যায়। সাংবাদিক (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) তৈরি করে বিভিন্ন পত্রিকায়, চ্যানেলে ঢুকাতে হবে। এ ব্যাপারে নিবিড় তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। একাধিক থিংক ট্যাংক গড়ে তুলতে হবে।

আঠার: শিশু কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বর্তমান কাঠামো রেখেই আরো গতিশীল ও সম্প্রসারিত করতে হবে। নারী সমাজের উন্নয়ন, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে সুস্পষ্ট কার্যক্রম থাকতে হবে।

উনিশ: অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সামাজিক ও একটি ওয়ার্কিং রিলেশন গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য কিছু লোককে নিবেদিত প্রাণ হয়ে ঐ সেক্টরে কাজ করতে হবে। উপজাতীয়দের মধ্যে কিছু লোক নিয়োজত করতে হবে।

বিশ: তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের মাঝে এবং ব্যবস্থাপনায় জরুরিভিত্তিতে একটি সেল করে কাজ করতে হবে। এখানে প্রশিক্ষণ দিয়ে ভালো কর্মসংস্থান হতে পারে– তার সুযোগ নিতে হবে। এটা বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম লাইফ লাইন হিসাবে বিবেচিত হবে এবং ভূমিকা পালন করবে। ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করা খুব সহজ। কিন্তু আমরা কোন মনোযোগ দেইনি।

একুশ: আনুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন চালু করার প্রশ্নে জনমত গঠন করা উচিত। বাংলাদেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করে সরকারের কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ

করা জরুরী। সাড়ে ষোল কোটি মানুষের দেশে সবকিছু রাজধানীমুখী যা unmanageable। সামাজিক শক্তি অর্জন করতে হবে। প্রচারমুখীতার পরিবর্তে সমাজের বিভিন্ন পেশা ও বিভিন্ন স্তরের চালিকা শক্তির উপর আদর্শিক ও নৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে। রাজনীতি প্রবণতার পরিবর্তে আন্দোলনের প্রকৃতি হতে হবে সামাজিক ধাচের ও মানবকল্যাণধর্মী।

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এই নতুন কর্মকৌশল গ্রহণের ব্যাপারে জনশক্তির মাঝে আলোচনা ও মতবিনিময় হওয়া উচিত। একটা ঐকমত্যে পৌঁছার জন্য সার্বিক প্রয়াস চালানো দরকার। জামায়াত আমাদেরকে অসাধারণ শৃঙ্খলা শিক্ষা দিয়েছে সেই সাংগঠনিক শৃংখলার মধ্যে আমাদের থাকতে হবে। শৃংখলার মধ্যে থেকে সংগঠনের অভ্যন্তরে পরিবর্তন আনতে হবে। জনশক্তি বিকল্প পথের সন্ধান করছে। দেশের ভিতরে এবং বাইরে নতুন চিন্তাধারাকে দারুণভাবে অভিনন্দন জানাবে। দূরের চিন্তা যারা করেন না কিংবা স্থিতাবস্থা বজায় রাখাটাই যারা ভালো মনে করেন তারা হয়তো বা বিরোধিতা করতে পারেন। তবে তাদেরও আন্তরিকতার অভাব নেই। ধৈর্যের সাথে সবাইকে বুঝাতে হবে এবং ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে অথবা কমপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে ইতিহাসের এই সংকট সন্ধিক্ষণে আন্দোলনের জন্য নতুন কৌশল নির্ধারণ এক ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। আমি বিশ্বাস করি মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঠিক পথ দেখাবেন।

ক্ষমতার রাজনীতি, ধর্মহীনতার রাজনীতির মিথ্যা অভিযোগের নির্মম শিকার হয়ে আমার বন্দী জীবনের অনুভূতি সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করছি:

১. বর্তমান সরকার যতদিন ক্ষমতায় আছে আমাদের মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। সহসা সরকার পরিবর্তনেরও কোনো সম্ভাবনা নেই।

২. আন্দোলন করে আমাদের মুক্ত করা হবে এমন কোনো সম্ভাবনাও নেই। আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটার কোনো আশংকাও নেই। পুরো মেয়াদ পর্যন্তই সরকার ক্ষমতায় থাকবে।

৩. বর্তমান সরকারের মেয়াদের মধ্যেই আমাদের কিছু সংখ্যকের বিচারের নামে প্রহসন হবে। কারণ ইস্যুটাকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে।

৪. তথাকথিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের কাছে কোনো ন্যায়বিচার আমরা পাবো না। আইনটা একটা কালো আইন হওয়ার কারণে সরকার যা চাইবে তাই করা বা তাদের কাঙ্ক্ষিত রায় দেবারই সুযোগ রয়েছে।

৫. জামায়াতের উপর এবং জামায়াতের নেতা হিসাবে আমাদের উপর সুস্পষ্ট জুলুম হচ্ছে এ জন্য অনেকে দুঃখ প্রকাশ বা নিন্দা করলেও দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কার্যকরভাবে আমাদের তথা জামায়াতের পক্ষ অবলম্বন করবে না।

৬. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিচার কাজের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করলেও একটি ইসলামী দলের নেতাদের শাস্তি হলে (তা যত অন্যায়ভাবেই হোক না কেন) ভিতরে ভিতরে তারা অখুশী হবে না।

৭. জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধের মত স্পর্শকাতর ইস্যুতে বিচার করার পর জামায়াতকে সরকার নিষিদ্ধ না করলেও জামায়াতের ভাবমর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ হবে। দেশের ভিতরে ও বাইরে জামায়াতকে যুদ্ধাপরাধী, বাংলাদেশ বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধীদের দল হিসাবে চিত্রিত করবে। ফলে জামায়াতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। জামায়াতের ভাবমর্যাদা পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

৮. জামায়াতকে নিষিদ্ধ না করলেও সরকার জামায়াতকে স্বস্তির সাথে কোনো কাজ করতে দিবে না। সর্বদা চাপের মুখে রাখবে।

৯. এহেন পরিস্থিতিতে জামায়াতের পক্ষে গণসংগঠনে পরিণত হওয়া বা নির্বাচনে জনগণের বিপুল সমর্থন লাভের যোগ্যতা অর্জন কখনো সম্ভব হবে না।

১০. বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষে যে নির্বাচন হবে তাতেও জামায়াত ভালো করতে পারবে এমন কোনো সম্ভাবনাও দেখছি না।

১১. জামায়াতের প্রতি আমাদের যে আবেগ, ভালোবাসা ও মহব্বত তাতে জামায়াত ছাড়া আমরা অন্য কিছু ভাবতেও পারি না। জামায়াতকে উপেক্ষা করে কিছু করতে গেলে ভুল বোঝাবুঝি অনিবার্য এবং কিছু করলেও তা সফল ও জনশক্তির নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

এই জায়গায় এসে আমরা এখন থমকে দাঁড়িয়েছি। প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ কি?

এক. যা হবার হবে। আমরা যেমন আছি তেমনি থাকবো (বর্তমানে এই কৌশলই অবলম্বন করা হয়েছে)।

দুই. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জামায়াত সিদ্ধান্ত নিয়ে পিছনে থেকে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তুলবে। এই সংগঠন প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তার সাথে ধর্মহীন শক্তির মোকাবিলা করবে।

তিন. আমাদের যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে তারা জামায়াতের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াবো এবং সম্পূর্ণ নতুন লোকদের হাতে জামায়াতকে ছেড়ে দেবো। অর্থাৎ একটা new generation Jamaat হবে এটি।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় উপরোক্ত তিন অবস্থার প্রথমটা হচ্ছে নেতৃত্ব আঁকড়ে থাকা, হতবুদ্ধিতা এবং হতাশাবাদিতা। একটি গতিশীল আন্দোলন এ ধরনের পশ্চাৎমুখী অবস্থান গ্রহণ করতে পারে না।

তৃতীয় যে পন্থা নতুন নেতৃত্বের হাতে জামায়াতকে ছেড়ে দেয়া এটা বিবেচনা করা যেত যদি ১৯৭১ সালের বিষয়টার একটা রাজনৈতিক মীমাংসা বা মিটমাট আমরা করতে পারতাম। জামায়াতের ভাবমর্যাদা যেভাবে ভুলুণ্ঠিত করা হয়েছে, জামায়াত সম্পর্কে যে এলার্জি তৈরি করা হয়েছে, পাঠ্যপুস্তক, মিডিয়ায় এবং রাজনৈতিক প্রচারণায় যেভাবে জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী বাংলাদেশ বিরোধী দল হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে নতুন নেতৃত্ব হলেও দেশের সাধারণ মানুষ, নতুন প্রজন্ম এবং রাজনৈতিক মহল জামায়াতকে সহজে গ্রহণ করে নিতে পারবে না।

দ্বিতীয় যে পন্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আমার মতে সামগ্রিক বিবেচনায় এই বিকল্প পন্থাটির কথা চিন্তা করা যেতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইসলামী আন্দোলন এই কৌশল অবলম্বন করে ভালো ফল লাভ করেছে। আমাদের সামনে তুরস্ক, মিসর, আলজেরিয়া, সুদান, ইয়ামেন, মরক্কো, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জর্দানসহ পৃথিবীর প্রায় সকল ইসলামী আন্দোলন পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন কৌশল অবলম্বন করেই এগিয়ে চলেছে।

তাছাড়া আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচ্য। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিরোধিতা করার মত অতি স্পর্শকাতর কোনো অভিযোগ নেই। এটা স্বীকার করতেই হবে যে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন খুবই সম্ভাবনাময় আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও এই দুর্ভাগ্যজনক ও স্পর্শকাতর অভিযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক সাফল্য ও গ্রহণযোগ্যতার পথে বড় বাধার সৃষ্টি করে আছে। ইসলামী আন্দোলনের দুশমনরা আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারণায় ও কৌশলে আপাতত সফল হয়ে গিয়েছে।

রাজনৈতিকভাবে বিষয়টি মিটমাট করতে না পারার কারণে আজ বাস্তবেই মিথ্যা অভিযোগ মাথায় নিয়ে আমরা বিচারের কাঠগড়ায়। আমরা ১৯৭১ সালে জামায়াতের নেতৃত্ব দেইনি, জামায়াত রাজনৈতিকভাবে সমর্থন করলেও তখনকার দলীয় নেতারাও যুদ্ধে শরীক ছিলেন না, নেতৃত্ব দেয়া তো দূরের কথা। আমাদের যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হচ্ছে তারা কেউই যুদ্ধ করিনি বা কোন বাহিনীরও সদস্য ছিলাম না। আমাদের দ্বারা যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ বা লুটতরাজের প্রশ্নই উঠে না। আজ রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হবার কারণেই রাজনৈতিক প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার শিকার আমরা বা জামায়াত। আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সাজানো এবং সবৈব মিথ্যা। আমাদেরকে নিয়ে সরকার ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

আমরা নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ালাম যাতে বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ না থাকে। এ ধরনের একটি অবস্থান গ্রহণ করলে সাময়িকভাবে আমাদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে অবমাননাকর মনে হলেও শেষ পর্যন্ত মহত্বের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের অনেকের তো বয়সও হয়েছে। সরাসরি আন্দোলনে থাকলেই বা আমরা আর কতটা অবদান রাখতে পারবো? সুতরাং সবাই মিলে দ্বিতীয় যে বিকল্পটির কথা উল্লেখ করেছি

তা সামনে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হবে কাঙ্খিত এবং যুক্তিযুক্ত। দোয়া করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমাদেরকে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার তওফিক দান করুন। আমিন!

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
২৬শে নভেম্বর, ২০১০।
৭ সেল (বকুল), ২নং কক্ষ।
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা।

বিবেচনায় আনতে হবে সবকিছু

শামসুন্নাহার নিজামী

[প্রথম পর্ব]

জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এখন জেলে। দেশের তৃতীয় বৃহত্তম এ রাজনৈতিক দল নিয়ে ঔৎসুক্যের শেষ নেই। অনেকেই দলটির এ অবস্থাকে 'খুবই নাজুক' অথবা দলটি 'কঠিন চ্যালেঞ্জে' আছে মনে করেন। মূলত জামায়াতে ইসলামীর সঠিক স্বরূপ না জানার কারণেই এ কথাগুলোর সৃষ্টি হয়। জামায়াতে ইসলামী গতানুগতিকভাবে কোন রাজনৈতিক দল নয়। বরং জামায়াতে ইসলামী একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন।

ইসলামী আন্দোলন অতীতে নবী রাসূলগণ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এ দুনিয়াতে মানুষের সমাজে পূর্ণাঙ্গ শান্তি কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আখেরাতে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পথ প্রদর্শক হিসেবে যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত অসংখ্য নবী রাসূল এসেছেন। তারা সবাই ছিলেন মানবতা মনুষ্যত্বের পূর্ণাঙ্গ সার্থক মডেল। তারা নিজেরা যেমন নিজের মনগড়া পথে চলেননি, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলেছেন তেমনি মানুষকেও আল্লাহর পথে ডেকেছেন। সমস্ত নবী রাসূল একই আহবান জানিয়েছেন, *"হে আমার জাতির জনগণ তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। কোনো গাইরুল্লাহর দাসত্ব করো না।"*

---

[*] লেখক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগের তৎকালীন সেক্রেটারি। কামারুজ্জামানের চিঠি নিয়ে পত্রিকায় রিপোর্ট ছাপা হওয়ার পর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় দুই পর্বের এই নিবন্ধটি তিনি লেখেন। এটি ১১ মার্চ ২০১১ তারিখে প্রকাশিত প্রথম পর্ব। লিংক: http://weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=799

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন মানবতার সর্বশেষ মডেল। তিনি এসেছিলেন এক অশান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে। সেই সমাজকে, সেই সমাজের মানুষকে তিনি আল্লাহর দেয়া হেদায়েতের আলোকে আলোকিত করে একটি সুন্দর সমাজ, একদল উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষে পরিণত করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছিল শেষ কিতাব 'আল কোরআনের' বদৌলতে। নবুয়তের পূর্বে দীর্ঘ ৪০ বছর তাঁর কেটেছিল অত্যন্ত ভালো। সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা এগুলো ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এ জন্যে সবাই তাঁকে 'আল-আমীন', 'আস-সাদিক' উপাধি দিয়েছিল। কিন্তু এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিও নবুয়ত-পূর্ব যুগে সর্বাত্মক চেষ্টা করেও সেই সমাজে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেননি। কিন্তু নবুয়ত লাভের পর মাত্র ২৩ বছরে আল্লাহর দেয়া হেদায়েতের বদৌলতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করেন।

এ থেকে বুঝা যায় মানুষের নিজের চেষ্টায় এ কাজ সম্ভব নয়, বরং এর জন্যে প্রয়োজন আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত। সেই হেদায়েত আমাদের কাছে অবিকৃত আছে, সেটা কোরআন এবং সুন্নাহ। রাসূল (সা)-এর হাদীস, যতদিন তোমরা এটাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।

জামায়াতে ইসলামী সেই দল যারা কোরআন এবং সুন্নাহর এই পথেই চলে। এ দল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এ পথেই কেবল মানবতা মনুষ্যত্বের কল্যাণ সম্ভব। জামায়াত মনে করে যে কোন পরিস্থিতিতে বা পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন কোনো কর্মকৌশল নয় বরং শাশ্বত সেই কর্মকৌশল অবলম্বন করতে হবে যে কর্মকৌশল অবলম্বন করেছিলেন মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা)। পরিস্থিতি যতই নাজুক হোক, চ্যালেঞ্জ যত কঠিনই হোক 'শর্টকাট' কোনো পথ নেই। কারণ এ হেদায়েত নির্দেশনা এসেছে সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে যিনি সমস্ত বিশ্ব জাহানের রব। যার কাছে অতীত, বর্তমান ভবিষৎ সব পরিষ্কার। তিনি যেমন অতীতকে জানেন তেমন বর্তমান দেখেন এবং ভবিষ্যতে কি হবে তাও জানেন। বান্দার সামনে যা আছে তাও তিনি জানেন আবার পিছনে যা আছে তাও জানেন। তিনি মানুষের শেখার জন্য, বুঝার জন্য কোরআন মজিদে বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন নবী রাসূলের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সরাসরি কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। যা শুধু সুর করে তেলাওয়াতের জন্য নয়। নয় জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে পন্ডিত হিসেবে জাহির করার জন্য বরং বাস্তব জীবনে যখন ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে বাতিলের মোকাবেলা করতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে গিয়ে জীবনে বাস্তবে অনুসরণ করার জন্য। কোরআনের ঘোষণা :

"তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ এখনও তোমরা সে লোকদের অবস্থায় আসনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর বহু বিপদ মুসিবত ও দুঃখ কষ্ট এসেছে তাদেরকে অত্যাচার নির্যাতনে এমনভাবে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন রাসূল এবং তাঁর প্রতি যারা

ঈমান এনেছিল তারা আর্তনাদ করে বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছিল, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।"

(সূরা আল-বাকারা: ২১৪)

"তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে। যদি তোমরা (এখন ওহুদ যুদ্ধে) আঘাতপ্রাপ্ত হও, তাহলে তারাও তো (বিরোধী পক্ষ) তেমনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে (বদরের যুদ্ধে)। আর এ দিনগুলো আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। আর এ সময় ও অবস্থাদি তোমাদের উপর এ জন্যে আনা হয়েছে যে, আল্লাহ জানতে চান তোমাদের মধ্যে কারা সাচ্চা মুমিন। আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। তিনি এই পরীক্ষার মাধ্যমেই সাচ্চা মুমিনদেরকে বাছাই করে নিয়ে কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো আল্লাহ দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে জিহাদ করেছে এবং কে তাঁর জন্যে সবরকারী।"

(সূরা আল ইমরান: ১৩৯-১৪৩)

"যেদিন দু'দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছিল সেদিন তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছিল তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছিল এবং তা এ জন্যে হয়েছিল যাতে আল্লাহ দেখে নেন কে তোমাদের মধ্যে মুমিন এবং কে মুনাফিক।"

(আল ইমরান: ১৬৬-১৬৭)

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে (তাঁর পথে) যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত।"

(আত তওবাহ: ৯৬)

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা 'আমরা বিশ্বাস করি' এ কথা বলেই ছাড়া পেয়ে যাবে? এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তোমাদেরকে পরীক্ষা করেছি যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী।"

(আল আনকাবুত: ২-৩)

"আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না প্রকাশ হয় কে কে তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী এবং কে কে সবরকারী এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থা যাচাই করি।"

(সূরা মুহাম্মদ: ৩১)

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎ পথ দেখান, আর আল্লাহ সব বিষয়ে অবগত আছেন।"

(আত তাগাবুন: ১১)

"পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোনো বিপদ আসে না, কিন্তু তা জগৎ সৃষ্টির আগেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এ জন্য বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তাতে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"

(আল হাদীস: ২২-২৩)

আল কোরআনের অনুরূপ রাসূল (সা)-এর বর্ণনায়ও (আল হাদীস) অনুরূপ কথা এসেছে:

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, *"রাসূল (সা) বলেছেন, মুমিন নর-নারীর উপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে, কখনো সরাসরি তার জীবনের উপর বিপদ আসে, কখনো তার সন্তান মারা যায়, আবার কখনো তার ধনসম্পদ ধ্বংস হয়। অবশেষে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হয় যে,* তার আমলনামায় আর কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না।"

(তিরমিজি)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, *"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বিপদ আপদ ও পরীক্ষা যতো কঠিন হবে তার প্রতিদানও হবে ততো মূল্যবান। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্য তাদেরকে বিপদ মুসিবত ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহও তাদের উপর অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিজী) এবং (মালিক তার) মেষ পালনের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া (বাঘ) অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করেছো।"*

(বুখারী)

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, *"একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট (আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তার চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে কাবাঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কী আমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চান না? আপনি কী আমাদের জন্যে দোয়া করেন না? তখন তিনি বললেন, (তোমার উপর আর কীই-বা দুঃখ নির্যাতন এসেছে) তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের কারো জন্য গর্ত খোঁড়া এবং সে গর্তের মধ্যে তার দেহের অর্ধেক পুঁতে তাকে দাঁড় করিয়ে তার মাথার উপর করাত দিয়ে তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এ অমানুষিক অত্যাচার তাকে তার দ্বীন থেকে বিরত রাখতে পারতো না। আবার কারো শরীর থেকে লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে হাড় থেকে গোশত আলাদা করে ফেলা হতো। কিন্তু এতেও তাকে তার দ্বীন থেকে ফিরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যে কোনো উষ্ট্রারোহী সান'আ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে সফর করবে আর এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না এবং (মালিক তার) মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া (বাঘ) অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো।"*

(বুখারী)

কোরআন সুন্নাহর এ আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসই হচ্ছে বাতিল শক্তির পক্ষ থেকে যুলুম নির্যাতনের ইতিহাস। যারা বাতিলের সাথে Compromise করে অথবা Alternate কোন পথ খোঁজে, হয়তো বা আপাতত দৃষ্টিতে তারা সমস্যা এড়াতে পারে। কিন্তু এটা মোটেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পথ নয়।

জামায়াত নিছক ক্ষমতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার প্রবণতাও জামায়াত নেতৃবৃন্দের নেই। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ধারা-১৫ এর ২ নং এ বলা হয়েছে, *সদস্যগণের (রুকনদের) সরাসরি গোপন ভোটে আমীরে জামায়াত তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হবেন।* অষ্টম অধ্যায়ে 'নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়'-এর ধারা ৬৫-এর ১ নং এ বলা হয়েছে, *জামায়াতের সকল সাংগঠনিক স্তরে যে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন কিংবা নিযুক্তিকালে ব্যক্তির দ্বীনি ইলম, আল্লাহ ভীতি, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, রাসূল (সা)-এর প্রতি আনুগত্য, দেশপ্রেম, আমানতদারি, অনড় মনোবল, কর্মে দৃঢ়তা, দূরদৃষ্টি, বিশ্লেষণ শক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, প্রশান্ত চিত্ততা, সুন্দর ব্যবহার, মেজাজের ভারসাম্য, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলার বিধানের যোগ্যতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে।* ২ নং এ বলা হয়েছে, *প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো পদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হওয়া বা ইহার জন্য চেষ্টা করা উক্ত পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হওয়ার জন্য অযোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত।*

গঠনতন্ত্রের এই ধারাসমূহ সংগঠনের সর্বত্র খুবই কঠোরভাবে Practice করা হয়। জামায়াতে ইসলামীতে কেউ নেতা হওয়ার জন্য যেমন আসে না তেমনিভাবে নেতৃত্ব আঁকড়েও থাকে না। জামায়াতের নেতাদেরকে নেতা না বলে দায়িত্বশীল বলার রেওয়াজ আছে। দায়িত্ব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ দায়িত্ব যেমন চেয়ে নেয়া যায় না তেমনি এ দায়িত্ব থেকে পলায়ন করার সুযোগও নেই। আজকে জামায়াতে ইসলামীর যে সমস্ত নেতা জেলে আছেন তারা কেউই ব্যক্তিগত কারণে জেলখানায় আবদ্ধ নন। ব্যক্তি জীবনে সৎ, যোগ্য এবং নীতিবান বলে তারা সমাজে পরিচিত। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আজ তারা জেল যুলুমের মত কষ্ট ভোগ করছেন। এদের কেউ কেউ মন্ত্রীও ছিলেন। মন্ত্রী থাকালীন সময়ে সততা যোগ্যতার পথে তারা দায়িত্ব পালন করেছেন। এর সাক্ষী যেমন মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তেমনি সাক্ষী দেশবাসী। দূরবীন দিয়ে খুঁজেও তাদের দুর্নীতি বের করতে কেউ পারেনি। তাহলে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার প্রশ্ন কেন আসে। কেউ দুনিয়াতে ক্ষমতাবান হওয়ার জন্য জামায়াতে ইসলামী করে না, করে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে। স্বহস্তে কষ্টোপার্জিত অর্থ বায়তুলমালে দিয়ে এ সংগঠনের জনশক্তি সংগঠনের Fund-কে সমৃদ্ধ করে। (ষষ্ঠ অধ্যায়: ধারা-৬০)।

উল্লেখ্য, প্রত্যেক রুকন (সদস্য) নিজ নিজ মাসিক আয়ের কমপক্ষে শতকরা পাঁচ ভাগ এয়ানত হিসেবে প্রদান করে। জামায়াতের জনশক্তি বিশ্বাস করে: *"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের জান এবং মাল বেহেশতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।"* কাজেই সাধ্যমত তারা জানমাল দিয়ে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে অংশ নেয়।

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব নির্বাচনের দায়িত্ব কোনো নেতার নয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রুকনদের প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে আমীর নির্বাচিত হন। কাজেই এখানে কোনো New Generation-এর হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়ার বা ধরে রাখার প্রশ্ন অবান্তর।

বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে। যদি এ সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারে তাহলে আরও তিন বছর ক্ষমতায় থাকবে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (?) নিয়ে তারা ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতার দাপটে তারা জামায়াত নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আটক রেখেছে। কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করলেই কি তাকে আটক রাখা যায়? এটা তো সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন। অভিযোগ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত একজন মানুষ নিরপরাধ। এটাই আইনের কথা। দীর্ঘ সাত মাস আটকে রাখার পরও এখন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংস্থা কোন অভিযোগ গঠন করতে পারেনি। যেখানেই তারা তদন্ত করতে গেছে সেখানেই তারা গণপ্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। আর এদের অনেকেই একাধিকবার এলাকা থেকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। দলটির আমীর ২ বার তার এলাকা থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। মোট ৪ বার তিনি নির্বাচিত করেছেন। বাকি দুইবার তিনি বিপুল ভোট পেয়েছেন ষড়যন্ত্র করে তাকে হারানো হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো থানায় কোনো মামলা নেই। তার সততা, যোগ্যতার ব্যাপারে বিরোধী শিবিরেরও দ্বিমত নেই। শুধু আদর্শগত কারণে তারা এ রাজনৈতিক

প্রতিহিংসার শিকার। বর্তমান সরকার ক্ষমতার দাপটে অনেক কিছুই করতে পারে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর সর্বপর্যায়ের জনশক্তি (নেতৃবৃন্দসহ) বিশ্বাস করে:

"আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর, আর সবকিছু আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।"

(আলে ইমরান-১০৯)

"বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মান দান করো আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমিই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই মৃত থেকে জীবিতদের আবির্ভাব ঘটাও। আর তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিসীম জীবিকা দান করো।"

(আলে ইমরান-২৬-২৭)

অসীম ক্ষমতার মালিক আল্লাহর কাছে দুনিয়ার সব ক্ষমতাই নগন্য। যারা আল্লাহর পথে চলে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ১৯৭১ সালে জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মত মানবতা বিরোধী কোনো কর্মকান্ডেই তারা ছিলেন না। যদি থাকতেন তাহলে এ ৪০ বছরে এ দেশে তারা টিকতে পারতেন না। বরং চরিত্র মানুষের বদলায় না। ক্ষমতাসীন দলের সোনার ছেলেদের কর্মকান্ডে দেশের মানুষ আজ দিশাহারা। আজ যে চরিত্রের প্রকাশ তারা ঘটাচ্ছে, তাতে ভাবতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, যে অতীতেও এসব কর্মকান্ডের নায়ক ছিল তারাই।

জামায়াতের নেতৃবৃন্দের নামে অপপ্রচার চালিয়ে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করা এত সহজ নয়। তারা এদেশেরই মানুষ। এদেশের নাগরিক। রাজনৈতিক মতবিরোধ কোনো দলের থাকতেই পারে। কিন্তু যেদিন থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে সেই মুহূর্ত থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জানমাল দিয়ে কাজ করাকে জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তি ঈমানী দায়িত্ব মনে করে। আন্দোলন সংগ্রামের সময় অনেক দলেই দেখা যায় পয়সা নেই তো কর্মী নেই। কিন্তু সবাই জানে জামায়াতের ব্যতিক্রম। গাটের পয়সা খরচ করে তারা হকের জন্য মাঠে ময়দানে সব সময় সক্রিয়। সৎ নেতৃত্বের কথা বলে বুদ্ধিজীবীরা মুখে ফেনা তুলে ফেলেন। জামায়াত এই সৎ নেতৃত্ব তৈরি করতে জানে। যারাই জামায়াতকে কাছ থেকে দেখেছেন তারাই একথা স্বীকার করবেন। কাজেই জামায়াত নেতৃবৃন্দের ভাবমূর্তি নষ্ট করা এত সহজ নয়। এটা মানুষের অন্তরে গভীরে প্রোথিত।

অতীতে যারা ইসলামী আন্দোলন করেছে (আমি আগেই বলেছি) তাদের উপরও বিভিন্ন মিথ্যা দোষারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের বাণী:

"দুনিয়ার এ জিন্দেগী একটা খেলতামাশার ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে পরকালের আবাস পরহেজগারদের জন্য উত্তম। তবে কি তোমরা বুঝ না? আমার জানা আছে যে, তাদের (কাফেরদের) উক্তি (হে নবী) আপনাকে অবশ্যই কষ্ট দেয়। কিন্তু তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না। বরং জালেমরা তো আল্লাহর আদালতকেই অস্বীকার করে। আপনার পূর্বে অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। অতঃপর আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পূর্বের নবীদের কাহিনী পৌঁছেছে। তা সত্ত্বেও যদি তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা আপনার সহ্য করা কষ্টকর হয়, তাহলে আপনি পারলে ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সিঁড়ি তালাশ করুন এবং তাদের নিকট কোন মোজেজা আনুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে একত্রিত করে হেদায়েত করতে পারতেন। অতএব আপনি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।"

(আল আনয়াম ১৩২-১৩৫)

জামায়াতে ইসলামী যারা করে তারা জেনে বুঝেই করে। কোন আশংকা কোনো ভয় তাদেরকে ভিন্ন পথে চালিত করতে পারে না। মৃত্যু ভয়ও তাদের থাকে না। তারা জানে: *"আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত।"* এ দলের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (র) ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, *"আমি ক্ষমা কেন চাইবো? এ জন্যে কি যে, হে আল্লাহ তুমি আমাকে জান্নাতে পাঠিও না।"*

দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষে চিরস্থায়ী আবাস জান্নাতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় অংশ নিল তাদের চিন্তায় কোন বিকল্প পথ নেই। এটা সেই পথ যা সরাসরি জান্নাতে চলে গেছে। পরম নিশ্চিন্ততার সাথে এরা পথ চলে। জেল জুলুম কোন কিছুই তাদেরকে বিচলিত করে না। ইসলাম রক্ষার দায়িত্ব মানুষের নয় আল্লাহর। কাজেই তার নির্দেশিত পথে চলাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার দাবি।

[দ্বিতীয় পর্ব]

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বের অবসান ঘটানোর লক্ষ্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজ কোনো মনগড়া বা আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামী নির্ধারণ করেনি। বরং কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ কাজের কথা পরিষ্কার করে বর্ণনা

[*] লেখাটির দ্বিতীয় পর্ব সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় প্রকাশিত হয় ২৫ মার্চ ২০১১ তারিখে। লিংক: http://weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=922

করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে তৈরি করেছেন এ দায়িত্ব পালনের জন্য। যা কুরআনে কালামে পাকে আল্লাহ বলেছেন, *"আমি দুনিয়াতে আমার প্রতিনিধি পাঠাব।"*

এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন, ফেরেশতাদেরকে দেননি। ফেরেশতারা আল্লাহর কর্মচারী। আল্লাহ যে হুকুম তাদের দেন তার বাইরে কিছু করার ক্ষমতা বা ইখতিয়ার আল্লাহ তাদেরকে দেননি। কিন্তু মানুষকে এ ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন। এ দায়িত্ব পালনের জন্য যুগে যুগে নবী-রসুল পাঠিয়েছেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মানবতার Perfect Model।

যেহেতু এ কাজের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই এ কাজ মানুষের জন্য ফরজ। দুনিয়ার মানুষের সকল রকমের অশান্তি ও বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর এটাই একমাত্র পথ। মানুষকে জুলুম-নির্যাতন ও যাবতীয় শোষণ থেকে মুক্তিদানের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) কাজ করেছেন। মানুষ মানুষের দাস হবে না। সবাই একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে। দাসত্ব বন্দেগী করবে একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ পাক বলেছেন,

"হে মানুষ আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।"

(সূরা হুদ: ৮৪)

"আল্লাহই তোমাদের রব। সন্দেহ নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র সবকিছুই তার নিয়ন্ত্রণাধীন। সাবধান সৃষ্টিও তাঁর, প্রভুত্বও তাঁর।"

(সূরা আরাফ: ৫৪)

"তিনিই আল্লাহ, তিনিই তোমাদের রব। তিনি ছাড়া আর কোন রব নেই। তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।"

(সূরা আনয়াম: ১০২)

"তাদেরকে সবকিছু ছেড়ে, সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করা এবং তারই আনুগত্য করে চলার আদেশ করা হয়েছে মাত্র।"

(সূরা আল বাইয়্যেনাহ: ৫)

নবী-রসুলগণের মাধ্যমে আল্লাহপাক যে জীবনবিধান পাঠিয়েছেন তার মূল কথাই হলো, আইন রচনা, নির্দেশ দান ও বিধান প্রণয়নের কোন অধিকার মানুষের নেই। এ অধিকার একমাত্র আল্লাহর–

"আল্লাহ ছাড়া আর কারো নির্দেশ দান ও আইন রচনার অধিকার নেই। তাঁর আদেশ এই যে, আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগী বা দাসত্ব কবুল করো না। বস্তুত এটাই সঠিক ও নির্ভুল জীবনব্যবস্থা।"

(সূরা ইউসুফ: ৪০)

"লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, কর্তৃত্বে আমাদেরও কোনো অংশ আছে কি? বল হে মুহম্মদ (সা), অধিকার ও কর্তৃত্বের সবটুকুই আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।"

(সূরা আলে ইমরান: ১৫৪)

"আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী যারা আইন রচনা করে না, হুকুম পরিচালনা করে না, মূলত তারাই যালেম।"

(সূরা আল মায়েদা: ৪৫)

আইন রচনা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। এ অধিকার কোন মানুষের নেই এমনকি নবীদেরও নেই। নবী নিজেও একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলেন।

"আমার নিকট যে অহী নাযিল হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করে চলি।"

(সূরা আল আনয়াম: ৫০)

নবীর অনুসরণ করা ছাড়া আল্লাহর হুকুম পালনও সম্ভব নয়।

"আমি যখনই কোনো রাসূল প্রেরণ করেছি, আল্লাহর অনুমতি অনুসারে তাঁর অনুসরণ করার জন্য তাকে পাঠিয়েছি।"

(সূরা নিসা: ৬৩)

কুরআনের এ আয়াতগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি কোনো ব্যক্তি, বংশ পরিবার, শ্রেণী বা দল, এমনকি রাষ্ট্রও প্রভুত্বের অধিকারী নয়।

আইন রচনা ও বিধান প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। আল্লাহর দেয়া আইনের কোনোরূপ পরিবর্তন বা সংশোধন করার অধিকারও কারও নেই।

আল্লাহপাক নবী (সা) এর মাধ্যমে যে বিধান দুনিয়ায় পেশ করেছেন তাই ইসলামী রাষ্ট্রের চিরন্তন ভিত্তিগত আইন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও আল্লাহপাক নির্ধারণ করে দিয়েছেন:

"আমি আমার নবীদেরকে সুস্পষ্ট বিধানসহ প্রেরণ করেছি। কিতাব ও 'মিযান' তাদেরকে আমি দান করেছি। এর সাহায্যে মানুষ সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করতে

পারবে। আমি 'লৌহ'ও দিয়েছি। এতে বিরাট শক্তি ও মানবতার অশেষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে।"

(হাদীদ: ২৫)

এ আয়াতে 'মিযান' শব্দটিতে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে। এ অনুযায়ী সমাজে সামাজিক সুবিচার কায়েমই এর লক্ষ্য, যা ছিল আম্বিয়ায়ে কেরামের একমাত্র কাজ।

"এদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা এবং রাজশক্তি দান করি তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, ভালো ও কল্যাণকর কাজ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।"

(সূরা আল হাজ্ব: ৪১)

"তোমরা সবচেয়ে উত্তম জাতি, নিখিল মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।"

(সূরা আলে ইমরান: ১১০)

কুরআনে কালামে পাকের এ আয়াতগুলো থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য শুধু মানুষকে জুলুম-নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেয়া ও দেশকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করাই নয় বরং কুরআন অনুযায়ী সামাজিক সুবিচারের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পাপ কাজের সমস্ত উৎস বন্ধ করা এবং পুণ্য ও কল্যাণের সমস্ত পথ খুলে দেয়া। সমাজ ও সংস্কৃতির প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগকে এটি স্বীয় বিশিষ্ট নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কারমূলক কর্মসূচি অনুযায়ী গঠন করে। অর্থাৎ মানুষের গোটা জীবনকে এর প্রভাবাধীন করে নেয় এবং এ ধরনের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান আল্লাহ ছাড়া আর কারও পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ভূমিকায় এ কথাগুলো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

মূলত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রচলিত অর্থে কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন। কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে এবং নির্দিষ্ট গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে এ দল পরিচালিত হয়। বিরোধী কোন শক্তির পক্ষ থেকে কেউ আক্রমণ করল কিনা তার মোটেও পরোয়া করে না জামায়াতে ইসলামী। অতীতে নবী-রাসূলগণও এ পরোয়া করেননি। বরং তাদের অবস্থা এমন ছিল যেন মৌচাকে ঢিল মেরে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকা, যেন সমস্ত মৌমাছিকে আক্রমণ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো। এ কাজ সবার পক্ষে করা সম্ভব নয়। যারা এ উদ্দেশ্যকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে তারাই এ কাজের উপযুক্ত। এ আন্দোলনের কর্মী বা নেতা হলেই চলবে না বরং এর আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

তাদেরকে হতে হবে কুরআন সুন্নাহর অন্তর্নিহিত ভাবধারা এবং এর খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। এ ব্যাপারে কোন বিশিষ্ট নাগরিক, প্রবীণ আলেম বা পন্ডিত ব্যক্তির প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং আইন রচনার অধিকারও একমাত্র আল্লাহর। যারা এ আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজ করে তারা আল্লাহর প্রতিনিধি বা 'খলিফা'।

"তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও সেই অনুযায়ী সৎ কর্মশীল লোকদের নিকট আল্লাহ এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে দুনিয়াতে খলিফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন। তাদের পূর্ববর্তী লোকদের যেরূপ এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।"

(সূরা আল নূর: ৫৫)

এ জন্য প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল। এ প্রতিনিধিত্ব কোন বিশেষ ব্যক্তি, বংশ বা গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট বা সুরক্ষিত নয়। নবী করিম (সা) বলেছেন:

"তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহর নিকট নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"

ইসলামী সমাজে শ্রেণীবিভেদ, জন্মগত বা সামাজিক বৈষম্য ও পার্থক্যের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। সব মানুষই সমান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। অবশ্য ব্যক্তিগত যোগ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে কারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হতে পারে। রাসূল (সা) এর হাদীস:

"কারো উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই। তা প্রতিপন্ন হতে পারে একমাত্র দ্বীন ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান, কর্ম ও তাকওয়ার কমবেশির কারণেই। সব মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটি হতে সৃষ্ট। আরববাসীর অনারবদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনারবদেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আরববাসীর ওপর। তেমনি শ্বেতাঙ্গদের কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর এবং কৃষ্ণাঙ্গদের শ্বেতাঙ্গদের ওপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই। কারও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার হতে পারে একমাত্র তাকওয়ার কারণে।"

মক্কা বিজয়ের ফলে সমস্ত আরব দেশ ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলে মহানবী (সা) কুরাইরশদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন:

"হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তোমাদের অন্ধকার যুগের গৌরব অহঙ্কার এবং বংশীয় আভিজাত্য দূর করে দিয়েছেন। হে মানুষ তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। আর আদম তৈরি মাটি থেকে। বংশীয় গৌরবের কোনো সুযোগ নেই। আরবদের ওপর অনারবদের এবং অনারবদের ওপর আরবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী ব্যক্তিই বেশি সম্মানিত।"

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচিত হবে– *"তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত।"* (সূরা হুজুরাত: ১৩) – এই মূলনীতি অনুযায়ী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়ে থাকে। (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র, অষ্টম অধ্যায়: ধারা ৬৫)

আমীর সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। সকল মুসলমানই তার সমালোচনা করতে পারবে। এমনকি তার ব্যক্তি জীবন সম্পর্কেও সমালোচনা করার অধিকার সবার আছে। প্রয়োজনে আমীরকে পদচ্যুতও করা যাবে। (গঠনতন্ত্র: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ধারা-১৭)

আমীর পরামর্শ করে কাজ করবেন। সে জন্য একটি মজলিশে শূরা বা পার্লামেন্ট গঠন করবে। মজলিসে শূরার প্রতি জনগণের অবিচল আস্থা থাকতে হবে। (গঠনতন্ত্র: ধারা-১৮)

শূরার ফয়সালা সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতেই হবে। কিন্তু ইসলাম সংখ্যাধিক্যকে সত্যের মাপকাঠি বলে স্বীকার করে না।

"পংকিল-কদর্য ও পবিত্র– এ দুটো জিনিস কখনো সমান হতে পারে না। পংকিলের সংখ্যাধিক্য তোমাকে স্তম্ভিত করে দিলেও নয়।"

(আল মায়েদা: ১০০)

এক ব্যক্তির কোনো রায় গোটা মজলিসে শূরার বিপরীত হলেও তা সত্য ও সঠিক হতে পারে। ইসলামে তার পূর্ণ অবকাশ আছে। কাজেই কুরআন সুন্নাহ মাফিক আমীর ফয়সালা করবেন। এ ব্যাপারে আমীরের তাকওয়া, আল্লাহ ভীতি, আমানতদারী, দূরদৃষ্টি ইত্যাদির দিকে জনগণ খেয়াল রাখবেন। যদি এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে আমীরের পদচ্যুতির ব্যাপারে কোন বাধা থাকবে না।

মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ চিত্র, এর কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবনী এবং খোলাফায়ে রাশেদার ইতিহাস থেকে পাই। আমাদেরকে সত্যিকার কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হলে; দেশ, জাতি ও জনগণের প্রকৃত কল্যাণ মঙ্গল চাইলে– এগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। কোনো ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে এ বিরাট কাজ সম্ভব নয়। সর্বোপরি ব্যক্তিজীবনে আদর্শের Perfect অনুসারী হতে হবে। মনে রাখতে হবে কুরআনের এ শাশ্বত বাণী:

"আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না। অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের

মিথ্যাচারের দরুন। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করো না। তখন তারা বলে, আমরাই তো শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। মনে রেখো তারাই শান্তি ভঙ্গকারী। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। আর যখন তাদের বলা হয়, অন্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো। তখন তারা বলে, আমরাও কি বোকাদের মতো ঈমান আনবো? মনে রেখো প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।"

(সূরা বাকারা)

"আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে।"

(সূরা বাকারা)

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি। অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।"

(সূরা নিসা)

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তবে এবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহকালে ও পরকালে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

(সূরা হজ্ব: ১১)

Do Islamists need a way out?

Shah Abdul Halim

[Part-I]

In July 2008 I attended an international workshop on 'Politics and Islam' in Islamabad that was organized by Henry L. Stimson Center, a Washington based U.S. Think Tank. Diaa Rashwan, Director of Al Ahram Center for Political Strategic Studies Egypt attended the event. We had a good discussion on the political situation in Egypt and the activities of the Muslim Brotherhood in the sideline of the workshop. Diaa then informed me that Brotherhood is planning to float a new political party. The debate was then going on "whether this prospective party will be a means for the Muslim Brotherhood to carry out its public and political work, or if it will replace the Brotherhood entirely."[1] Now in the backdrop of the downfall of President Hosni Mubarak, Brotherhood has floated a new political

---

[*] Author is a researcher and Chairman of *Bangladesh Centre for Islam and Pluralism.* This article was published in *The New Nation.* First part of the article was published on 13th July 2011, https://web.archive.org/web/20110713014435/http://thenewnationbd.com/newsdetails.aspx?newsid=1093 and second part was published on 22nd July 2011, www.thenewnationbd.com/newsdetails.aspx?newsid=11748. The full article can be found here: http://www.shahfoundationbd.org/halim/Book_The_Way_Out.pdf

party – Freedom and Justice Party. The Muslim Brotherhood would however continue to operate as the parent organization.

What is the lesson Islamists in Bangladesh can draw from the Egyptian experience is a very pertinent question now hitting the mind of the political observers here. In Bangladesh the mainstream Islamist, the Bangladesh Jamaat-e-Islami, analysts say, has lost much of its creditability for opposing the liberation war of the country in 1971. Whether this analysis is right or wrong, the fact remains that the secular forces here have been quite successful to discredit Bangladesh Jamaat-e-Islami in the public eyes and have also been successful to poison the minds of the new generation of people against it. That being the scenario, many analysts consider Jamaat-e-Islami as a "spent force".[2] It has hardly any future.

In this backdrop, a workshop was held in Dhaka in July 2009. It was participated by all former Presidents of Islami Chhattra Shibir, the student wing of Bangladesh Jamaat-e-Islami, three Assistant Secretary Generals of Bangladesh Jamaat-e-Islami, quite a few well-known lawyers, several retired government officials, eminent educationists and some other Islamist intellectuals.[3]

The main theme of the paper presented in Power Point was to float a new political party in the model of Turkish Justice and Development Party, otherwise known as A. K. Party with the avowed objectives of promoting public welfare, good governance, safeguarding the independence, sovereignty and territorial integrity of the country, besides protecting the nation's economic interest, particularly safeguarding gas and other mineral resources. Some people as back as April 1998 also had written to the top leadership of Jamaat to float a new party with liberal and democratic aims and objectives committed to establishing social justice, peace, stability and bringing prosperity to the nation.

The workshop paper of July 2009 also recommended that the proposed party must distance itself from the demand of a theological state and strict compliance of shariah in public life. The recommendation of not bringing shariah into politics came in the

light of the recently carried out ijtihad or search on the application of shariah which says: "Negus, the Emperor of Abyssinia, who embraced Islam but did not rule as per shariah as that would have threatened his Kingdom. ... From this it becomes clear that Muslims can rule without implementing shariah if the circumstances are not in their favor or the people are not ready for such reform or the situation is not healthy enough or conducive for such a transformation or change."[4]

An-Nahda Party ideologue Sheikh Rachid Ghannouchi, in the backdrop of the recent change in Tunisia, has returned to the country from long exile in the United Kingdom and has declared that An-Nahda will not bring shariah into politics.

Meanwhile Muhammad Kamaruzzaman, Senior Assistant Secretary General of Bangladesh Jamaat-e-Islami who is now in prison facing the charge of war crimes for alleged involvement in human rights violation during the liberation war has circulated a political discourse dated 26 November 2010 to a select group of top Jamaat leaders as to what strategy need to be adopted in the country's changed political environment. Its copy has been leaked to the press. Reformists within Jamaat have however widely circulated photocopies of this political advice among the Jamaat activists, followers and sympathizers and it is now in everybody's possession. Kamaruzzaman in his political discourse has also advised Jamaat to form a new political platform with new policy and strategy outlines.[5]

In his paper Kamaruzzaman has given the outline of the proposed party. He suggested that Jamaat leaders against whom charges of war crimes hang should not be in any way linked with the new party. But many others believe this is perhaps not enough. Since the agenda of the Islamists should be the progress and advancement of Islam in society, the new party should be manned and headed by people from post-liberation generation, those who are born after 1971, against whom there cannot be any charge of war crimes or stigma of collaboration with the Pakistan army. The proposed party should even scrupulously avoid associating the family members or

close relatives of pre-liberation Jamaat leaders in the new party. There should not be any illusion about this. No mental obsession should also be there though it may be painful. It might appear to some as regression or a step back from Islamic call and guidance but it will ultimately pave the way for a stride and forward march creating a new environment where Islamic politics may make new leap forward.

The proposed party should be totally democratic in architecture. Centralize authority must be discarded in the new party. The weakness of the Islamist movement is that although it believes in human equality in principle but it has failed to translate such equality in real life practice in the state and the society as a whole. Malaysian scholar Dr. Chandra Muzaffar rightly pointed out:

"If one looks at the contemporary situation, one could argue that contemporary Islamic movements have by and large, with a few exceptions such as the An-Nahda Party of Sheikh Rachid Ghannouchi, inherited this notion of equality and political, economic, social, and gender relations from the history ... It is a notion of equality which has been embodied in the *fiqh* tradition, the Islamic tradition of jurisprudence, which must be distinguished for the purpose of analysis from the divinely rooted shariah. It is this *fiqh* tradition, which has formed the basis of Islamic movement's approach to this fundamental question of equality in society. What Islamic movements have done the most notable amongst them being the Muslim Brotherhood and the Jamaat-e-Islami, is to say that they have accepted equality as an important principle at the general level. However, when it comes to translating that principle into specifics you will find that there are many inequalities and that they accept the inequality as divinely sanctioned. ... For example, in the realm of politics the *fiqh* oriented approach of contemporary Islamic movements is to say that you need a powerful ruler, a ruler who would centralize authority and thus be able to establish the norms and principles of an Islamic polity. That this in itself an act of inequality is something that does not occur to them. You will find that within these Islamic movements there is very little support for the idea of people's participation and empowering the individuals.

Rather there exists this notion of a strong leader at the apex of society."[6]

The leadership structure of the proposed party should be built like a pyramid – bottom-up approach from grassroots to the center, instead of top-bottom approach, where the leader at the apex nominates rest of the leadership having the veto power to overrule the decision of consultative committee and executive committee. In keeping with the true spirit and tradition of democracy, the new party would allow its members the unbridled freedom and opportunity to elect leadership and in no way restrict the exercise of the freedom to choose leadership by limiting their option by way of creating a panel of leadership, which only reflects the senior leader's lack of trust, faith and confidence on the ability of general members in exercising voting rights judiciously, from which top leaders are to be elected by the members.

The proposed party should adopt the system of electing leadership at every tier and the current belief and mindset of the Islamists that placing oneself to contest for leadership is contrary to the teachings of Islam must be given-up. History bears testimony that Prophet Yusuf (peace and blessings be upon him) asked Pharaoh to give him the ministerial responsibility of the government to administer the food management to ameliorate the suffering of the people. It means that if the Islamist leadership has any expertise, they are duty bound even today to offer their services for the common good, public wellbeing and social welfare and refusing to offer or give such service shall be tantamount to *zulm* or oppression. Prophet Yusuf therefore did not hesitate to ask for ministerial responsibility to administer the food management and participate in the administration of Pharaoh to save people from starvation. The same principle should hold good and valid even now. What has happened to Prophet Yusuf can repeat to Muslims today. Muslims are permitted to ask for leadership position and join government to fulfil the greater interest of the Muslim community, the ummah and prevent evils and wrongdoings. Failure to do so will lead to undermining the overall interest of the Muslim community, the ummah and allowing the evils to spread and

dominate the society. Muslims offer *dua* or prayers to God to give them leadership over the believers, *muttaqina imama*. So, asking position for leadership cannot be termed as un-Islamic.[7]

The new party leadership must abide by the decisions of the shura or consultative committee. The decisions of the consultative committee must be binding on the leader(s) at apex. King Abdul Aziz became a caliph, the fifth rightly guided caliph of Islam, by accepting the binding provision of the shura. After the state of Medina was established and the Prophet (peace and blessings be upon him), now head of the state, was then ordained by God:

"Consult them (the Companions) in the (community) affair(s), and when you have reached a decision, then place your trust in God (and implement it)." [Al Quran 3:159]

"Al-Tabari characterizes consultation as one of the fundamental principles of the shariah (*azaim al-ahkam*), which are essential to the substance and identity of Islamic government. Ibn Taymiyyah held a similar view, observing that God, Most High, commanded the Prophet (peace and blessings be upon him) to consult the community, despite the fact that he was the recipient of divine revelation. The Quranic command is therefore all the more emphatic with regard to the subsequent generations of Muslims who no longer have the Prophet among them, and no longer have access to direct revelation. Muhammad Abduh has also held that in this verse, consultation is not just a recommendation, but an obligatory command addressed primarily to the head of the state to ensure that it is properly implemented in the government affairs."[8]

It is thus evident that shura or consultation is obligatory for the leadership of the political party as they are directly involved with the process of governance of the state. The strength of the shura lies in the fact that consultation brings people closer together, and it provides them with an opportunity to share ideas and voice their views on matters of common concerns. In this way, shura prevents disunity and division among the people. But consultation can only be meaningful and effective when the participants enjoy total

freedom to express their views. It would be totally in vain, and would make no sense to say that in Islam the government and for that matter political party is bound by the principle of consultation, and yet should have the liberty to deny the members of the shura the freedom to express an opinion.

It may not be out of context to mention here that Dr. Rezaul Karim, President of Islami Chhattra Shibir, working for the coterie of a section of former Islami Chhattra Sihbir Presidents who consider them more wise and judicious over the collective consultation, refused to accept the decision of the shura in 2009 to nominate Shishir Muhammad Munir as the Secretary General of the student organization. It sparked crisis and caused resignation of 20 out of 34 executive committee members.

Islami Chhattra Shibir must exercise unbridle freedom and independence as an organization and in no way be subservient to advice from any other person or organization. It must not involve people outside its own organization to mediate or resolve its problems rather must strictly follow its own constitutional provisions in resolving disputes, if ever it arises. Past experience has shown that mediators become partisan. Islami Chhattra Shibir in no way and must not become an organization of sycophant or what Muhammad Kamaruzzaman said: Islami Chhattra Shibir must come out of the fold of 'lejurbritti' or sycophancy of any political organization.

In the new party women members should be an integral part of the shura. This will help male members of the shura to have perceptions and views of women on important gender issues along with other national and international subjects to reach a fair, judicious and balanced decision. If women shura or consultative committee is separate, the fact remains that their voice is not heard at the particular moment of taking vital decisions. In the past it has been seen that women parliamentarians and male parliamentarians of the Islamist party are sitting in the same room although the male and female shura members are sitting in separate rooms. These practices are self-contradictory having no logic. Sometimes women are

suppressed and their voice is not heard. This is neither Islamic nor democratic.

Elections to form committees and choose leadership of the proposed party at all levels must be on the basis of open discussion, secret ballots and open counting. Counting party election results openly and then declaring the scoring will not create division within the party as some argue; rather this will restore confidence in the rank and file of the new party. This would also meet the requirement of the national Election Commission. It would also break the hands of vicious circles who often manipulate the election results of the party as they do not consider shura binding. It is alleged that such manipulation did occur at different tiers of the student organization. It is also alleged that during party elections, election commissioner had even rigged and manipulated the results of apex body in the recent past.

The workshop held in July 2009 suggested that the proposed party should not be cadre based. The past experience has shown that cadre system develops privileged-class and a bar on the entry of newcomers to turn it into a mass organization. The leadership should be developed step by step from the grassroots. The cadre system would have no place at any level in the democratic setup of the new party. The present reporting system on personal conduct which a member has to maintain, according to some insiders, has also proved mischievous and it must be discontinued in the proposed political party.

The system of whole-timer should also be discarded in the proposed party. Experience has shown that whole-timers, being totally dependent on the salary of the party, lose freedom and confidence to think independently being afraid of losing favor from the hierarchy where innovation and creativity constitute the lifeline of any organization committed to work for reform and renaissance. Whole-timers are found more interested in protecting their self-interest rather than working to push the right cause and chart out a pragmatic way as it may antagonize the party establishment.

The new party should be prepared to accept women in the leadership including the leadership positions at the apex. The Islamists are not yet ready to accept and embrace women in the leadership, which is another example of inequality between men and women. Those who object to assigning political positions to women forget that in today's world rulers are only parts of a wider political establishment making the government. Indeed, government itself is one of a group of as many institutions that shares out among them the power and authority of the state, which were the domain and used to be exercised by a single ruler in the past, regardless of the title he assumed. During the earlier days of Islam the *kholafa-e-rashadeen used to combine in them a whole range of comprehensive and broad authority, over the whole Muslim world* which no ruler is expected to exercise now or in foreseeable future, including leading prayers, commanding armies, exercising absolute *ijtihad* in *fiqh* besides exercising powers as the supreme judge. These are being performed now by many people at different levels. There is a strict bifurcation and separation of powers. From the point of view of her competence, a woman may be now assigned some of these powers, including the post of the head of the state, because none of these powers, including that of head of the state, constitutes the *overall authority* over the community.[9]

The proposed party should have at least one-woman Vice President and one-woman Assistant Secretary General. The post of the President and the Secretary General should also remain open to contest by women. The Islamist in Bangladesh must take lessons from others. In Iran, which is no doubt an Islamic state, woman has been elected to the post of Vice President.

The new party as a matter of policy should adopt easy options when Islam offers different alternatives in resolving problems. It would always remain open to examine variable choices while deciding policy matters. Some Islamists overemphasize the importance of covering face by woman. A number of Islamist organizations have failed to make difference between local culture and Islamic culture, which is one of the reasons for the backwardness of the Muslims. Covering face of woman is a local culture and has nothing to do with

Islam. Those who insist on using total veil by the women are really working to create bottleneck in the progress of Islamic society rather than promoting its advancement.[10]

***

Veil Issue

Eminent Egyptian Islamic scholar Sheikh Adil Salahi commenting on the verses 24:30-31 [*Say to the believing men that they should lower their gaze ... And say to the believing women that they should lower their gaze ...* Al-Quran 24:30-31] wherein both men and women have been asked to lower their look when fall on the opposite sex, in his regular weekly column 'Our Dialogue' in Saudi daily Arab News observed:

"The instruction of the verses quoted above is that both men and women are required to keep their eyes cast down, so that when they meet each other, neither should men stare at women nor women at men. The natural question that arises is why man should lower his gaze if the face of woman is totally covered? From the text of the verses it is clearly evident that the face of the woman is not to be covered and therefore man has been advised to lower his look."

Muslim Brotherhood leader Abdul Halim Abu Shuqqah commenting on the aforementioned verses said that the intent of the Law Giver is that women need not cover face. He said that if the intention of the Law Giver was to cover the face of women than He would not have asked men to lower the gaze.[11]

The Islamists in Bangladesh should take note of the general practice of hijab by women in Indonesia, Malaysia, Iraq, Palestine, Lebanon, Egypt and Morocco where they keep their face open and they do not cover face with niqab. Women in the Saudi Television also appear without niqab or without covering the face. Even the women leaders of Muslim Brotherhood throughout Middle East, including eminent Brotherhood leader of Egypt Zainab al Ghazali known for her monumental work *'Return of the Pharoah: Memoirs in Naser's*

Prison', do not cover their face. It is obligatory that women must not cover their face during hajj.

Proposed Leadership Structure, new parameters and Delegation

Kamaruzzaman's initiative also called for limiting the tenure of the office of the central president and district presidents of the new party. He proposed to limit the tenure of the central president and the district presidents to three terms. But it would be appropriate to limit the tenure to two consecutive terms of three years each. To bring dynamism in the party, a system may be developed by which leadership is rotated through secret credible elections. Unlike the prevailing practice of the Islamists, at least fifteen posts of vice president and twenty-five posts of assistant secretary general may be created in the proposed party. This would create opportunity to produce more leaders, built up their capacity; evaluate who is more capable and dynamic in sharing responsibility.

The central leadership structure of the proposed party however may be organized based on how many people it wants to put in the various watchdog committees and in the Shadow Cabinet. This issue will be discussed at the later part of this article. Those found effective at the grassroots, particularly whose performance at the local government elections would be highly impressive and people would accept them as public leaders, should be gradually elevated to the central leadership.

However highly skilled professionals, eminent educationists, senior retired civil and military bureaucrats, celebrated journalists, renowned lawyers, prominent political leaders of other parties and such other notable members of the civil society with secular background, if they accept the aims and objectives and join the new party, should be elevated to the higher echelon of the leadership in keeping with the practice of the noble Prophet who had placed leaders of the days of *jahiliyyah* or ignorance, when they sincerely accepted Islam and joined the Muslim rank, in the leadership ranks.

In other words persons with rich and highly potential background will be absorbed in the new party implementing the spirit of the saying of the Prophet Muhammad: *khiarukum fil jahiliyyah khiarukum fil Islam* which means – those who proved competent in leadership during the days of *jahiliyyah* or ignorance they proved equally competent in leadership when they had joined the rank of Islam.

The proposed party will use standard parameters to evaluate the performances of the leadership and their ability to turn the party into a mass organization and effectively run a modern democratic state. Such parameters shall also be used to ascertain the intellectual capacity of the leadership in the context of the changed global environment. While developing such parameters, due consideration shall be given to such factors as professional skill, educational background, intellectual capacity, moral and ethical moorings and more importantly behavioral pattern etc.

The new party will also use parameters to make sure that leadership upholds high standard of financial integrity and maintains transparency in all fairness in fund management and monetary transactions. The leadership should also be required to make it certain that their living expenses and increase in wealth and all types of resources should commensurate with the known sources of earnings.

Past experience shows that concentration of power and responsibility without accountability in few hands make such persons over influential and sometimes quite despotic as the saying goes power makes a man corrupt and absolute power makes a man absolutely corrupt. Power intoxicates best hearts as the wine intoxicates the strongest heads. No man is wise enough or good enough to be trusted with unlimited power. Such concentration of power and responsibility is a bar on the development of collective leadership of participatory nature. By delegating power only in few hands, the leadership at the apex in fact creates a situation in which the prospect of producing a galaxy of leaders, who can handle critical situation, might diminish.

The leadership qualities never can be developed unless workload and responsibility are delegated. It is evident from the actual situation within the country's Islamist organization that the so-called trustworthy leaders at the zenith of the party, who consider themselves the only capable persons and indispensable have in fact developed a sort of bureaucratic mindset. They believe that without them the organization will not be able to sustain and they, in fact, have monopolized power by turning them into a vested group to protect their interests. Some people believe that these few leaders at the top have aggrandized power and position overlooking the greater community interest.

The proposed party should not allow a person to hold more than one position at a time as was advised by some people in some occasions in July 1996 and April 1998 and now by Muhammad Kamaruzzaman. It needs to be realized that human capacity is limited and at one point it gets saturated. Moreover, those who are overburdened with too many jobs may not concentrate on any work or go into details of any issue. Thus, the work suffers.

Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) during his life time sent Muadh b. Jabal (may God be pleased with him) as Governor to Yemen. *On being asked by the Prophet as to how he will govern, Muadh b. Jabal replied that he will govern according to the Quran and will refer to sunnah if clear instruction is not available in the Quran and then will exercise his individual judgment if an explicit injunction is neither available in the Quran nor in the sunnah.* History bears the testimony that Prophet Muhammad endorsed the governing principle and procedure of Muadh b. Jabal. Prophet even authorized Amr b. al-As (may God be pleased with him) to adjudicate in some disputes in his presence.[12]

From this, analysts conclude that *ijtihad* or intellectual exercise is allowed in Islam and *ijhitad* is the Sunnah of the Prophet. But what escaped the attention of many scholars and leaders of Islamic call and guidance is that Prophet Muhammad during his life time had delegated powers to Muadh b. Jabal and Amr b. al-As.[13]

This delegation is the pivotal precept of Islam and democracy. Unless you delegate, you really suffocate. Nothing can flourish in a suffocating and regimented environment. The new party must practice the system of delegating power and responsibility and the leadership at the apex will only give guidance and monitor developments. Everything, except confidential matters, should be delegated. Delegation is the opposite of imposing decision. It means power through people and not over the people. Delegation is the negation of manipulation. It is motivation through participation. Authority must be delegated at all tires of the proposed party so that decisions may be taken by way of participation at every level.

Idea of Shadow Cabinet and Real Democratic Values

Muhammad Kamaruzzaman has also advised to form Shadow Cabinet. In fact, Shadow Cabinet to monitor governance and Think Tank to formulate policies must be inseparable part of the proposed party. The new party, at the time of launching, should announce a Shadow Cabinet of 100 ministers. Each minister will be assisted by a Think Tank that would include three professionals in addition to ten researchers in respective fields. Each Think Tank professional members will also be members of the central consultative committee, and one, from amongst them, by rotation will represent the group to the central executive committee.

Professional members should have the rights and privilege that if anyone of them requests the leadership at the apex to call a meeting of the central consultative committee and central executive committee; they shall be bound to call such a meeting. However, such professional members may or may not have voting rights. Along with the 100 Think Tanks, an Advisory Council or Guardian Council or Council of Elders may be set up. Yet another Council of Eminent Ulama or religious scholars, as advised by Muhammad Kamaruzzaman, may also be constituted.[14]

In keeping with the democratic tradition, the proposed party should always arrive at a decision by a vote of majority and those who disagree with the decision of the majority will have the right to

record the note of dissent. Recording the note of dissent must be practiced in the new party as a binding principle. That is the only way to break the hands of the conspirators, coteries and reactionary forces that sometimes try to impose undesirable decision in the name of collective decision.

Now that in the new party everyone can record their views because of the binding principle of recording the note of dissent, the conspirators and coteries will be fearful of being exposed and they will be much careful not to impose any undesirable opinion. There is no point of giving unnecessary concession in the name of consensus decision.

Moreover, the new party will have to adopt such a constitution that will allow its leaders to hold and express divergent views publicly as is practiced by the political parties in the United States. Expressing constructive and positive views contrary to the declared and established party policies openly, even in front of media, will not be in anyway considered a revolt against the party, its leadership or its policies. Those leaders who will be able to win the confidence of the majority party members will be at the helm of affairs. There is no point of demanding the repeal of article 70 of Bangladesh Constitution to enable a member of the parliament to cross floor and express opinion against the very party to which s/he belongs when such freedom is not allowed within the political parties.

Non-Muslim and Muslim Brotherhood Constitution

The proposed party not only should make room for non-Muslims becoming its members but at the same time reiterate in clear terms that it is committed to make such constitutional arrangements that will remove obstacles of non-Muslim becoming the head of the state. This will be in keeping with the political system envisaged by the Islamist political scientists of modern time. The plural and democratic nature of Islamist political order also becomes clear if someone looks at the constitutional proposals of the Muslim Brotherhood, the premier Islamist movement of the world. In 1952

Brotherhood drafted an Islamic Constitution for Egypt consisting of 103 articles.

The draft constitution puts forth the notion of a civil state based on citizenship and loyalty to the state. Muslim Brotherhood puts forward the idea of one state embracing Muslims and non-Muslims under the umbrella of loyalty to the nation (article– 88). The draft constitution reiterates that *people* are born free, equal in dignity, rights and liberties without any discrimination based on origin, language, religion or color (article– 77). The word used in this article is *people*, an inclusive neutral word in the Islamic heritage, which negates any kind of discrimination based on sex or religion. Each *individual* has the right to live freely, enjoying equality, security and safety (article– 78). The draft did not determine religion when recording rights. It used the word individual.

The Islamic Constitution drafted by the Brotherhood disregarded one's religion being the prerequisite of becoming the head of the state. Article– 4 stipulates that only an Egyptian can be a member of the parliament and parliamentary membership is not restricted to any particular religion or cult and article– 25 states that head of the state can be any person who meets all the conditions required for the Member of Parliament and all these disregard origin, language and religion which is compatible with the aforementioned article– 77 of the constitution.[15]

Pluralism and Sharia concern on HUDUD

The proposed party must affirm in the most unambiguous language that it believes in absolute religious freedom. The Quran states: *There is no compulsion in religion* [Al Quran 2: 256]. As regards apostasy, which has created a great deal of controversy and misunderstanding among the freedom loving people, the new party must make clear its position in the light of the injunction of the Quran: *Those who believe, then disbelieve, then believe again, then disbelieve and then increase in their disbelief – God will never forgive them nor guide them to the path* [Al Quran 4: 137].

Commenting on the verse Mohammad Hashim Kamali pointed out:

"The implication is unmistakable. The text would hardly entertain the prospect of repeated belief and disbelief if death were to be the prescribed punishment for the initial act."[16]

In fact, there is not a single instance that Prophet Muhammad did treat apostasy as a prescribed offense under *hudd* (plural *hudud*) or capital punishment only for leaving Islam. Prophet never put anyone to death for apostasy alone rather he let such person go unpunished. No one was sentenced to death solely for renunciation of faith unless accompanied by hostility and treason or was linked to an act of political betrayal of the community.

As a matter of fact, the Quran is completely silent on the question of death as a punishment for apostasy. Apostasy does not qualify for temporal punishment. The most pertinent question is: If God has granted us the merit of freedom, he who wants to believe is allowed that right and so too the one who wants to disbelieve. How can it be imagined by a rational person that God, Who has compelled none to believe, allows us the right to compel others and force them to believe.[17]

The new party should make a call for suspension of *hudd* or capital punishment in such areas as adultery as long as the door of obscenity – similar to brothels, bars, offensive movies, obscene printed books and pornography – remains open; and the government cannot ensure marriage at appropriate age. Eminent Islamic scholar and Dean of the Faculty of Shariah, Qatar University Prof. Dr. Yusuf Al Qaradawi opined that before implementing *hudd* or capital punishment as punishment of adultery, we have to establish an ideal Islamic society and close the door of obscenity.[18]

Only recently Prof. Dr. Tariq Ramadhan, a distinguished educator of Philosophy at the University of Fribourg, Switzerland and an eminent Arab Islamic scholar, has given a clarion call for the suspension of *hudd* or capital punishment for the time being, till all relevant issues have been examined by the scholars. Such suspension will be in line with the suspension of the amputation of hands of the thief by Caliph

Omar (may God be pleased with him) in a famine condition when people are without food and they resort to stealing.[9]

Cultural Activism

The Islamists in Bangladesh failed to make any substantial headway in the political front during the last 64 years [1947-2011] as they largely ignored the cultural arena that deserve utmost attention. It is essential to put utmost emphasis to cultural activism to make breakthrough in the political front. In fact, cultural activism deserves more emphasis than political work as the past experience has proved beyond doubt that concentrating more on political work ignoring or giving less emphasis on cultural work has failed to generate the desired political dividend.

The Islamists failed to cultivate those aspects of the local and folk culture, even finer thread of classical music and mystic songs, which does not stand in clash with our beliefs, values, ethics and norms. They have also ignored local heroes, charming natural beauty of Bangladesh; and local cultural symbols are also missing in their cultural projections. Cultural movement is the lifeline of any movement committed to bring in social reforms and renaissance. Therefore, a very comprehensive cultural policy needs to be formulated and action program drawn.

Further it needs to be realized that religion is ever present in our real life and existence, culture and thought. People here are basically liberal, broadminded and moderate and opposed to constriction, bigotry, and fanaticism. People are religious but at the same time against all types of overindulgence and severity. We have to construct our political philosophy by assimilating all these elements of our mores, history and culture, customs and traditions.

The proposed party shall not work to establish a theological state but still then maintain deep links with norms and ethics of Islam and core components of Muslim identity. It is largely believed that only an identity consciousness, educated and intellectually empowered community can bring change in the society.

New Literature to face Contemporary Challenges

People associated with the proposed party will be encouraged to read contemporary Islamic literature of the eminent scholars, not plagiarized books or fifty years old books which has no relevance to modern day society and its problems, particularly when modern day scholars have reached newer conclusions through ijtihad i.e. intellectual exercise on old and newly emerging issues. There is no reason and justification to repeat old arguments. Reading only one set of literature will result in a narrow tunnel-vision and will take the new generation nowhere.

Bangladesh is passing through the most critical period in its history. The proposed party therefore must formulate its policy keeping in view the geopolitical and strategic compulsions and erect invincible wall to protect the national interest standing on the hard rock and not on the quicksand.

The proposed party must be pragmatic, open to all yet conscious of its goal. It is suggested that a rational, moderate and people oriented socio-cultural and political program be formulated which is suitable to the genius of the people of Bangladesh.

The proposed party however will make public commitment that it will uphold the principle of peaceful coexistence and friendship with all countries. It will work to achieve this goal when it will go to power alone or in a coalition. It will pursue the same policy guidelines in the United Nations and in all bilateral, multilateral and regional forums. The new party will make further pledge that whether in government or in opposition it will make strenuous efforts to improve ties with neighboring countries and fix up all outstanding issues peacefully and bilaterally. However, it will make public commitment at the same time that it will raise such issues in multilateral forums including United Nations if attempts to solve such problems like water sharing, maritime boundary etc. bilaterally fails. Special steps will simultaneously be taken to consolidate and further strengthen the existing brotherly relations with all Muslim countries.

The new party will make commitment that in economy and business it will pursue open market policy. It will follow the outline of a mixed economy to provide utilities to public at affordable cost. The party will further reiterate that it will make credible efforts to make Bangladesh a self-reliant country by expanding its production base for domestic consumers as well as for export market. The party will also pledge that it will protect the national economy particularly the local industries by using appropriate tariff and non-tariff measures. The party will also make public commitment that it will work to protect country's mineral resources like coal, gas, oil and such other valuable resources from the paws of multinational corporations and foreign powers. It will discourage loans from IMF by reducing unnecessary budgetary spending. It will also follow similar policy to cut superfluous foreign aid for use in projects which are not beneficial to the nation on the one hand and will work to make up the shortfall by greater mobilization of internal revenues and enhancing flow of remittance of the Bangladeshi expatriates on the other.

Last but not the least, the proposed political party, true to the democratic culture and tradition, will maintain harmonious relations with every other political organization. But it will not, in any away, subordinate itself to any other political organization or leader however sagacious seemingly they might appear to be. The new party will not maintain extra territorial or secret link with any other political organization or leader who may tend to control it or influence its functioning. It will strictly follow its own constitution and single-handedly try to accomplish its own policies and objectives. The new party will never take position on political issues in opposition to the dreams, wishes and aspirations of the overwhelming majority people. But the million-dollar question is: who and where are those young political leaders born after 1971 who will make a call for the formation of such a party to bring an end to the current impasse of the Islamists in Bangladesh and usher in an era of a bright prosperous future.

Notes:

1. Diaa Rashwan, "Political Islamists Movements: The Case of the Muslim Brotherhood in Egypt" in *Islam and Politics: Renewal and Resistance in the Muslim World,* Stimson Regional Voices, Henry L. Stimson Center Washington, 2009, pp 3-16.

2. Abid Ullah Jan, "Moderate Islam: A Product of American Extremism", *American Journal of Islamic Social Sciences,* jointly published by Association of Muslim Social Scientists and International Institute of Islamic Thought, Herndon, VA, USA, Vol. 22, No. 3, Summer 2005, p 35.

3. *Weekly Budhbar,* 7 October 2009.

4. Sheikh Rachid Ghannouchi, "The Participation of Islamists in Non-Islamic Government" in Azzam Tamimi ed. *Power-Sharing Islam, Liberty for Muslims,* World Publications, London, UK, 1993, pp 57-58. Also see Prof. Dr. Yusuf al Qaradawi, *Islamic Awakening between Rejection and Extremism,* IIIT, Virginia, USA, 1991, pp 137-138. Further see Shah Abdul Halim, *Concept of Sovereignty and Other Issues,* www.shahfoundationbd.org.

5. *Daily Kalerkantho,* 28 February 2011.

6. Shah Abdul Halim, *Islamic Movement: An Overview,* www.shahfundationbd.org.

7. Shah Abdul Halim, *Power Sharing in Islam,* www.shahfoundationbd.org.

8. Mohammad Hashim Kamali, *Freedom of Expression in Islam,* Part Two, Chapter IV Consultation (Shura), Ilmiah Publishers Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1998, pp 40-44.

9. For a detailed discussion as to whether women leadership is allowed in Islam or not see Shah Abdul Halim, *Can Woman Become Head of the State or Government,* www.shahfoundationbd.org

10. This position of not covering face by women is also shared by Dr. Ahmad Totonji. See Shah Abdul Halim, *Totonji on the Backwardness of the Muslim Ummah.* www.shahfoundationbd.org.

11. Abdul Halim Abu Shuqqah, *Rasuler Juge Nari Shadhinata* (Bengali tr. of *Tahrirul Mar'ah Fi Asrir Risalah*), Vol. IV, Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), Dhaka, 2006, pp 79-80.

12. Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence,* Islamic Texts Society, Cambridge, 1991, p 383.

13. This view is also shared by Dr. Anas S. Al Shaikh Ali, Academic Advisor, IIIT, London, UK.

14. The idea of formation of Shadow Cabinet of hundred ministers each of whom will head a Think Tank is also shared by Dr. Ahmad Totonji. See Shah Abdul Halim, *Totonji on the Backwardness of the Muslim Ummah.* www.shahfoundationbd.org.

15. The Legal Concept of an Islamic State According to the MB, Ikhwanweb – Cairo, Egypt, Monday, May 08, 2006. Also see Shah Abdul Halim, *The Concept of Ummah and Pluralist Bangladesh.* www.shahfoundationbd.org.

16. Mohammad Hashim Kamali, *Freedom of Expression in Islam,* Chapter IX. - Freedom of Religion (Al-Hurriyyah al-Diniyyah), Ilmiah Publishers, Kuala Lumpur, 1998, pp 97-98.

17. See Shah Abdul Halim, *Islam & Pluralism,* www.shahfoundationbd.org.

18. Prof. Dr. Yusuf Al Qaradawi, *Shariatul Islam Khuluduha Wa Salahuha Lit-tatbiki Fi Kulli Jamanin Wa Makan,* Bengali tr. *Islami Shariater Bastobayan,* Oddhai- *Bartaman Juga Islami Shariat Bastobayaner Purba Sharta,* Khairun Prokashani, Dhaka, 2003, pp 174-179.

19. Shah Abdul Halim, *Intent of the Islamic Law,* www.shahfoundationbd.org.

আরব বসন্ত এবং দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলন

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক

১.

২০১০ সালের শীতকালে তিউনিশিয়ার এক মফস্বল শহরে ২৬ বছরের এক ফেরিওয়ালা যুবক মুহাম্মদ বুয়াজিজি প্রশাসনের হয়রানির প্রতিবাদে যখন নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়, তখন কে জানত এ ঘটনার মাত্র ২৭ দিনের মাথায় প্রেসিডেন্ট জয়নুল আবেদিন বেন আলীর ২৩ বছরের স্বৈরশাসনের অবসানের মাধ্যমে সূচনা হবে 'আরব বসন্তের'। তিউনিসিয়ার পর মিসর। তাহরির স্কোয়ারের তিন সপ্তাহের আন্দোলনে ফেব্রুয়ারি মাসে বিদায় নেন তিন দশকের শক্তিশালী স্বৈরশাসক হোসনি মোবারক। জুন মাসে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট সৌদি আরব পালিয়ে যান (বর্তমানে আছেন আমেরিকায়) এবং তার ৩৩ বছরের শাসন অবসানের জন্য একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। বাহরাইনের বিদ্রোহ দমনে ব্যবহৃত হয়েছে সৌদি সেনাবাহিনী। মরক্কো ও জর্ডানে সংস্কার সাধিত হয়েছে। লিবিয়ার ৪২ বছরের শাসক গাদ্দাফির পতন ঘটেছে। সিরিয়ার বাশার আল আসাদের পতন ঠেকাতে তার সরকার এ পর্যন্ত জাতিসঙ্ঘের হিসাব অনুযায়ী ৫,৫০০-এর বেশি মানুষকে হত্যা করেছে। মুসলিম বিশ্বে পরিবর্তনের যে সুবাতাস বইছে তা ঠেকানোর সাধ্য কারো নেই।

সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে এক বন্ধুর মুখে শুনলাম, মধ্যপ্রাচ্যে কী ঘটতে পারে তা নিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন থিঙ্কট্যাঙ্ক প্রায় ২০০টি বিকল্পের কথা ভেবেছিল। কিন্তু তাদের ওই বিকল্পের মধ্যে আরব বসন্ত ছিল না। অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু আমার ওই বন্ধু

---

[*] নিবন্ধটির লেখক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। ২০১২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি এটি দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আর্কাইভ লিংক: https://web.archive.org/web/20120428034059/http://www.dailynayadiganta.com/details/27532

কোনো সাধারণ লোক নন। জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক। যুক্তরাষ্ট্র সরকার মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তার কাছ থেকে মাঝে মধ্যে পরামর্শও নিয়ে থাকে। নীতিনির্ধারকদের সাথে তার যোগাযোগ আছে। তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য, মুসলিম মধ্যপ্রাচ্য, ভৌগোলিক কৌশলগত অবস্থানে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্য। সুয়েজখাল ও হরমুজ প্রণালী যদি কয়েক ঘণ্টার জন্যও বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো সারা বিশ্বের হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। সেই অঞ্চল নিয়ে, পৃথিবীকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা চিন্তা না করে পারেন? 'আরব বসন্ত' পাশ্চাত্যের রাডারে ধরা না পড়ার কারণ হচ্ছে মানুষ সাধারণত কার্যকারণ এবং এর ফলাফল নিয়েই ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে; কিন্তু মানুষ জানে না সৃষ্টিকর্তা কার্যকারণ ও ফলাফল দুটোই নিয়ন্ত্রণ করেন।

আজ অবশ্য এ বিষয়টি সুনিশ্চিত, আরব বসন্তের সুদূরপ্রসারী ফলাফল শুধু আরব বিশ্বের রাজনীতিতেই পড়বে না। এর প্রভাব গোটা বিশ্ব-রাজনীতির ওপর পড়বে। তবে লক্ষণীয় যে, ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত এক কোটি চার লাখ জনগোষ্ঠীর উত্তর আফ্রিকার ছোট্ট দেশ তিউনিশিয়াই আরব বসন্তের নেতৃত্ব দেয়ার গৌরব অর্জন করল।

তিউনিশিয়ায় নির্বাচনের ফলাফল চূড়ান্ত: ইসলামপন্থী আন-নাহদার ঐতিহাসিক বিজয়

অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তিউনিসিয়ায়। ২১৭ আসনের গণপরিষদে রশিদ ঘানুশীর ইসলামপন্থী দল আন-নাহদা ৮৯ আসন পেয়ে সর্ববৃহৎ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২৯ আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সিপিআর (কংগ্রেস ফর দ্য রিপাবলিক), আর ২৬ আসন পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে আরিধা। শেষোক্ত দু'টি দলই সেক্যুলার আদর্শে বিশ্বাসী। এরপর নভেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় মরক্কোতে। ৩৯৫ আসনের পার্লামেন্টে ১০৭ আসন পেয়ে সর্ববৃহৎ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে মধ্যমপন্থী ইসলামী দল জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি।

রশিদ ঘানুশীর সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। সর্বশেষ দেখা ইস্তাম্বুলে ২০০৯ সালের মে মাসে একটি ইসলামী সম্মেলনে। ইতোপূর্বে ওই বছরের মার্চ মাসে লন্ডনে তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। এককেন্দ্রিক বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থা নিয়ে তাঁর সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এর মাত্র কয়েক মাস আগে ইসরাইল গাজা উপত্যকায় ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল। সূরা বনি ইসরাইলের ৭ নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছিলেন, *'এতে করে ইসরাইলের চেহারাই বিকৃত হয়েছে।'* আলোচনার এক পর্যায়ে তার সব সময়ের হাসিমাখা মুখে আরো একটু হাসি নিয়ে আমাকে বলেছিলেন, *'বাংলাদেশের অবস্থা যখন তিউনিশিয়ার মতো হবে, তখন আপনিও আমার মতো আর নিজের দেশে থাকতে পারবেন না।'* কে জানত এ আলোচনার মাত্র ২২ মাসের মাথায়, ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে ২০ বছরের অধিক সময়ের নির্বাসনের অবসান ঘটিয়ে ৭০ বছর বয়স্ক রশিদ ঘানুশী তিউনিশিয়ায় ফিরে যাবেন এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য। ভবিষ্যতের খবর একমাত্র আল্লাহর কাছেই থাকে (সূরা লোকমান ৩১:৩৪) এবং তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন (সূরা ইউসুফ ১২:১০০)। দেশে

ফিরে ঘানুশী ঘোষণা দেন নিজে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। ক্ষমতায় গেলে তার দল ইসলামী শরীয়া আইন বাস্তবায়ন করবে না। তুরস্কের একে পার্টির আদলেই সরকার পরিচালনা করবে।

অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মিসরের নির্বাচনে ইখওয়ানের রাজনৈতিক শাখা ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি (এফজেপি) ৫০৮ আসনের পার্লামেন্টে সর্বমোট ২৩৫ আসন পেয়ে সর্ববৃহৎ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১২৩টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সালাফিপন্থী নূর পার্টি। ৩৮টি আসন পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে উদারপন্থী ওয়াফদ্ পার্টি। নিয়মের ব্যত্যয় না ঘটলে ইখওয়ানই আগামীতে কোয়ালিশন সরকার গঠন করবে। মোবারকের আমলে ইখওয়ান নিষিদ্ধ দল হলেও পার্লামেন্টে বিভিন্ন নামে এবং নির্দলীয়ভাবে ইখওয়ানের আসনসংখ্যা ছিল ৮০। ডাক্তার, প্রকৌশলী ও আইনজীবীদের সংগঠনের বেশির ভাগই ছিল ইখওয়ানের দখলে। সমাজসেবার কারণে তারা ছিলেন জনগণের খুব কাছাকাছি। জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের মতো তাদের কোনো রাজনৈতিক দুর্নামও ছিল না। তারপরও তারা ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টির নামে আলাদা একটি প্লাটফর্ম সৃষ্টি করেছেন। ঘোষণা করেছেন একজন ক্যাথলিক খ্রিস্টানকেও মিসরের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মেনে নিতে তাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।

২.

আমার তিনবার তুরস্ক সফরের সুযোগ হয়েছে। ১৯৯৬ সালে প্রথম সফরের সময় নাজমুদ্দিন আরবাকান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ওই সফরে রেফাহ পার্টির এক যুবক সংসদ সদস্য আমাকে বলেছিলেন, *'ইসলামের জন্য তুরস্কে কাজ করা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের চেয়ে হাজার গুণ কঠিন।'* স্মরণ করা যেতে পারে, একটি কবিতা লেখার কারণে রজব তৈয়ব এরদোগানকে জেলে যেতে হয়েছিল এবং তিনি নির্বাচন করার জন্য অযোগ্য ঘোষিত হয়েছিলেন। সেই তুরস্ক আজ মুসলিম বিশ্বের অলিখিত নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়ার সম্মান অর্জন করেছে।

আতাতুর্কের 'আধুনিক তুরস্কে' সেক্যুলারিজমের শিকড় সমাজ ও রাষ্ট্রের অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে। এমনকি, সেক্যুলার ফ্রান্সের চেয়ে সেক্যুলার তুরস্ক অনেক বেশি সেক্যুলার। তুরস্কের সেনাবাহিনী নিজেদের সেক্যুলারিজমের রক্ষাকর্তা বলে মনে করে। তারা ১৯৬০, ১৯৮০ এবং সর্বশেষ ১৯৯৮ সালে ক্ষমতা দখল করেছিল। ১৯৯৮ সালে নাজমুদ্দিন আরবাকানকে যখন ক্ষমতাচ্যুত করা হয় তখন রজব তৈয়ব এরদোগান ছিলেন তুরস্কের বৃহত্তম শহর ইস্তাম্বুলের মেয়র। ক্ষমতাচ্যুতির পর নীতিগত প্রশ্নে এরদোগানের নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্কদের সাথে বর্ষীয়ান নেতা আরবাকানের মতবিরোধ হয়। আরবাকান সরাসরি ইসলামের কথা বলতেন এবং পাশ্চাত্যের সমালোচনা করতেন। তাঁর এসব বক্তব্যকে সেনাবাহিনী চিত্রিত করে সেক্যুলারিজমের বিরোধিতা রূপে।

এরদোগান ও আবদুল্লাহ গুল 'জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি' নামে নতুন দল গঠন করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সেক্যুলারিজমকে এ বলে সংজ্ঞায়িত করেন যে, সেক্যুলারিজমের অধীনে ইসলামসহ সব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা রয়েছে। তারা গুলেন মুভমেন্ট ও অন্যান্য উদারপন্থীদের সমর্থন লাভ করেন। তাছাড়া তারা অর্থনৈতিক উন্নতির ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেন। ফলে ২০০২ সালের নির্বাচনে নবগঠিত একে পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পরপর দু'টি নির্বাচনে তারা বিজয়ী হয়। একে পার্টির নেতৃত্বে তুরস্ক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দীর্ঘদিন ধরে তুরস্ককে একটি ছোট্ট গ্রুপ শাসন করে আসছিল। এ কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীতে ছিল সেনাবাহিনীর একটা অংশ, উচ্চতর আদালতের বিচারপতিদের একটি অংশ, সুশীল সমাজ ও সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ। তারাই সিদ্ধান্ত নিত কারা ক্ষমতায় থাকবে বা থাকবে না। এরদোগানের আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী এদের চ্যালেঞ্জ করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেননি। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এরদোগান সংবিধান সংশোধন করেছেন এবং সত্যিকার অর্থে তুরস্কে গণতন্ত্র কায়েম করেছেন।

তুরস্কই প্রমাণ করল, নেতৃত্বের কাজ হচ্ছে একটি পথ বন্ধ হলে আরো তিনটি পথ খোলা। দ্বীনের পথে কোনো কাজে সঙ্কীর্ণতা নেই (সূরা হজ ২২:৭৮), যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে আল্লাহ তাদের পথ দেখিয়ে দেন (সূরা আনকাবুত ৬৯:২৯)।

তুরস্কের একে পার্টি এবং মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পথ ধরে ৬০ বছরেরও অধিক সময় ধরে কার্যরত ভারতের জামায়াতে ইসলামী গত বছরের এপ্রিল মাসে 'ওয়েলফেয়ার পার্টি অব ইন্ডিয়া' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছে। তাদের স্লোগান হচ্ছে– ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সমতা। পাশাপাশি জামায়াত তার আদর্শিক কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। ১৬ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি জামায়াতের দায়িত্বশীল হলেও তাতে পাঁচজন অমুসলমান রয়েছেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কেরালা রাজ্যের ক্যাথলিক খ্রিস্টান ফাদার আব্রাহাম জোসেফ এবং কর্নাটকের সাবেক মন্ত্রী (অমুসলিম) ললিতা নায়ার। এরা দু'জনই সহসভাপতি।

অনুরূপভাবে মালয়েশিয়ার ইসলামী আন্দোলন পিএএস (এক সময় যারা দু'টি রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল; এখন শুধু একটিতে, কিন্তু ফেডারেল পার্লামেন্টেও তাদের সদস্য রয়েছে) ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বাদ দিয়ে শুধু ন্যায়বিচারের কথাই বলছে। তুরস্ক, তিউনিশিয়া, মালয়েশিয়া, মিসর ও ভারতে ইসলামী আন্দোলনের এই কৌশলগত অবস্থান পরিবর্তনের আসল লক্ষ্য হচ্ছে দ্বীনের বাস্তবায়ন (সূরা সফ ৬১:৯)। কৌশলগত সঠিক সিদ্ধান্ত ছাড়া দ্বীনের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধীরগতিতে চলা ছিল রাসূলগণের সবচেয়ে বড় সুন্নাত। সপ্তম হিজরীর শুরুতে অর্থাৎ নবুওয়তের ২০ বছর পর মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয় (সূরা আল মায়িদা ৫:৯) এবং অষ্টম হিজরীতে অর্থাৎ নবুওয়তের ২১ বছর পর নিষিদ্ধ হয় সুদ (সূরা আল বাকারা ২:২৭৫)। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের তিন মাস পর অনুষ্ঠিত হজেও কাফেরদের জাহেলী প্রথা অনুসরণের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল (সূরা তওবা ৯:২৮)।

৩.

রাসূল (সা)-এর জীবনে সীমাহীন দুঃখকষ্ট ছিল, কিন্তু তেমন কোনো পরাজয় ছিল না। 'রাসূলের জীবনে তোমাদের জন্য নিহিত আছে উত্তম আদর্শ' (সূরা আল আহযাব ৩৩:২১)। ওহুদের বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে মুসলমানদের মনে সাহস সঞ্চয়ের জন্য পরদিনই তিনি আহত সাহাবীদের নিয়ে শত্রুসৈন্যের পেছনে ধাওয়া করেছিলেন। এর আগে হিজরতের পর মক্কায় কাফেররা অনেকটা হাঁফ ছেড়ে বলেছিল, 'আপদ চলে গেছে, বাঁচা গেল।' কিন্তু মদিনায় পৌঁছেই তিনি মক্কা থেকে সিরিয়াগামী বাণিজ্য কাফেলার ওপর চাপ সৃষ্টি করেন মক্কার ওপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য। প্রথম হিজরীতে তাঁর গৃহীত এ কৌশলই ছিল দ্বিতীয় হিজরীতে সংঘটিত বদর যুদ্ধের পটভূমি। দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধ না হলে তৃতীয় হিজরীতে ওহুদ, অতঃপর পঞ্চম হিজরীতে খন্দক, ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়া এবং অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় হতো না। হুদাইবিয়ার সন্ধি প্রমাণ করে রাসূল (সা)-এর কর্মকৌশলের মোকাবেলায় মক্কার কাফেররা ছিল অসহায়। সন্দেহ নেই, রাসূলকে আল্লাহ পাক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেছেন ওহীর মাধ্যমে। (অবশ্য এটাও সত্য যে, সব ব্যাপারে ওহী নাজিল হতো না)। ওহীর দরজা যখন বন্ধ, ইসলামী নেতৃত্বকেই সঠিক স্ট্র্যাটেজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করলে আন্দোলন কোনো দিন সফলতার মুখ দেখবে না।

কুরআনের পাতায় পাতায় আল্লাহ ইতিহাসের আলোচনা করেছেন: জানা ইতিহাস (সূরা বাকারা ২:৪৭), অজানা ইতিহাস (সূরা কাহাফ ১৮:৮৩-৮৬)। উদ্দেশ্য হলো মুসলমানেরা যেন ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় (সূরা আল ইমরান ৩:১৩৭, আম্বিয়া ২১:১১)। সূরা আল ইমরানের ১৪০ নম্বর আয়াতের (এতকালের উত্থান-পতন, মানুষের মধ্যে আমি এর আবর্তন করে থাকি) ওপর ভিত্তি করেই প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে খালদুন বলেছেন, 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে'। আল্লাহ মানুষকে চিন্তাশীল হতে বলেছেন (সূরা আল ইমরান ৩:১৯০); বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগানোর তাগিদ দিয়েছেন (সূরা আল রাদ ১৩:৪); নিজেদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেছেন (সূরা হাশর ৫৯:২)। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বকে একটু দূরে দেখার চেষ্টা করতে হবে। পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ইউরোপ শত চেষ্টা করেও অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। ১ ট্রিলিয়ন (দশ হাজার কোটি) ডলার খরচ করে সাড়ে চার হাজার মার্কিন সৈন্যের প্রাণের বিনিময়ে ইরাকে প্রায় ১০ বছর যুদ্ধ চালিয়ে ১৩ ট্রিলিয়ন (১৩০ হাজার কোটি) ডলারের ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র আজ অনেকটা দুর্বল। সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের আমলের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, David Roth Kopf অতি সম্প্রতি তার প্রকাশিত বই Running the World-এ লিখেছেন, "We can't write checks the way that we once could; we can't deploy troops in the way that we once did." অর্থাৎ 'অতীতের মতো ইচ্ছা করলেই আমরা যেমন আর্থিক অনুদান দিতে পারছি না, তেমনি আমরা সামরিক অভিযানও পরিচালনা করতে পারছি না।

একবিংশ শতাব্দীর এই বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্যের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। চীন ও ভারতের উত্থান ঘটছে। নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। যে জাতিকে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন গোটা মানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে নেতৃত্বদানের জন্য (সূরা আল ইমরান ৩:১১০); মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য (সূরা ইব্রাহিম ১৪:১); সেই মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বদানের জন্য (সূরা আল ফুরকান ২৫:৭৪) দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে বাস্তবধর্মী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে তুরস্কের একে পার্টি, মিসরের ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি, তিউনিশিয়ার আন-নাহাদা পার্টি এবং ওয়েলফেয়ার পার্টি অব ইন্ডিয়া থেকে অনেক অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। ছোট-বড় ইসলামী দলগুলোকে সব সঙ্কীর্ণতা ও আত্মম্ভরিতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। অতীতের ভুলের জন্য ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত বাড়ানোর জন্য আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাজিল করেননি (সূরা তাহা ২০:১)।

আরব বসন্ত গোটা বিশ্বকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে এবং পশ্চিমা পর্যবেক্ষকদের অনেকটা অবাক করে দিয়ে ইসলামপন্থীরাই এর ফসল ঘরে তুলেছেন। সাম্প্রতিককালে আরব বিশ্বের নির্বাচনী ফলাফল এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ার ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশের গায়ে এই আরব বসন্তের বাতাস কখন লাগবে?

জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাসূল (সা)-এর আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে

অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ বলেছেন, রাসূল (সা) হলেন আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রের আদর্শ। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাসূল (সা) এর আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে। মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই যে দিকের প্রতি রাসূল (সা) এর দিকনির্দেশনা নেই। নবুয়াতের পূর্বে তিনি সমাজ সংস্কারের অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু পরিপূর্ণ সফল হননি। নবুয়াতের পর তিনি তেইশ বছরে একটি কল্যাণময় শান্তির সমাজ উপহার দিয়েছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র কোরআনের কারণে। তিনি বলেন, মানব রচিত ফর্মুলা মানুষের কল্যণ আনতে পারে না। মানবজাতির মুক্তি, শান্তি ও কল্যাণ আসে আসমানী ফর্মুলায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআনকে অনুসরণ করতে তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।

তিনি আজ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবে পবিত্র সিরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, ঢাকা মহানগরী সহকারী সেক্রেটারি মো: সেলিম উদ্দিন, ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ ও মঞ্জুরুল ইসলাম ভুইয়া, ঢাকা মহানগরী কর্মপরিষদ সদস্য রেদওয়ান উল্লাহ শাহিদী, ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা ও কবির আহমদ প্রমুখ।

---

[*] এটি ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে এক আলোচনা সভায় জামায়াতের তৎকালীন নায়েবে আমীর অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদের বক্তব্য, যা জামায়াতের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত। আর্কাইভ লিংক: https://web.archive.org/web/20120306105249/https://www.jamaat-e-islami.org/newsdetails.php?id=96

প্রধান অতিথি বলেন, রাসূল (সা) মক্কায় জনসেবার কাজ করেও সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। মদীনাবাসী রাসূল (সা) এর কথার মর্ম বুঝতে পেরে তারা ইসলাম গ্রহণ করে দ্বীন প্রতিষ্টার কাজে রাসূল (সা)কে সহযোগিতা করেছে। আরবের লোকজন তাঁকে 'আলামীন' হিসাবে জানতো। যখন তিনি কোরআনের সমাজ প্রতিষ্টার দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন তখনই তাঁর বিরোধিতা শুরু হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো হয় এবং তাঁর উপর নির্যাতন শুরু হয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর দেওয়া ফর্মুলা ও রাসূলের দেখানো পথ অনুসরণ করে কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

জোর করে কিংবা অস্ত্র দিয়ে মানুষ হত্যা করে ইসলাম প্রতিষ্টা করা যায় না। ইসলাম কখনো জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে না। ইসলামের সৌন্দর্য মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্টার জন্য রাসূল (সা) এর পথ অনুসরণ করে আমাদেরকে সামনে এগুতে হবে। যারা পেটের ক্ষুধা নিবারণের কথা বলে ক্ষমতায় গিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে বলে ঘোষণা দিচ্ছে, তারা ইসলামের মর্মার্থ ও রাসূল (সা) এর জীবনী সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। এ পথে বাধা আসবে, নির্যাতনের শিকার হতে হবে, অপবাদ দেওয়া হবে। জামায়াতে ইসলামী এদেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় বলেই জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। জামায়াতের নেতৃবৃন্দ কোনো প্রকার অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন না। জামায়াতে ইসলামীকে ধ্বংস করতেই এই ষড়যন্ত্র। এজন্য আমাদেরকে সাহসের সাথে সামনে এগুতে হবে। আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ পথ খুলে দিবেন। জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সম্মানের সাথে নির্দোষ প্রমানিত হয়ে কারাগার থেকে বের হয়ে আসবেন। তাদের নেতৃত্বে আমরা এদেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করবো।

ইসলামী আন্দোলনে হীনমন্যতাবোধের সুযোগ নেই

আবু নকীব

ইসলামী আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। নয় নিছক ক্ষমতার রাজনীতি। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় পাঠাবার আন্দোলনও নয় এটি। বরং আল্লাহর দ্বীন বা ইসলামী আদর্শকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিক ও বিভাগে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠাই ইসলামী আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ক্ষমতা লাভের পথ দীর্ঘ মনে হবার কারণে অথবা বিপদসংকুল ও বাধা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হবার কারণে ইসলামী আদর্শ তথা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কাজ আপাতত বাদ দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্ষমতার রাজনীতির নিয়ামক শক্তিসমূহের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের কৌশল অবলম্বনের পথ বেছে নেয়ার যুক্তি বাস্তবে কতটা টেকসই হতে পারে গভীরভাবে তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। অবশ্য ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টদের একটা পথ বন্ধ হলে দশটা পথ খোলার মত যোগ্যতা-দক্ষতা অবশ্যই থাকতে হবে। তবে বাস্তবে পথ বন্ধ হবার আগে কৃত্রিমভাবে নিজেদের পক্ষ থেকে পথ বন্ধ করে কোনো কৌশল অবলম্বনের চিন্তা-ভাবনা হীনমন্যতারই পরিচয় বহন করে এতে কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই।

সম্প্রতি বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে চতুর্মুখী চক্রান্ত ষড়যন্ত্র চলছে। তথ্য সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেকে বিচারিক সন্ত্রাসের আয়োজন চলছে। এই ধরনের

---

* জামায়াতের তৎকালীন আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী কারান্তরালে থাকা অবস্থায় 'আবু নকীব' ছদ্মনামে এই নিবন্ধটি লিখেন। ২০১৩ সালের ২৭ আগস্ট দৈনিক সংগ্রামের উপ-সম্পাদকীয় হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়, www.dailysangram.com/post/125508

পরিস্থিতিতে আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিন্তার ঐক্য, পারস্পরিক আস্থা সুদৃঢ় থাকা অপরিহার্য। তারচেয়েও বেশি অপরিহার্য হল আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে প্রতিকূলতার মোকাবিলায় অসীম ধৈর্য ও ছাবেতে কদমের সাথে ময়দানে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে অকুতোভয়ে টিকে থাকার, বরং সামনে অগ্রসর হবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। পক্ষান্তরে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিপক্ষের এ সময়ের কৌশল হয়ে থাকে নানা কাল্পনিক, তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির গুজব ছড়িয়ে চিন্তার ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্যে তথ্য সন্ত্রাস জোরদার করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কখনও কোনো ব্যক্তি বিশেষের অপরিনামদর্শী কথা বা কার্যক্রমকে এরা সূত্র বা তথ্য উপাত্ত হিসাবে ব্যবহার করে এ ধরনের সুযোগ নিয়ে থাকে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মহল বিশেষের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রচারণা বেশ সুকৌশলে চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে তারা কতিপয় ব্যক্তির একটি অপরিণামদর্শী ও অপরিপক্ক পদক্ষেপজনিত একটি বৈঠককে এবং পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধকে তথ্য-উপাত্ত হিসাবে ব্যবহার করছে। যদিও তাদের সকল জল্পনা-কল্পনাকে ভুল প্রমাণ করে তাদের পরিকল্পিত প্রচারণার মুখে ছাই নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের যুবক ও ছাত্রকর্মী তথা নতুন প্রজন্মই রাজপথে শক্ত অবস্থান নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের উপর সরকার পরিচালিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করে যাচ্ছে। অকুতোভয়ে জীবন দিতেও কুণ্ঠা বোধ করছে না। এরপরও মহল বিশেষের পক্ষ থেকে ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে চিন্তার বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে অব্যাহতভাবে।

ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট নবীন ও প্রবীণ সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সামনে বর্তমানে মিশরের ইসলামী সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডের উপর যে গণহত্যা চালানো হচ্ছে তা থেকে দুটো বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। এক, তথাকথিত দেশী-বিদেশী সোশ্যাল এলিটদের সমর্থন পাওয়ার জন্যে বা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার জন্যে দলের ইসলামী পরিচিতি বর্জন করেও কোনো লাভ হয় না। দুই, ইসলামের সংগঠিত শক্তি হওয়াটাই মূল অপরাধ।

মিশরের ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তো স্বাধীনতা বিরোধিতার কোনো অভিযোগ আনার সুযোগ নেই। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বরং তাদেরই ছিল সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা। তারপরও তাদের দেশের প্রথমবারের মত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে কেন ক্ষমতাচ্যুত করা হয়?

ইতিপূর্বে ১৯৯১ সনে আলজেরিয়ায় ইসলামী সলভেশন ফ্রন্ট প্রথমবারের মত নির্বাচনে ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতেই সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলকে গণতন্ত্রের প্রবক্তা বিশ্ব মোড়লেরা অকুণ্ঠ সমর্থন দেয় নিছক ইসলাম ঠেকাবার জন্যে। তাদের বিরুদ্ধেও

আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরোধিতার কোনো অভিযোগের সুযোগ ছিল না। ইসলামের পক্ষের সংগঠিত শক্তি হওয়াই তাদের অপরাধ। অতএব বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের অবস্থান যে নিছক ইসলামী আদর্শের পক্ষের শক্তির ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি রোধ করার জন্যেই, এতে কোনো বিবেকবান ব্যক্তির মনেই সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে না। কেউ কেউ বলার চেষ্টা করে মুসলিম ব্রাদারহুড তার নাম-পরিচয় পাল্টিয়ে অন্য নামে ইসলামী পরিচিতি বাদ দিয়ে সংসদ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করেছে, বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কবে শুভ বুদ্ধির উদয় হবে!

আসলে কি মুসলিম ব্রাদারহুড তাদের নাম পরিবর্তন করেছে নাকি নির্বাচনী কৌশল হিসেবে একটা ফ্রন্ট করেছে? ব্রাদারহুড নিষিদ্ধ থাকা অবস্থায় এর আগেও তারা ওয়াফদ পার্টির হয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। এবারেও তাদের একই কৌশল আমরা দেখতে পাই একটু ভিন্ন আংগিকে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতির মোকাবিলা তাদের করতে হচ্ছে মুসলিম ব্রাদারহুডের পক্ষ থেকেই। ভিন্ন নামে নির্বাচনের পরও তাদের ক্ষমতায় টিকতে দেয়া হয়নি। এর প্রতিবাদে মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতৃত্বে তাদের সংগঠনের সুনামেই ইনশাআল্লাহ আগামীতে মিশরে একই সাথে ইসলাম ও গণতন্ত্রের বিজয় হবে একটি সফল ও ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে। সম্প্রতি একটি পত্রিকায় জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে চিন্তার বিভ্রান্তি ছড়ানোর কৌশল হিসেবে একটা গোপন বৈঠক ও একই প্রবন্ধকে ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে নাকি এও বলা হয়েছে যে, ভারতের জামায়াতে ইসলামী তাদের অতীতের ভুল শুধরিয়ে দলের নাম পরিবর্তন করে একটা প্লাটফরম করেছে যাতে নেতৃত্বের পর্যায়ে একজন হিন্দু, একজন খৃস্টানও আছে। আসলে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ তার নাম পরিবর্তন করেনি। তারা অতীতে নির্বাচনে কোন ভূমিকাই রাখতো না। ভোটও দিত না। তারা মূলত একটা 'সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয়' প্রতিষ্ঠান হিসাবেই কাজ করে আসছিল। মুসলিম পার্সনাল ল'-এর সংরক্ষণের ব্যাপারে তারা সকল ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলে কাজ করেছে। এরপর নির্বাচনী রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার জন্যে একটা প্লাটফরম দাঁড় করিয়েছে, এটা তাদের কার্যক্রমের একটা নতুন অগ্রগতি বলতে পারি। কিন্তু অতীতের ভুল শুধরে তারা নাম পরিবর্তন করেছে, এমন কথা যদি কেউ বলে থাকেন বা লিখে থাকেন তা হলে তিনি তথ্য বিচ্যুতির আশ্রয় নিয়েছেন। এই তো সেদিনও জামায়াতে ইসলামী হিন্দের আমীর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিলের ব্যাপারে সরকারের উদ্দেশে উচ্চ আদালতের রায়ের প্রতিবাদ করে বিবৃতি দিয়েছেন। তার বিবৃতি বিবিসিতেও প্রচারিত হয়েছে।

এটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা যে, '৭১ সালে পাকিস্তানের অখণ্ডত্বের পক্ষে শুধু জামায়াতে ইসলামীই অবস্থান নেয়নি। বরং সকল ইসলামী ও মুসলিম সংগঠন,

প্রতিষ্ঠান এবং সুপরিচিত সব ইসলামী ব্যক্তিত্ব পাকিস্তানের অখণ্ডত্বের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল, সেই কারণেই মুসলিম লীগের সকল গ্রুপসহ পিডিপি, কৃষক শ্রমিক প্রজাপার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি ও জামায়াতে ইসলামকে একযোগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া ঐসব দলের আর কোনোটাই সংগঠিত শক্তি হিসেবে রাজনীতিতে সক্রিয় নাই বলেই তাদের নিয়ে বর্তমান সরকারের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তাছাড়া জামায়াতে ইসলামী বর্তমান প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার রাজনীতিতে ফ্যাক্টর হওয়াও একটা বড় কারণ। সেই সাথে প্রতিবেশী দেশের আগ্রাসী, আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী ভূমিকার ক্ষেত্রে জামায়তই প্রধান প্রতিবাদী শক্তি হওয়ার ফলেই আজ সরকারের কোপানলের শিকার হতে হচ্ছে। ১৯৯১ সালে এবং ২০০১ সালে জামায়াতের কারণে বিএনপি ক্ষমতায় আসা এবং আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসতে না পারাটাই জামায়াতের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের ক্ষোভের প্রথম ও প্রধান কারণ। না হলে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পুনর্গঠিত হওয়ার পর থেকে '৯১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বর্তমানে যে অভিযোগ এনেছে, সে অভিযোগ কোনোদিনই আনেনি। '৯২ সালে 'ঘাদানিকের' মাধ্যমে জামায়াতের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অভিযান পরিচালনার মূল কারণ ছিল, জামায়াত কেন সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন দিল? কিন্তু পরবর্তীতে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জামায়াতকে সাথে পেয়ে বা সাথে নিয়ে তাদের কোন আপত্তি তো ছিলই না, বরং অনেক তোয়াজ করে জামায়াতকে সাথে রাখার চেষ্টা করতে তাদের কোন কুণ্ঠা ছিল না। জামায়াতকে সাথে নিয়ে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রেস ব্রিফিং দিতে তখন কোনো সংকোচবোধ করেননি। তাই আজ একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়, দেশের রাজনীতিতে জামায়াতের ফ্যাক্টর হওয়া এবং ভারতীয় এজেন্ডা ও ডিজাইন বাস্তবায়নের পথে প্রধান অন্তরায় হওয়াই জামায়াতের একমাত্র অপরাধ। জামায়াতের এই ভূমিকা আওয়ামী ঘরানা ও বাম ঘরানার কাছে যতই অগ্রহণযোগ্য হোক না কেন দেশবাসী এটাকে ইতিবাচকভাবেই মূল্যায়ন করবে– সেদিন বেশি দূরে নয়। অতএব কোনো মহলের প্রচারণায় বা বিভ্রান্তি ছড়ানোর কারণে ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মনে হীনমন্যতাবোধের বা চিন্তার বিভ্রান্তির শিকার হবার প্রশ্নই ওঠে না।

ইসলামী আন্দোলনের মূল পথিকৃত শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)। তাঁকেও আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন সময়ের, তাঁর পূর্বের নবী রাসূলদের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর সাথী-সঙ্গীদের ছবর ও ইস্তেকামাতের সাথে ময়দানে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে সামনে অগ্রসর হবার তাকিদ দিয়েছেন। বর্তমানে আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন করে ওহীর মাধ্যমে কোনো পথনির্দেশ আসার সুযোগ নেই। তবে ময়দানের বাস্তবতাকে সামনে রেখে কোরআন ও সিরাতে রাসূল অধ্যয়ন করলে মনের সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও হতাশা কাটিয়ে

উঠে পূর্ণ আস্থা নিয়ে ময়দানে টিকে থাকার এবং সামনে এগুবার প্রেরণা পাওয়া অবশ্যই সম্ভব।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের ইসলাম বিরোধী শক্তির নাস্তিক্যবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন, হাজার হাজার আলেমে দ্বীনের ওস্তাদ হযরত আল্লামা আহমদ শফীর নেতৃত্বে গড়ে উঠা হেফাজতে ইসলামের রাজপথ কাঁপানো প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণের পর থেকে সরকার এবং সরকারের দোসর ধর্মহীন রাজনীতির প্রবক্তা ও বাম ঘরানার রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের নানামুখী প্রচারণা ও জুলুম নির্যাতন আমাদের সকলের জন্যে একটি জীবন্ত নজির। হযরত আল্লামা আহমদ শফী এবং তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা উত্তর ৪২ বছরে আওয়ামী ঘরানা বা বাম ঘরানার পক্ষ থেকে এমন কোনো অভিযোগ বা অপবাদ শোনা যায়নি যা বর্তমানে শোনা যাচ্ছে। কারণ একটাই এখন তারা সরকারের এবং সরকারের দোসরদের ন্যক্কারজনক ইসলাম বিরোধী ভূমিকায় মাঠে-ময়দানে সরব এবং সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে, ইসলামী আন্দোলন-সংগ্রামের বিরুদ্ধে ঐ মহলবিশেষের আক্রোশ ও বিদ্বেষ মজ্জাগত। ইসলামের পক্ষে যারাই ইতিবাচক, সক্রিয় এবং শক্ত ভূমিকা রাখবে তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তুফান স্থায়ী করা, অত্যাচার, জুলুম, নিপীড়ন, নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানোই তাদের ইতিহাস। কাজেই এসব দেখে ইসলামের পক্ষের লোকদের আত্মবিশ্বাস এবং আস্থা আরো বৃদ্ধি পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এটাই ইসলামী আন্দোলনের মূলধারার যথার্থতার ও সঠিক পথে থাকার মহা সনদ, যা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কর্তৃক সত্যায়িত বা অনুমোদিত।

সম্প্রতি মিশরের ঘটনার প্রতি গোটা বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। মুসলিম ব্রাদারহুডকে নিষিদ্ধ করার পাঁয়তারা চলছে। এটা হলে নাকি সেখানে ইসলামী রাজনীতি বা তাদের ভাষায় 'রাজনৈতিক ইসলাম' শেষ হয়ে যাবে, এই মর্মে বাংলাদেশের একটি জাতীয় দৈনিকের উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে। মন্তব্যকারী এই নিবন্ধ লেখার সময় মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডকে বিগত প্রায় ৬০ বছর নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলন যা তাদের ভাষায় 'রাজনৈতিক ইসলাম' শেষ হয়ে যায়নি। মিসরের জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রথম সুযোগেই মুসলিম ব্রাদারহুড মনোনীত প্রার্থীদের সংসদে বিজয়ী করেছে, প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকেও বিজয়ী করেছে; একইসাথে গণতন্ত্র ও ইসলামী আদর্শের জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। এরপর যারা মনে করে গণতন্ত্র থাকলে ইসলামের জয় সুনিশ্চিত, তারাই চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ক্যু'দাতার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো জনগণের ভোটে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে, গ্রেফতারও করেছে। এ প্রসঙ্গে তুরস্কের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রজব তাইয়েব এরদোগান স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, মিসরের সামরিক ক্যু'দাতার পেছনে

ইসরাইলের হাত থাকার ব্যাপারে তাদের কাছে প্রমাণ আছে। এতে প্রমাণিত হয় কোরআনে ঘোষিত ইসলাম ও মুসলমানদের কট্টরতম দুশমন জায়নবাদী গোষ্ঠীই তাদের পৃষ্ঠপোষকদের মাধ্যমে দেশে দেশে ইসলামের অগ্রযাত্রা রুখে দেবার অপচেষ্টা করে যাচ্ছে।

শিবিরের অভ্যন্তরীণ সংকটে জামায়াতের হস্তক্ষেপ

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

২০০৯ সালের ডিসেম্বরে শিবির দ্বিতীয় বারের মত বড় ধরনের সংকটে নিপতিত হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি মো: রেজাউল করিম একদিন আমাকে বলে,

"আমার পিএইচডি থিসিস জমা দিয়ে দিয়েছি। আমার অসুস্থ আম্মা হাসপাতালে। আমার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। পরিবারের কারণেই আমার ছাত্রজীবন শেষ হওয়া উচিত। আরো আগে থেকেই আমি ছুটি চাচ্ছিলাম।"

এমতাবস্থায় আমি তাকে বললাম, "তাহলে তো তোমার ছাত্রজীবন শেষ করাই ভালো।"

তখন সে আমাকে বলে, "কিন্তু মুজাহিদ ভাই তো আমাকে থাকতে বলে দিয়েছেন।"

আমি কথাটা শুনে একটু বিব্রত হই। তবে পরক্ষণেই বলি, "হতে পারে এটা তার ব্যক্তিগত অভিমত। আমি মনে করি ছাত্রজীবন শেষ করাটাই তোমার জন্য ভালো হবে। আমরা এতে একজন প্রাক্তন সভাপতি পাবো। আর তাছাড়া যত তাড়াতাড়ি জামায়াতে আসো তত ভালো।"

এরপর আমি জানতে পারি, তার ব্যাপারে শিবিরের পরিষদ সদস্যদের মাঝে কিছু কথাবার্তা চর্চা হয়েছে। তার খরচ করার ধরন, বিয়ে করা এবং বায়তুলমাল থেকে টাকা পয়সা নিয়ে নতুন বাসা ভাড়া করা ইত্যাদি নিয়ে কিছু সদস্য উদ্বিগ্ন। আগে থেকেই তাদের আপত্তি ছিল।

---

* ২০১০ সালে ইসলামী ছাত্রশিবিরের অভ্যন্তরীণ সংকট প্রসঙ্গে জামায়াতের সংস্কারপন্থীদের সাথে সংগঠনবাদীদের অন্তর্কোন্দলের কিছু চিত্র এই চিঠি থেকে পাওয়া যাবে। জেল থেকে পাঠানো এই স্মৃতিচারণ লিখেছেন তখনকার একজন শীর্ষ জামায়াত নেতা মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। চিঠির শিরোনাম আমাদের দেয়া।

তবে মাস কয়েক আগে থেকেই সাংগঠনিক কার্যক্রম সেক্রেটারি জেনারেলের উপর ছেড়ে দিয়ে রাখায় তারা মনে করেছিল কেন্দ্রীয় সভাপতি যেহেতু বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে সেহেতু তার সম্পর্কে যেসব অনিয়মের অভিযোগ আছে তা ঘাটাঘাটি না করে ভালোভাবেই তিনি বিদায় হয়ে যান এটাই তারা চেয়েছিল। তিনি ডিসেম্বরের ১৯ তারিখে তার ছাত্রজীবন শেষ করার কথা সেক্রেটারি জেনারেল শিশির মনিরকে জানিয়েও দিয়েছিলেন। তিনি সংগঠন নিয়ে ভবিষ্যত সেটআপ কিভাবে হবে তা নিয়ে শিশিরকে চিন্তা করার জন্যও বলেছিলেন।

হঠাৎ করে সম্ভবত ২২ তারিখে তিনি জানান, আমাকে বৃহত্তর আন্দোলনের নির্দেশে থাকতে হচ্ছে।

শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব থাকা কালে তার ছাত্রজীবন শেষ করা না করার বিষয়টি নিয়ে সবসময়ই একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়। সেজন্য মতিউর রহমান আকন্দ যখন কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন তখন আলোচনাক্রমে ঠিক হয় কেন্দ্রীয় সভাপতি যদি normal ছাত্র হন অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রী বা নীচের ক্লাশের স্বাভাবিক ছাত্র হন তাহলে ছাত্রজীবন অব্যাহত রাখবেন। অন্যথায়, *(কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হিসেবে সরবরাহ করা সদস্য তালিকায় ছাত্রত্ব কলামে – সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত)* 'না' লিখবেন। আর স্বাভাবিক ছাত্রত্ব শেষ হবার পরও কোন সময় কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ যদি মনে করেন যে কেন্দ্রীয় সভাপতির ছাত্রজীবন অব্যাহত রাখার দরকার রয়েছে সংগঠনের প্রয়োজনে, তাহলে সে অবস্থায় তিনি 'অব্যাহত' লিখবেন।

সুতরাং পরিষদ সদস্যরা তাকে পরামর্শ দেন, আপনি পরিষদ সদস্যদের সাথে আলাপ করুন। তখন রেজাউল তাদের জানান, বৃহত্তর আন্দোলনের পক্ষ থেকে আমাকে ছাত্রজীবন অব্যাহত রাখতে বলা হচ্ছে। কাউকে বলেন, "মুজাহিদ ভাই ছাত্রবিষয়ক দায়িত্বশীল। তিনি আমাকে শিবিরে থাকতে বলেছেন। সারাজীবন আন্দোলনের আনুগত্য করে আসলাম। এই শেষ দিকে এসে তো আনুগত্যের খেলাফ করতে পারিনা।" পরিষদের দুইজন সদস্য বিষয়টি নিয়ে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন।

কিছু বিষয়ে তাদের অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ছাত্রজীবন শেষ করাটাই ভালো মনে করেন। বিয়ে করার পর পুরোপুরি দায়িত্বে মনোযোগ দেয়ায়ও কঠিন। সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদের কিছু ঘটনা তাদের জানা থাকায় তারা আশংকবোধ করেন যে রেজাউল বিয়ে করলেও অনুরূপ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হবে। সংগঠনের বায়তুলমাল থেকে কেন্দ্রীয় সভাপতির জন্য বেশ টাকা পয়সা খরচ করতে হবে। মাসুদ তার স্ত্রীসহ হজ্ব করতে গিয়ে সংগঠনের বায়তুলমালের মোটা অংক ব্যয় করেছে। তাছাড়া আরও কিছু বিদেশ সফরেও টাকা পয়সা সংগঠন থেকে খরচ করে একটা খারাপ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। আর রেজাউল তো ইতিমধ্যে আসবাবপত্র কিনা, বাসা ভাড়ার জন্য টাকা বায়তুলমাল থেকেই নিয়েছে।

এহেন অবস্থায় কেউ কেউ পরামর্শ দেয় বৃহত্তর সংগঠন যদি একান্তই আপনাকে থাকতেই বলে তাহলে বিয়ের ব্যাপারটি পিছিয়ে দেন। কিন্তু রেজাউল তাতেও রাজী ছিলেন না। ওদিকে পরিষদের যে দুইজন ভাই মুজাহিদ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন তারাও তাকে বুঝাতে ব্যর্থ হন। বরং উল্টা ধমক খেয়ে চলে যান। এসময় রেজাউলের ব্যাপারে কিছু অভিযোগ সম্বলিত একটি চিঠি শাখা সভাপতিদের মাঝে চলে যায়। এটা জানার পর কার্যকরী পরিষদ বৈঠকে বসে এবং শিশির মনির চেষ্টা করে, চিঠিগুলো না পড় ধ্বংস করতে। অথবা, কেন্দ্রে ফেরত পাঠাতে *(যাতে কেন্দীয় সভাপতি)* নির্দেশ দেন।

কেন্দ্রীয় সভাপতির মুহাসাবা হয়। তিনি কান্নাকাটি করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন, সংশোধন হবেন বলে। পরিষদ সদস্যরা বিষয়টা মেনে নেয় এই মনে করে যে বৃহত্তর আন্দোলন হয়তো চিন্তাভাবনা করেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং আমাদেরও মেনে নেয়া উচিত। তারা সবাই সম্মেলনের আয়োজনে মনোনিবেশ করে।

এদিকে আমার সরলতা বা আন্তরিকতার কারণে আমি একদিন আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে মুজাহিদ ভাই রেজাউলের ছাত্রজীবন অব্যাহত রাখার পরামর্শ দিয়েছে; এটা একটা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আমি ছাত্রবিষয়ক কমিটির সদস্য ছিলাম। এবং উপরন্তু প্রাক্তনদের মধ্য থেকে শিবিরের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী শিবিরের পরিষদের সদস্যও ছিলাম। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে আমার উদ্বেগ ছিলো তা আমীরে জামায়াতকে জানিয়ে ছিলাম।

তিনি বললেন, তোমরা ছাত্রবিষয়ক কমিটিতে আলাপ কর। আমি বলেছিলাম, বৈঠক না ডাকলে তো আলাপ করা যায় না। মুজাহিদ ভাই ছিলেন এ কমিটির আহ্বায়ক। মনে মনে অপেক্ষা করেছিলাম যে, বৈঠক ডাকলে কথা বলবো। কিন্তু কোন বৈঠক এতকিছুর পরও তিনি ডাকেননি।

এর মধ্যে একদিন জামায়াতের নির্বাহী বৈঠক চলার এক ফাঁকে চায়ের বিরতিতে আমি আবার বলেছিলাম নিজামী সাহেবকে লক্ষ্য করে যে, শিবির সভাপতি রেজাউলের ছাত্রজীবন অব্যাহত না থাকলেই তো ভালো হতো। কারণ ১ বছর সেক্রেটারি জেনারেল এবং এক বছর কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর এখন চলে গেলেই তো ভালো হতো। তাছাড়া কিছু কথাবার্তা আছে তার ব্যাপারে। তখন প্রায় একই সুরে দুই নেতা বললেন, দুই বছর তো সবাই থাকে। তাছাড়া সভাপতি থাকা অবস্থায় বিয়ে তো অনেকেই করেছে। এ ব্যাপারে তাদের বেশ উত্তেজিত মনে হলো। আমি আর কথা বাড়াইনি।

যাহোক, শেষ পর্যন্ত সরকারের নানা চক্রান্ত ও বাধার মুখে চীনমৈত্রী হলে শিবিরের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমাকে অনুরোধ করা হয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বাণী এবং বিএনপি থেকে একজন প্রতিনিধি যাতে সম্মেলনে আসেন তার ব্যবস্থা করতে। আমি যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করে দেই।

সম্মেলনের দিন সেখানে হাজির হয়ে দেখতে পেলাম যখন মঞ্চে ডাকা হলো তাতে আমরা জামায়াতের চারজন, আমীরে জামায়াত, সেক্রেটারি জেনারেল, মহানগরী আমীর রফিকুল ইসলাম খান এবং আমি। বক্তৃতার জন্য যে ধারাক্রম ঠিক করা হয়েছে সেটাও আমার কাছে প্রশ্নবোধক মনে হলো। মাওলানা ইসহাক এবং বিএনপির প্রতিনিধিরও পরে ঢাকা মহানগর আমীরকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান জানানো হলো। এসব কিছুই আমার কাছে অস্বস্তিকর লাগছিলো। সাধারণত উদ্বোধনী অধিবেশনে জামায়াতেরই চারজন নেতা কখনও বক্তব্য রাখার ঐতিহ্য আগে ছিল না। আলেম হিসাবে সাঈদী সাহেবকে দিয়ে কিছু কথা বলানো যেত। তাছাড়া অন্যান্য নায়েবে আমীরগণও শ্রোতার সারিতে বসা।

আমার সেদিন মালয়েশিয়া সফরে যাবার Programme ছিলো। তাই আমার সময় আসলে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে আমি বিদায় নিয়ে বাসায় চলে এলাম, বিমান বন্দরে যাবার জন্য। সন্ধ্যায় ফ্লাইট ধরার জন্য বিকেলে বিমান বন্দরে গেলাম। আমাকে আটকিয়ে দেয়া হলো Immigration-এ। আমি ফেরার পথে জানতে পারলাম বিরাট বিপ্লব ঘটে গেছে। শিশির মোহাম্মদ মনিরকে সেক্রেটারি জেনারেল না করে সর্বকনিষ্ঠ পরিষদ সদস্য ডা: আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে সেক্রেটারি জেনারেল ঘোষণা দেয়া হয়েছে। শুনলাম এতে পরিষদ সদস্যরা খুব কান্নাকাটি করেছে এবং একজন অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিল।

সম্মেলনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যারা ছিলেন এমন কয়েকজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট থেকে বিস্তারিত বর্ণনা শুনলাম। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব আলী আহসান মুজাহিদ এবং ঢাকা মহানগরী আমির রফিকুল ইসলাম খান সারাক্ষণ ছিলেন। পরিষদ সদস্যদের সাথে পরামর্শের পর কেন্দ্রীয় সভাপতি রেজাউল করিম মাত্র এক/দেড় মিনিটের মধ্যে পরিষদ সদস্যদের সামনে নতুন সেক্রেটারি জেনারেলের নাম ঘোষণা করেই উপস্থিত জামায়াতের উল্লেখিত দুই নেতা সহ মঞ্চে আসেন এবং সদস্যদের সামনে নতুন সেক্রেটারি জেনারেলের নাম ঘোষণা করেন। মঞ্চে কান্নার রোল পড়ে যায়। নতুন সেক্রেটারি জেনারেল খুব বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েন। কারণ সাধারণতঃ নতুন সেক্রেটারি জেনারেলের নাম ঘোষণার পর সম্মেলন কক্ষে আলহামদুলিল্লাহ বলার পর শ্লোগান উঠে। এবার এমন কিছু হলো না।

প্রথামত পরিষদ সদস্যগণ নতুন সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে বুক মিলান। এবার শুধু বিদায়ী সেক্রেটারি জেনারেল শিশির মোহাম্মদ মনির এসে নবনিযুক্ত সেক্রেটারি জেনারেল ডা: আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সাথে বুক মিলান। শুনেছি শিশিরকে নিয়েই ছিল যত আবেগ আর কান্না।

যাহোক, শিশির একটি সংক্ষিপ্ত এবং আবেগময়ী বক্তব্য দিয়ে বিদায় নেন। সম্মেলন কক্ষে সদস্যরাও কান্নায় ভেঙে পড়ে। অনেকটা ভগ্ন হৃদয়ে সদস্যরা সম্মেলনস্থল ত্যাগ করে। আল্লাহর ইচ্ছায় তারা ধৈর্য ধারণ করে। জানুয়ারীর ৪ তাং নির্ধারিত দিনে কেন্দ্রীয় সভাপতির বিবাহ সম্পন্ন হয়।

কেন্দ্রীয় সভাপতির থেকে যাওয়াকে মেনে নিলেও শিশির মোহাম্মদ মনিরকে ওভাবে বিদায় দেয়ায় এবং তার বিরুদ্ধে ময়দানে কিছু নেতিবাচক কথা যা ছিল সম্পূর্ণ অসত্য তা ছড়ানোর ফলে ময়দানে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়।

ভিতরের আরেকটা বড় কারণ পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলে। কার্যকরী পরিষদের শতকরা একশত ভাগ সদস্য শিশির মনিরকেই সেক্রেটারি জেনারেল রাখার পরামর্শ দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সভাপতি অবশ্য কারও কারও নিকট তিনটি নাম চান। কেউ কেউ ২/৩টি নাম সাজেস্ট করে। তবে এক নম্বরে ছিল শিশিরের নাম। এমতাবস্থায় পরিষদের সদস্যদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেই কেন্দ্রীয় সভাপতি, সেক্রেটারি জেনারেলের নাম ঘোষণা করেছেন বলে তাদের ধারণা হয়।

উপরন্তু সারাদিন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল এবং মহানগরী আমীরের সম্মেলন স্থলে অবস্থান করাটাকে তারা তখন সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। পরিষদ সদস্যগণ দেখতে পান সুস্পষ্টভাবে, কেন্দ্রীয় সভাপতি, সেক্রেটারি জেনারেল মনোনয়নের ক্ষেত্রে শিবিরের সংবিধান লংঘন করেছেন। অথবা তিনি বাইরের বিশেষ করে কতিপয় জামায়াত নেতার চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করেছেন।

শিবিরের সংবিধানের একটি ধারায় বলা হয়েছে, কার্যকরী পরিষদের সাথে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় সভাপতি একজনকে সেক্রেটারি জেনারেল মনোনয়ন দিবেন। অপর একটি ধারায় আরো সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, দৈনন্দিন কাজ ও জরুরী পরিস্থিতি ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতি কার্যকরী পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী চলবেন। সুতরাং সেক্রেটারি জেনারেল মনোনয়ন শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতির একক কোন সিদ্ধান্ত হতে পারে না। আর একক সিদ্ধান্ত হলে পরামর্শ নেয়ার কথা বলা হতো না। আর পরামর্শ নিয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত দেবারও সুযোগ নেই।

আমি যখন কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলাম তখন পরিষদ সদস্যদের অধিকাংশ যে পরামর্শ দিয়েছেন তার আলোকেই সেক্রেটারি জেনারেল মনোনয়ন দিয়েছি। কোনো প্রাক্তন সভাপতি বা জামায়াত নেতা এসব ব্যাপারে কখনও আলাপ আলোচনাও করেননি। এমনকি, পরিষদের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমি সব সময় সভাপতিদের বলেছি, অধিকাংশ ভাই যার ব্যাপারে আস্থা রাখেন এমন একজন ভাইকেই সেক্রেটারি জেনারেল করতে হবে এটাই সংবিধানের মূল চেতনা। এখানে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেবার তেমন কোন সুযোগ নেই। জামায়াতের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা নাকি ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সভাপতির বিরুদ্ধে সর্বত্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সদস্যদের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করে লিখিত আবেদন জানায়। পরিষদ সদস্যদের অধিকাংশ লিখিতভাবে কার্যকরী পরিষদের বৈঠক ডাকার জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতিকে অনুরোধ জানায়। কিন্তু জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল এবং মহানগরী আমীর এবং ২/৩ জন প্রাক্তন সভাপতির পরামর্শে কেন্দ্রীয় সভাপতি বৈঠক না ডেকে কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন করার জন্য তার ইচ্ছামত তালিকা তৈরি করে নির্বাচনের চেষ্টা চালান।

এমতাবস্থায় ১২ জন পরিষদ সদস্য জামায়াতের আমীরের সাথে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। কয়েক ঘণ্টা কেন্দ্রীয় অফিসে অবস্থান করায় এক পর্যায়ে আমীরে জামায়াত তাদের কথা শুনতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হন। ভালোই আলোচনা হয়। তারা জানার চেষ্টা করেন জামায়াত কোন নির্দেশ দিয়েছে কিনা।

আমীরে জামায়াত জানিয়ে দেন, "শিবিরের ব্যাপারে জামায়াত কোন হস্তক্ষেপ করে না। রেজাউলকে থাকার জন্যও জামায়াত বলেনি। তোমরা তোমাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চলো।"

শিবিরের পরিষদ সদস্যগণ তখন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংকট উত্তরণের জন্য পরিষদ ডাকা ছাড়া কোন পথ নেই বলে সভাপতিকে চাপ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে ২৪/২৬ জন পরিষদ সদস্যও কেন্দ্রীয় সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করে। এদিকে CP, শাখা সেটআপ করার চেষ্টা চালান। কিন্তু তিনি কোথাও যেতে পারছিলেন না। নতুন সেক্রেটারি জেনারেল কিছু এলাকায় গিয়ে শাখার নির্বাচন করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, কুমিল্লা, মোমেনশাহীর বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ সমূহ, বুয়েট, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বলতে গলে CP-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পরিস্থিতি খুবই জটিল আকার ধারণ করে।

এক পর্যায়ে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের পরামর্শ অনুযায়ী আমীরে জামায়াত সকল প্রাক্তন সভাপতিদের একটি বৈঠক ডাকেন। সেখানেও তিনি সংকট সৃষ্টির জন্য জামায়াতের কারও কারও বক্তব্য ও ব্যাখ্যাকে দায়ী করার চেষ্টা করেন। আমি নির্বাহীতে CP-এর ছাত্র জীবন শেষ হওয়া না হওয়া নিয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তাব দেই মর্মে তথ্য প্রদান করেন; যা সঠিক ছিল না। কিন্তু আমি অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে তার কথার প্রতিবাদ জানাইনি।

শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত দেন, "নির্বাচিত সভাপতির পক্ষে আমাদের দাড়াতে হবে। যদি এটা ইসলামী আন্দোলন হয়ে থাকে তাহলে একজন ব্যক্তিকে সেক্রেটারি জেনারেল করা হয়নি, শুধু এ কারণে এতটা প্রতিক্রিয়া কেন হবে?" *(এ পর্যায়ে তিনি)* শিবিরের কার্যকরী পরিষদে সবাইকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়।

২৮ শে জানুয়ারী ২০১০ আল ফালাহ মিলনায়তনে বৈঠক শুরু হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত বৈঠকে থাকার পর আমি আমীরে জামায়াতের সাথে যোগাযোগ করে সাতক্ষীরায় জামায়াতের প্রতিনিধি সম্মেলনে যাবার অনুমতি চাই। ৫ হাজার প্রতিনিধির এ সম্মেলনে না গেলে জেলা জামায়াত দারুণ বেকায়দায় পড়বে। ইতোমধ্যে তাদের যাবতীয় আয়োজন খরচাপাতি সম্পন্ন *(হয়েছে)* এবং তারিখ পিছানোর কোন সুযোগ নেই। অবশেষে অনেকটা জোর করেছি অনুমতি নিলাম। তবে যাবার আগে আমার মতামত দিয়ে গেলাম। আমি বললাম, "যা কিছু করার এখানেই অর্থাৎ পরিষদের অধিবেশনে গঠনতন্ত্র বা সংবিধান অনুযায়ী সমাধান করতে হবে। এর বাইরে এটা আর নেয়া যাবে না।"

২৮ শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় রওয়ানা করে যশোহরে রাত কাটালাম এবং সকালে উঠে সাতক্ষীরা রওয়ানা করলাম। সাতক্ষীরার কর্মসূচী ৪টার মধ্যে শেষ করে যশোর আসলাম।

যশোরে আরেকটি শিক্ষাশিবিরে এক ঘণ্টা আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর শেষ করে ঢাকায় রওয়ানা করলাম এবং রাত ১০টায় ঢাকা পৌছে গেলাম। পরদিন শুনলাম, বৈঠক চলবে তাই অফিসে গেলাম। প্রথমে প্রাক্তনদের কয়েকজনকে নিয়ে একটি বৈঠক করলেন মুজাহিদ সাহেব। একটি কমিটির কথা মেনে নেয়া যায়, এ প্রস্তাব গত রাতে প্রফেসার নাজির সাহেব নাকি দিয়েছিলেন। এরপর সকল প্রাক্তন সভাপতির বৈঠকে কেন্দ্রীয় সভাপতি কিছু বক্তব্য রাখেন।

তিনি আবেগ দিয়ে বলেন, "যা কিছু হয়েছে আমি তো একা করি নাই। আপনাদের কারো সাথে পরামর্শ করেই করেছি। এখন সমস্ত চাপ ও দোষ আমার উপর। আপনারা কেউ কিছু বললেন না।" এর আগে তিনি নাকি কিভাবে এসব হলো তা সবিস্তারে বলতে চেয়েছিলেন এবং দরকার হলে দায়িত্ব থেকে সরে দাড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু মুজাহিদ সাহেব নিষেধ করেন। আগের রাতে নবনিযুক্ত সেক্রেটারি জেনারেল ডা: আব্দুল্লাহ মামুন পদত্যাগের ঘোষণা দিলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়।

যাহোক আবার কার্যকরী পরিষদের বৈঠক শুরু হয়। এই বৈঠকে শিশির মনিরকেও উপস্থিত করা হয়। দু'একজন বক্তব্য রাখার পর শিশির মনির সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতিদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় সভাপতিকে সহযোগিতা করে সংকট উত্তরণের জন্য এবং কমিটির প্রস্তাব মেনে নিয়ে সবাই একযোগে কাজ করতে বলেন। পরিস্থিতি পালটে যায়। শিবির সভাপতি কমিটির নাম প্রস্তাব করেন– নাজির আহমদ, রফিকুল ইসলাম খান এবং ডা: আব্দুল্লাহ তাহের। পরিষদের সদস্যদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দিয়ে আমার এবং সাইফুল আলম খানের নাম কমিটিতে সংযুক্ত করা হয়। আমীরে জামায়াতের পরামর্শেই রেজাউল প্রথমোক্ত তিন জনের নাম বলেছিলেন। ৫ সদস্যের কমিটি শীঘ্রই সংকটের কারণ ও সমাধান নির্দেশ করে রিপোর্ট দিবেন। তবে ইতিমধ্যে setup করে ফেলার এবং স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মতামত দেন আহমদ শিহাবুল্লাহ। তার এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। দোয়া করে বৈঠক শেষ হয়।

কমিটির পর পর দু'দিন বৈঠক হয় সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় আমার অফিস কক্ষে। এরপর আরও দুইতিন দিন বৈঠক হয় ধানমন্ডিতে মীর কাশিম সাহেবের অফিসে। আমরা ২৬ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। এসময় মহানগরী আমীর কমিটিতে অব্যাহতভাবে সময় দিতে অপারগতা প্রদর্শন করেন এবং কাজ অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারুক হত্যাকাণ্ডের অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটায় শিবির সভাপতি এবং আরও কার্যকর পরিষদ সদস্যের ঢাকায় কমিটির সামনে হাজির হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

ওদিকে শিবির সভাপতি, পরিষদের নির্বাচন করার জন্য কমিটির আহ্বায়কের নিকট লিখিত একটি আদেশ চেয়ে চাপ দিতে থাকে। আমীরে জামায়াতও পরিষদের নির্বাচন করার জন্য কমিটির পক্ষ থেকে লিখিত একটা কিছু দিতে বলেন। নাজির সাহেব কমিটির বৈঠকে বলেন, "যেহেতু আমরা নির্বাচন বন্ধ করতে বলিনি, তাই আমাদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন কিছু বলার দরকার নেই। শিবির সভাপতি যদি নির্বাচন করতে পারেন এটা তার ব্যাপার।" পরে এটাই ঠিক হয় যে কমিটি লিখিতভাবে নির্বাচন করার কোন নির্দেশ দিবে না এবং এটা আমীরে জামায়াতকে জানিয়ে দেয়া হয়।

এর মধ্যে একদিন জানতে পারলাম অধ্যাপক নাজির আহমদ সাহেব কমিটির কাজ স্থগিত করে দিয়েছেন। আমি নিজে তার বাসভবনে গিয়ে দেখা করলাম এবং খোলামেলা কিছু কথা বললাম। কারণ, এটা আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে এই সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলের পক্ষ থেকে। তখনও আমার নিকট এটা স্পষ্ট হয়নি যে আমীরে জামায়াতের সমর্থন আছে এর পিছনে। আমি নাজির সাহেবকে বললাম, "সমস্যা সৃষ্টি করেছেন মুজাহিদ সাহেব বা জামায়াত। ছাত্রদের যা সাক্ষাৎকার নিয়েছি, এখন কেন্দ্রীয় সভাপতির বক্তব্য পেলেই আমরা রিপোর্ট দিয়ে দিতে পারি। আমার নিকট এটা পরিষ্কার রেজাউলকে রাখা এবং শিশিরকে সংগঠন থেকে out করা সবটাই হস্তক্ষেপ করে সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে।" পরবর্তী সময়ে নাজির সাহেব যে ভাষায় আমার বক্তব্যকে নির্বাহী পরিষদে পেশ করেন তাতে আমি হতবাক ও বিস্মিত হয়ে পড়ি।

ইতিমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটে। শিবিরের ২৬ জন পরিষদ সদস্য আমীরে জামায়াতের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য চার/পাঁচ ঘণ্টা জামায়াত অফিসে অবস্থান করে। কিন্তু রফিকুল ইসলাম খানদের পরামর্শে আমীরে জামায়াত তাদের সাথে কোন সাক্ষাৎকার দেননি। রাগে দুঃখে ক্ষোভে এই সদস্যরা পদত্যাগপত্র লিখে দিয়ে চলে যায়। তারা যদি আন্তরিক না হতো তাহলে জামায়াতের আমীরের নিকট আসতো না। যদি শিবিরের ক্ষতি করার ইচ্ছা বা পরিকল্পনা থাকতো অথবা নিজেদের নেতৃত্বের খাহেশ থাকতো, *(তাহলে)* প্রেসক্লাব বা শিবির অফিসে তারা সংবাদ সম্মেলন ডেকে অন্য কিছু করতে পারতো এবং শিবিরটাই দখল করে নিতে পারতো। কারণ ৮০% ভাগের বেশি সদস্য তাদের সাথে ছিল।

নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের চাপ, লিখিত পরামর্শ ও জোর লবিং এর ফলে শেষ পর্যন্ত নিজামী সাহেব বৈঠক ডাকলেন। নাজির আহমদ সাহেব কমিটির কাজ বন্ধ রেখেছেন। শিবির সভাপতি নিজ পছন্দ অনুযায়ী তালিকা তৈরী করে পরিষদের নির্বাচনের তৎপরতা চালাচ্ছেন। জামায়াত অফিস থেকে সবকিছু মনিটরিং করা হচ্ছে। জামায়াতের ৭৮টি জিলার আমীরকে শিবিরের পরিষদ নির্বাচনে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঢাকা থেকে মাইক্রোবাস ভাড়া করে ব্যালট দিয়ে লোক পাঠানো হয়েছে। জিলা আমীরগণ শিবির সদস্যদের ডেকে ডেকে ভোট দিতে বলছেন এবং জানাচ্ছেন, এটা আমীরে জামায়াতের নির্দেশ। শিবিরের নির্বাচন কিভাবে হয় জামায়াত নেতারা কোনদিন তা

জানতেনও না। শুনলাম এক জায়গায় একজন আমীর threat করে বলেছেন, "নির্বাচনে যদি ভোট না দাও তোমাদের আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দিব।" আরেক জায়গায় শুনলাম, জামায়াত ব্যালট বাক্স নিয়ে পাহারা দিচ্ছে এবং সদস্যদের ধরে ধরে এনে ভোট দেয়ানো হচ্ছে।

ঢাকায় ভোট আনানোর পর একজন সাথী এবং জামায়াতের থানা পর্যায়ের নেতারা ভোট গণনার কাজে সহায়তা করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, কুমিল্লা, মোমেনশাহী, গাজীপুর, খুলনা, বরিশালসহ বড় বড় শাখার সদস্যরা নির্বাচনে ভোট দানে বিরত থাকে। ৪২০০ সদস্যের মধ্যে মাত্র ১১০০ সদস্যের ব্যালট পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত জোড়াতালি দিয়ে একটি নির্বাচন করা হয়।

জামায়াতের নির্বাহী পরিষদের বৈঠক শিবির ইস্যুতে তিনদিন পর্যন্ত চলে। দুইদিন পর্যন্ত আমি সবার বক্তব্য শুনি এবং তৃতীয়দিন আমার বক্তব্য পেশ করি। আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখি। আমি শুরু করি, "... জামায়াতে শুরায়ী নেজাম ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। অনেক বড় বড় কাজ পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত ছাড়াই করা হয়েছে। এক বা দুই ব্যক্তির সিদ্ধান্তে অনেক কিছু হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সভাপতির ছাত্রজীবন থাকা না থাকার ব্যাপারে যদি রেজাউলের কথা সঠিক হয় তাহলে জামায়াত তাকে থাকতে বাধ্য করেছে। আর যদি জামায়াত তাকে না বলে থাকে তাহলে সে পরিষদ সদস্যদের সাথে অসত্য কথা বলেছে। তবে রেজাউল নিজে আমাকে বলেছে, মুজাহিদ ভাই আমার ছাত্রজীবন অব্যাহত রাখতে বলেছেন।

সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে সংবিধান লংঘন করা হয়েছে এটা আমার দৃঢ় মত।"

এ সম্পর্কে আমি তাফহিমুল কুরআন, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শিবিরের সংবিধানসহ দলিল উপস্থাপন করে বলি, "পরামর্শ গ্রহণ করার পর পরামর্শের বিপরীত সিদ্ধান্ত আল্লাহর নবীও নেননি। বরং নিজের মত secrefice করে সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শিবিরের পরিষদ সদস্য যারা ভিন্নমত পোষণ করেছে তারা আন্দোলনের কল্যাণের জন্যই করেছে। শিশিরের মত ভালো ও যোগ্য একজন ছেলের সার্ভিস শিবির পেলে শিবিরের গতি আরও বৃদ্ধি পেত। তারা মনে করে তার যোগ্য নেতৃত্ব থেকে শিবিরকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। শিবির সাম্প্রতিককালে যে ইতিবাচক অবদান রাখছে তার পিছনে ছিল শিশির মোহাম্মদ মনির। শিবিরকে তার নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করাই গোটা পরিষদ আহত হয়েছে। এরা যদি নেতৃত্ব প্রয়াসী হতো তাহলে আমীরে জামায়াতের নিকট এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে বসে থাকতো না। তাদেরকে আন্দোলনের দুশমন এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী বলে চিহ্নিত করার কোন যুক্তি নেই।

আমি মনে করি হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে জামায়াতই সমস্যা সৃষ্টি করেছে। অথচ এটার কোন প্রয়োজন ছিল না।

আমি কেন্দ্রীয় সভাপতি সম্পর্কে মন্তব্য করে থাকতে পারি। কারণ এমন পরিস্থিতি হলে আমি অনেক আগেই ইস্তফা দিয়ে চলে যেতাম। যেখানে গোটা পরিষদ CP-এর বিরুদ্ধে সদস্যরা অনাস্থা দিয়েছে সেখানে জোর করে নেতৃত্ব ধরে রাখার কোন অর্থ থাকে না। কেউ কেউ এটাকে খোলাফায়ে রাশেদার সাথে তুলনা করে যা খুবই হাস্যকর। অর্থাৎ নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়ার বিপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে।

সবচেয়ে নির্লজ্জ ব্যাপার হচ্ছে, শিবিরের নির্বাচনে জামায়াতের জড়িয়ে পড়া। এটা সম্পূর্ণ অনৈতিক, অবৈধ ও সংবিধানবিরোধী; এবং অন্যায় হয়েছে। ইতিহাসে এমন ঘটনা আর ঘটেনি। আরও হাস্যকর *(ব্যাপার হলো)* এই নির্বাচনকে স্বৈরাচারী শাসকদের মত সুষ্ঠু এবং সুন্দর নির্বাচন বলে অভিহিত করা।

কমিটির কাজ বন্ধ করে দেয়া অন্যায় হয়েছে এবং আমানতের খেয়ানত হয়েছে। আমাদের মধ্যে আজ আস্থা ও বিশ্বাসের সংকট দেখা দিয়েছে। যা কোনমতেই কাম্য নয়। আমি শিবিরের সাথে সবচাইতে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এখনও পর্যন্ত তাদের পরিষদের সদস্য। জামায়াত অফিসে এত কিছু তৎপরতা চলছে, জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও গোটা জামায়াত ...। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি একজন স্টুপিড। কেননা আমার সাথে কোন বিষয়েই সেক্রেটারি জেনারেল বা ছাত্রবিষয়ক কমিটির ভাইয়েরা আলাপ বা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করেন না।

আমাদের জুনিয়র ভাইদের সামনে আমার ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করেন। মহিলা জামায়াতের পক্ষ থেকে ব্রিফিং দেয়া হয়েছে যে, আমি নাকি দল ভাঙ্গার চেষ্টা করছি। কেউ কেউ মন্তব্য করছেন যে সময়টা ভালো না, না হলে এদেরকে সংগঠন থেকে বের করে দিতাম।

আমার মতে, কমিটির কাজ শেষ করে শিবিরের গঠনতন্ত্র মুতাবেক পদক্ষেপ নেয়া ছাড়া কোন সমাধান নেই।

জামায়াত তার বিঘোষিত যে নীতিমালা তা থেকে সরে গেছে। জামায়াতের বক্তব্য হলো, শিবির একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। জামায়াতের কোন অঙ্গ সংগঠন নয়। বাস্তবেও তাই। জামায়াতকে এই নীতির মধ্যেই থাকতে হবে। হস্তক্ষেপ করা যাবে না। হস্তক্ষেপ করলেই সংকট সৃষ্টি হয়। বর্তমান সংকট তারই প্রমাণ। শিবিরকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবেই বলতে দিতে হবে।"

আমার বক্তব্যের পর সেক্রেটারি জেনারেল মুজাহিদ সাহেব বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি আমার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান। তিনি বলেন,

"আমীরে জামায়াতের নির্দেশ ছাড়া আমি কোন একটি কাজও করি নাই। শিবিরের নির্বাচনে অসহযোগিতা করার ব্যাপারটা ছিল আমীরে জামায়াতের নির্দেশ। কামারুজ্জামান সাহেব এটা অবৈধ, অসাংবিধানিক ও অন্যায় আখ্যায়িত করে শুধু আমীরে জামায়াতের নির্দেশ ও আনুগত্যের খেলাফ কাজই করেননি; বরং এর মাধ্যমে তিনি আমীরে জামায়াতের অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। আমীরে জামায়াতের উপর জুলুম করেছেন। এই বক্তব্য প্রত্যাহার না করলে তিনি যে দায়িত্ব পালন করছেন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল *(হিসেবে)* সে দায়িত্বেও *(তিনি)* থাকতে পারেন না। এটা তাকে প্রত্যাহার করতে হবে।"

আমার তখন মনে হয়েছিলো, আমার এখনই উঠে রওয়ানা দেয়া উচিত। এ বৈঠকে আর থাকা উচিত নয়। কারণ, বর্তমান এমনটি করলে দেশের মানুষ ছিঃ ছিঃ করবে এবং আমাদের প্রজ্ঞা নিয়ে হাসাহাসি করবে। এমনিতেই ছাত্রশিবিরের কার্যকরী পরিষদের ২৬ জন সদস্যের পদত্যাগের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর রাজনৈতিক শুভাকাংখী মহল, বিএনপিসহ সমমনা দলের নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং সমস্যাটা মিটিয়ে ফেলতে অনুরোধ করেছেন।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, "২৬ জন ছেলে কেন পদত্যাগ করলো, ওরা তো ভালো ছেলে। জামায়াত কেন তাদের বুঝাতে পারলো না? এটা কি এর জন্য একটা সময় হলো? অতি তাড়াতাড়ি আপনারা বিষয়টা নিষ্পত্তি করে ফেলুন।" ঐ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যাদের সাথেই দেখা হয়েছে তারা সবাই খোঁজ নিয়েছেন শিবিরের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক বিষয়টা নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা। কারণ তারা সবাই শিবিরের ব্যাপারে খুব আস্থা রাখেন এবং সংগঠনটি নেতা-কর্মীদের ব্যাপারে খুব দৃঢ় আশাবাদী।

সুতরাং বাইরের লোকেরা কি মনে করবে এজন্য আমি চরম ধৈর্যের পরিচয় দিলাম।

নির্বাহী পরিষদে আবু নাসের ভাইয়ের দৃঢ় এবং সাহসী বক্তব্যের মাধ্যমে আমার কাছে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হলো যে মুজাহিদ ভাই পরিকল্পিতভাবেই কাজটা করেছেন। প্রথমে রেজাউলের ছাত্রত্ব অব্যাহত রেখেছেন এ জন্য যে সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সভাপতি ছাত্রজীবন অব্যাহত রাখলে তিনিই নির্বাচিত হন। যদি রেজাউলের ছাত্রজীবন শেষ করা হতো তাহলে নিশ্চিতভাবে সেক্রেটারি জেনারেল শিশির মোহাম্মদ মনির সভাপতি নির্বাচিত হতো। এভাবেই শিশির যাতে সভাপতি হতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। তাকে সেক্রেটারি জেনারেল রাখলে সংগঠনে তার গুরুত্ব ও প্রাধান্য থেকেই যাবে। তাই তকে সে পদে রাখার ঝুঁকি না নিয়ে নতুন সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত করে শিশিরকে শিবির থেকে out করা হয়েছে।

টেলিফোনে মুজাহিদ ভাই নাসের ভাইকে জানিয়েছেন যে তাকে *(অর্থাৎ, শিশির মোহম্মদ মনিরকে)* সেক্রেটারি জেনারেল করা হয়নি, কারণ তার সদস্য পদই রক্ষা করা যাচ্ছিল না। কি তাজ্জব ব্যাপার! এই প্রথম কথাটা শুনলাম।

আমীরে জামায়াত হিসাবে নিজামী সাহেবের concluding বক্তব্যে বেশ কিছু বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমার সমালোচনা করলেন। তার বক্তব্য থেকে আরও পরিষ্কার হলো যে তিনি সব ব্যাপারেই অবহিত ছিলেন এবং তারা শলা-পরামর্শ করেই এতবড় অন্যায় হস্তক্ষেপটা করেছেন। আমি খুবই হতাশ ও বিমর্ষ হয়ে গেলাম। ঐ সময় আমার চেহারাতেও ঐ বিমর্ষ ভাব ফুটে ওঠেছিল বলে আমার অনেক বন্ধু আমাকে সতর্ক করেছেন। ঐদিন আমি বুঝতে পারলাম যে ৫ ঘণ্টা জামায়াত অফিসে ২৬ জন শিবির পরিষদ সদস্য অপেক্ষা করার পরও নিজামী সাহেব কেন তাদের সাথে দেখা দেন নাই এবং কথা বলেন নাই।

তিনি এদেরকে বিশৃংখলাকারী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়েও তা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এক পর্যায়ে বলে ফেলেন যে "যুদ্ধাপরাধী বিচারের আন্দোলন চলছে; যদি একজনেরও বিচার হয় তাহলে তো আমার উপরই তা বর্তাবে। এমতাবস্থায় সংগঠনটা কাদের হাতে আমরা রেখে যাচ্ছি। আমি কোনক্রমেই ঐ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কোন বৈশিষ্ট্য দেখতে পাইনি।" তিনি তাদের সিদ্ধান্তকেই সঠিক বললেন এবং 'নির্বাচিত সভাপতি রেজাউলের পক্ষেই জামায়াত অবস্থান নিয়েছে' এটাই ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বত্র বলতে হবে *(বলে বললেন)*।

এখানে উল্লেখ্য যে ঐতিহাসিক তিনদিন ব্যাপী নির্বাহীর বৈঠকটি শেষদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় রাখা হয়েছিল। সকালে শিবিরের গোজামিলের নির্বাচনে গঠিত পরিষদের বৈঠকে দুপুরের দিকে নিজামী সাহেব গিয়ে বক্তব্যদান করে তাদের আশীর্বাদ করে আসেন। শিবিরের পরিষদের নির্বাচন সম্পূর্ণ করে তার ফলাফল সম্পর্কে *(জামায়াতের)* নির্বাহী *(পরিষদকে)* অবহিত করা হয়। মাওলানা ইউসুফ, মাওলানা আব্দুস সোবহান কেন তিনদিন আমাদের বৈঠকে ব্যস্ত রাখা হলো তা নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

নিজামী সাহেব জবাব দিয়েছেন, "শিবিরের সাথে এই বৈঠকের কি সম্পর্ক? তারা তো স্বতন্ত্রভাবে কাজ করছে, তাদের নির্বাচন তারা করেছে?" *(অথচ, আমার মতে)* এটাই যদি সত্য হবে তাহলে তিনিদিনব্যাপী কেন শিবির এজেন্ডা নিয়ে *(জামায়াতের নির্বাহী পরিষদে)* আলোচনা হচ্ছে?

নিজামী সাহেবের এই দ্বিমুখী চরিত্রে আমি একেবারেই ভেঙ্গে পড়লাম। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সংক্ষেপে বললেন, "শিবিরের কার্যকরী পরিষদের ফলাফলটা জামায়াতের নির্বাহী বৈঠকের পর ঘোষণা করলে তো আসমান ভেঙ্গে পড়তো না।" তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, "যেহেতু সঠিকভাবে ভোট হয়নি। কেন্দ্রীয় সভাপতির ব্যাপারটাকে মেনে নিয়ে পরিষদের বর্তমান ঘোষিত ফলাফল বাতিল করে fresh নির্বাচন করে সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা হতে পারে।" নাসের ভাই প্রস্তাব দিলেন, "৬২ সাল থেকে দেখে আসছি, কোনদিন জামায়াত, শিবিরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নাই। বর্তমান সভাপতির পক্ষে সংগঠন নৈতিকভাবে চালানো সম্ভব হবে না। এক মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতির নির্বাচনের ব্যবস্থা করে সংগঠনকে বাঁচাতে হবে।

নিজামী কোন মতামত এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা না করে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত দিয়ে বৈঠক শেষ করেন।

তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে নাসের ভাই বললেন, "সেক্রেটারি জেনারেল যেসব কথা কামারুজ্জামান সম্পর্কে বলেছেন তাতে তো তিনি জামায়াতের সদস্য থাকতে পারেন না এবং আমীরে জামায়াত মির কাশিম আলী সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে আমি মীর কাশিমের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত দাবি করছি।"

নিজামী সাহেব বললেন, "আমি কারও শাস্তির কথা বলি নাই।"

৪৫ বছর যাবত যে আন্দোলনের জন্য জীবন যৌবন সবকিছু উজাড় করে দিয়েছিলাম সেই আন্দোলনের এই দুরবস্থা আমাকে চরমভাবে ব্যথিত করেছে। আমার বাসায় ফিরার পর স্ত্রী এবং ছেলেরা আমার চেহারার দিকে তায়ে নানা কথা বলেছে। কারণ তিনদিন যাবত বৈঠক চলছিল শিবিরের ব্যাপারে একটা ভালো কিছু জামায়াত করবে এটা তাদের আশা ছিল। আমার চেহারা থেকেই তারা বুঝেছিল যে কিছুই হয়নি। একদিকে জামায়াতকে ধংস করার জন্য সরকার ষড়যন্ত্র করছে; আর অন্যদিকে জামায়াত নিজে থেকেই যেন ধংস ডেকে আনছে।

আমি স্বীকার করি মি: নিজামী, অধ্যাপক নাজির আহমদ এবং মুজাহিদ সাহেবকে ছোট থেকেই খুব শ্রদ্ধা করতাম। এখনও আমি তাদের সম্মান জানাই। কিন্তু সর্বশেষ তারা ছাত্রশিবিরের ব্যাপারে যা করলেন তা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

বিশেষ করে নাজির আহমদ সাহেবের ভূমিকায় সবচাইতে বেশী আহত হই। জামায়াতের তেমন কোন কাজকর্মের সাথে জড়িত না থেকেও তিনি নায়েবে আমীর তাতেও আমি খুশী ছিলাম যে লোকটা লেখাপড়া করেন এবং শিক্ষামূলক আলোচনা করা সৎ ও নিষ্ঠাবান। বিআইসি সুন্দরভাবেই পরিচালনা করেন। অবশ্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি তিনি সেখানে তৈরী করেননি। সেখানের সর্বব্যাপারে তিনি কর্তৃত্বশীল। তার অধীনে কোন স্কলার এ যাবত তৈরী হয়নি। আমাদের অনেক বলা-কওয়ার পর সম্প্রতি কিছু লোক সেখানে কাজে নিয়েছেন। পৃথিবী, কলম ও আল-ইসলাম এ তিনটি পত্রিকারও সম্পাদক তিনি। এগুলোর মানোন্নয়নের জন্য তেন কোন পদক্ষেপ কার্যকরীভাবে নিতে পারেননি। তার যতটা সামর্থ তার সবটা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে নিচ্ছেন।

তিনি বরাবর ছাত্রশিবিরের নির্বাচন কমিশনার। আমাদের অগাধ আস্থা তার উপর। কিন্তু শিবিরের কমিটি নিয়ে তিনি যা করলেন তার কোন ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। কিছুদিন পর জামায়াতের কর্মপরিষদে অবশ্য তিনি ওয়াদা করেছেন যে কমিটির কাজ শেষ করে রিপোর্ট দিবেন। এ ওয়াদাও যে তিনি রাখবেন না এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কারণ তার নেতৃত্বে জামায়াতের গঠনতন্ত্র সংশোধনীর জন্য একটি কমিটি আমীরে জামায়াত করে দিয়েছিলেন। যেহেতু নাজির আহমদ সাহেব গঠনতন্ত্রের সংশোধনীর পক্ষে নন সেহেতু তিনি একবছর পর্যন্ত এই কমিটির একটি বৈঠকও ডাকেননি। অবশেষে সাংগঠনিক

কমিটির উপর দায়িত্ব দেয়া হয় এবং সাংগঠনিক কমিটি গঠনতন্ত্র সংশোধন করে নির্বাচন কমিশনের নিকট পেশ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যাহোক নাজির সাহেবের এই আচরণে আমি একা নই আরও অনেকে কষ্ট পেয়েছেন।

এটা আমি উপলব্ধি করেছি নিজামী সাহেব এবং মুজাহিদ সাহেব আন্দোলনের জন্য সঠিক মনে করেই একটা মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত শিবিরের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু এ ধরনের একটা অর্থহীন কাজ করে সংগঠনকে কমপক্ষে ২০ বছর পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা তাদের দোষ মনে করি না; বরং তাদের দুরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার অভাব। একজন দু'জন ব্যক্তি যদি ভিন্ন চিন্তার হয় তাহলে গোটা শিবিরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তিকে ক্ষতিকর মনে করে তকে ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে আসতে না দেয়ার যে চিন্তা যে মারাত্মক ভুল চিন্তা আমি আশা করি তারা একদিন বুঝবেন।

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের পদত্যাগপত্র

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

জনাব মকবুল আহমদ

আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

বিষয়: পদত্যাগ পত্র।

পরম শ্রদ্ধেয় মকবুল ভাই,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

১। দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আজ এই মুহূর্তে আমি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে পদত্যাগ করছি।

---

* ২০১৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি লন্ডন থেকে জামায়াতের তৎকালীন আমীরের নিকট পাঠানো এক চিঠির মাধ্যমে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক জামায়াত থেকে পদত্যাগ করেন। এর আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল। পুরো বিষয়টি গণমাধ্যমে আসার কারণে দেশের রাজনীতিতে এটি তখন অন্যতম আলোচিত ঘটনায় পরিণত হয়। এই পদত্যাগপত্রটি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত,
https://bangla.bdnews24.com/politics/article1593136.bdnews

২। এটি আমার জন্য এক কঠিন সিদ্ধান্ত। ১৯৮৬ সালে যোগদানের পর থেকে আজ অবধি আমি সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছি। বিগত তিন দশক ধরে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব সাধ্যমত পালন করতে সচেষ্ট থেকেছি। প্রধান কৌশলী হিসাবে জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মামলা আস্থা, সততা ও একাগ্রতার সাথে পরিচালনা করেছি। আমার বিশ্বাস, জামায়াতের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে শুধু ইসলাম নির্দেশিত কর্তব্যই নয়, দেশের প্রতিও দায়িত্ব পালন সম্পন্ন হয়।

৩। জামায়াতে ইসলামী দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতি, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও দলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার মাধ্যমে দেশের জন্য অসংখ্য সৎ, দক্ষ ও কর্মনিষ্ঠ নাগরিক তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এতদসত্ত্বেও জামায়াত একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অপারগ হয়ে পড়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, জামায়াত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছে। এই দেশের স্বার্থবিরোধী কোন কর্মকাণ্ডের সাথে জামায়াত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত নয়। অধিকন্তু, জামায়াত গত শতাব্দীর ৬০-এর দশকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সকল সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে; যেমন, কমবাইন্ড অপজিশন পার্টি (কপ), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) এবং ডেমোক্রেটিক একশন কমিটি (ডাক)। একইভাবে গত শতাব্দীর ৮০ এর দশকে ৮-দল, ৭-দল ও ৫-দলের সাথে জামায়াত যুগপৎভাবে রাজপথে সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। দলটির এ সকল অসামান্য অবদান ৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ভুল রাজনৈতিক ভূমিকার কারণে স্বীকৃতি পায়নি। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা পরবর্তীকালে জামায়াতের সকল সাফল্য ও অর্জন ম্লান করে দিয়েছে।

৪। এসব কারণে আমি সবসময় বিশ্বাস করেছি এবং এখনও করি যে, ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে নেতিবাচক ভূমিকার জন্য ক্ষমা চাওয়া শুধু নৈতিক দায়িত্বই নয় বরং তৎপরবর্তী প্রজন্মকে দায়মুক্ত করার জন্য অত্যন্ত জরুরী কর্তব্য। আমি বিশ্বাস করি, ইসলাম ও স্বাধীনতা সংগ্রাম বাংলাদেশের সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ভিত্তি। এ দুটি কোন অবস্থাতেই আপসযোগ্য নয়, জাতিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ এই দুইটি উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করার সুযোগ নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উপলব্ধি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দাঁড়িয়ে তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর জুলুম, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে যখন পাকিস্তানী সামরিক জান্তা গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে নিস্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেনি। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পর আজও

দলের নেতৃবৃন্দ ৭১-এর ভূমিকার জন্য ক্ষমা চাইতে পারেনি। এমনকি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রসঙ্গে দলের অবস্থানও ব্যাখ্যা করেনি। তাই অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জামায়াতের ক্ষতিকর ভূমিকা সম্পর্কে ভুল স্বীকার করে, জাতির কাছে নিজেদের সেই সময়কার নেতাদের পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে পরিষ্কার অবস্থান নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। যে কোন রাজনৈতিক দল, ইতিহাসের কোন এক পর্বে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার হতে পারে। কিন্তু তাকে ক্রমাগত অস্বীকার করে, সেই সিদ্ধান্ত ও তার ফলাফল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনড় অবস্থান বজায় রাখা শুধু অগ্রহণযোগ্যই নয় বরং আত্মঘাতী রাজনীতি। তা কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

৫। আমি বিগত দুই দশক নিরবিচ্ছিন্নভাবে জামায়াতকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, ৭১-এ দলের ভূমিকা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হওয়া উচিত এবং ওই সময়ে জামায়াতের ভূমিকা ও পাকিস্তান সমর্থনের কারণ উল্লেখ করে জাতির কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়া উচিত। সুনির্দিষ্ট কারণসমূহ উল্লেখ করে যে যে সময় আমি বিষয়টি দলের শীর্ষ সংস্থা ও নেতৃত্বের কাছে উত্থাপন করেছি তার কয়েকটির বিবরণ দিতে চাই:

ক) ২০০১ এর অক্টোবর মাসে জামায়াতের তৎকালীন আমীর ও সেক্রেটারি জেনারেল মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। বিজয় দিবস উদযাপনের আগেই ৭১-এর ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি জোরালো পরামর্শ দিয়েছিলাম। একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বক্তব্যের খসড়াও প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু সেটি আর আলোর মুখ দেখেনি।

খ) ২০০৫ সালে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে আবারো ৭১ নিয়ে বক্তব্য প্রদানের পক্ষে আমি জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করি। আমার সেদিনের বক্তব্য সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

গ) ২০০৭-২০০৮ সালে জরুরী অবস্থার সময় জামায়াতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ভিন্ন মাত্রা পায়। তখনও ৭১ প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদানের জন্য জামায়াতকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি।

ঘ) আমি ২০১১ সালে মজলিসে শুরার সর্বশেষ প্রকাশ্য অধিবেশনে বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করি। দলের নেতৃত্ব প্রদানে এগিয়ে আসার জন্য নতুন প্রজন্মের প্রতি আমি বিশেষ আহবান জানাই। আমার সেই প্রস্তাব শীর্ষ নেতৃবৃন্দের একাংশের অবহেলার নিকট পরাজিত হয়।

ঙ) ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ আপনাকে পাঠানো ১৯ পৃষ্ঠার চিঠিতে ৭১ প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদানের জন্যে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম। তাতে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে নতুন আঙ্গিকে রাজনীতি শুরু করার আহবানও জানিয়েছিলাম।

চ) ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে আপনি আমীর নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পর এ বিষয়ে আমার মতামত চাওয়া হয়েছিল। আমি জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া সংক্রান্ত একটি খসড়া বক্তব্য পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন করা হয়নি।

ছ) সবশেষে, ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর জানুয়ারী মাসে জামায়াতের করণীয় সম্পর্কে আমার মতামত চাওয়া হয়। আমি যুদ্ধকালীন জামায়াতের ভূমিকা সম্পর্কে দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্ষমা চাওয়ার পরামর্শ দেই। অন্য কোন বিকল্প না পেয়ে বলেছিলাম, জামায়াত বিলুপ্ত করে দিন।

৬। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমার তিন দশকের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

৭। ৭১ প্রসঙ্গে গ্রহণযোগ্য বক্তব্য প্রদানের ব্যর্থতা এবং ক্ষমা না চাওয়ার দায়ভার আজ তাদেরও নিতে হচ্ছে যারা তখন এই সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত ছিল না, এমনকি যারা ৭১-এ জন্মগ্রহণও করেনি। অধিকন্তু, অনাগত প্রজন্ম যারা ভবিষ্যতে জামায়াতের সাথে জড়িত হতে পারে তেমন সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদেরকেও এই দায়ভার বহন করতে হবে। এই ক্রমাগত ব্যর্থতা জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী দল হিসাবে আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। ফলে জামায়াত জনগণ, গণরাজনীতি এবং দেশবিমুখ দলে পরিণত হয়েছে।

৮। বিগত বছরগুলোতে মুসলিম বিশ্বে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কয়েকটি দেশে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে গঠিত মধ্যপন্থী দলগুলো সফলতা অর্জন করেছে। এই পরিবর্তনের বাতাস যদিও এখন পর্যন্ত ১৭ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশের গায়ে লাগেনি কিন্তু সময় এসেছে আমাদের পূর্বপুরুষের তৈরি ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণায় কোনো পরিবর্তন আনা যায় কিনা তা নিয়ে নতুন প্রজন্মের গভীরভাবে চিন্তা করার। স্নায়ু যুদ্ধের অবসানের পর বহুদিন এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা চালু থাকলেও আমরা এখন আবার বহুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার দিকে ফিরে যাচ্ছি। এই নতুন বাস্তবতায় নতুন প্রজন্মকে নতুন চিন্তা নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হবে।

৯। জামায়াতে যোগদান করার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ভিতর থেকেই সংস্কারের চেষ্টা করব। বিগত ৩০ বছর আমি সেই চেষ্টাই করেছি। আমি কাঠামোগত সংস্কার ও নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের পক্ষে ছিলাম। আমার সংস্কার বিষয়ক ভাবনাগুলো মৌখিক ও লিখিতভাবে দলের সামনে একাধিকবার উপস্থাপন করেছি। এ ব্যাপারে কমবেশি সকলেই অবহিত আছেন। ২০১৬ সালে আপনার কাছে লেখা চিঠিতে আমি অভ্যন্তরীণ সংস্কারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। অন্যান্য মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর সংস্কারের উদাহরণ দিয়েছি। সবশেষে বিশ্ব পরিস্থিতি ও মুসলিম দেশগুলোর উত্থান পতনের আলোকে জামায়াতের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে আমূল পরিবর্তন আনার আহবান জানিয়েছি। প্রতিবারের ন্যায় কোন ইতিবাচক সাড়া পাইনি।

১০। বাংলাদেশের যুবসমাজ সচেতন, শিক্ষিত এবং আলোকিত। তারা চলমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে ওয়াকিবহাল। সর্বোপরি তারা দেশপ্রেমিক এবং দেশের পরিবর্তনের জন্য প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে আগ্রহী ও সক্ষম। এই সচেতন যুবসমাজের একটি অংশ জামায়াতের সাথে থাকলেও বৃহত্তর যুবসমাজকে নেতৃত্ব দিতে জামায়াত সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

১১। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের আওতায় ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক দল গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। সময়ের সে দাবি অনুযায়ী জামায়াত নিজেকে এখন পর্যন্ত সংস্কার করতে পারেনি।

১২। অতীতে আমি অনেকবার পদত্যাগের কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু এই ভেবে নিজেকে বিরত রেখেছি যে, যদি আমি অভ্যন্তরীণ সংস্কার করতে পারি এবং ৭১-এর ভূমিকার জন্য জামায়াত জাতির কাছে ক্ষমা চায় তাহলে তা হবে একটি ঐতিহাসিক অর্জন। কিন্তু জানুয়ারি মাসে জামায়াতের সর্বশেষ পদক্ষেপ আমাকে হতাশ করেছে। তাই পদত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। এখন থেকে আমি নিজস্ব পেশায় আত্মনিয়োগ করতে চাই। সেই সাথে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি সমৃদ্ধশালী ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলা দেশ গড়তে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।

১৩। পরিশেষে জামায়াত থেকে পদত্যাগের পূর্বমুহূর্তে একটি বিষয় বলা আমার দায়িত্ব মনে করছি। গত দশ বছরে জামায়াত নেতৃবৃন্দ অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেছেন। তা এখনও অব্যাহত। এটি প্রশংসনীয় যে, এই কঠিন ও বৈরী সময়েও ব্যাপক কষ্ট এবং অসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে জামায়াত নেতৃবৃন্দ

দলের ঐক্য বজায় রেখেছেন। দলের প্রতি তাদের নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা অনস্বীকার্য।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আপনার বিশ্বস্ত

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক
বারকিং, এসেক্স
যুক্তরাজ্য

মজিবুর রহমান মন্জুর চিঠি

১.

২১ নভেম্বর ২০১৪

বরাবর
আমীর (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

বিষয়: উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, মতামত ও পরামর্শ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আশা করি মহান আল্লাহর রহমতে সার্বিকভাবে সুস্থ আছেন।

---

* ২০১৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে ব্যারিস্টার রাজ্জাক জামায়াত থেকে পদত্যাগ করেন। একইদিন বিকেলে বহিষ্কার করা হয় দলটির কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগর মজলিশে শূরা সদস্য মজিবুর রহমান মন্জুকে। তিনি ছিলেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি। আব্দুর রাজ্জাকের মতো তিনিও জামায়াতের সংস্কার ও মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুতে বিভিন্ন সময় দলীয় অঙ্গনে কথা বলেছেন, দলটির নেতৃবৃন্দকে লিখিতভাবে চিঠি দিয়েছেন। সর্বশেষ চিঠিটি তিনি দেন বহিষ্কার হওয়ার দুদিন আগে। এসব চিঠিতে দলটির অভ্যন্তরীণ অবস্থাও ফুটে ওঠেছে। এখানে সংকলিত চারটি চিঠির কপি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমরা পেয়েছি।

বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে একজন শপথের কর্মী এবং শুরা সদস্য হিসেবে আমার ব্যক্তিগত কিছু পর্যবেক্ষণ, মতামত এবং পরামর্শ আপনার কাছে উপস্থাপন করা গঠনতান্ত্রিক কর্তব্য মনে করে বিনয়ের সাথে উপস্থাপন করছি।

১) বিতর্কিত আইসিটির মাধ্যমে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন দায়িত্বশীলদের বিচারিক হত্যাকাণ্ডের যে আয়োজন চলছে তাতে এ কথা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে সরকার আমাদেরকে নেতৃত্বশূন্য করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

২) চলমান আন্দোলন সংগ্রাম দমনের নামে আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা, গ্রেফতার, রিমান্ড ইত্যাদির মাধ্যমে এক ধরনের দমবন্ধ-ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। গ্রেফতার হননি কিংবা মামলা নেই এ রকম দায়িত্বশীল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ইতোমধ্যে সিটি আমীর ও সিটির সাবেক নায়েবে আমীরকে ঠুনকো মামলায় ৩-৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। অন্যান্য ময়দানী দায়িত্বশীলগণের মামলা ট্রায়ালে নিয়ে তাদেরকেও দ্রুত বিচারের সম্মুখীন করার চেষ্টা চলছে।

৩) সারাদেশে মাঠ পর্যায়ে আমাদের জনশক্তি ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ মানসিক এক উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করছেন। কারও ব্যক্তিগত ব্যবসা, কর্মস্থল, নিজ পরিবারের সাথে বসবাস নিজের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে আছে দীর্ঘদিন থেকে। এমত পরিস্থিতিতে চাকরি হারিয়ে (আমার মতো) মানবেতর জীবনযাপন করছেন এমন সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। শহীদ পরিবার ছাড়াও আহত পঙ্গু এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি-পরিবারের দীর্ঘশ্বাস ক্রমেই প্রলম্বিত হচ্ছে।

৪) আলহামদুলিল্লাহ, এত কিছুর পরও জনশক্তি ও শুভাকাঙ্খীদের মাঝে ত্যাগ, কুরবানী ও ধৈর্যের যে অপরিসীম নজীর তা মহান আল্লাহর এক অপরূপ মেহেরবানী। জনশক্তি হতাশ নয়, বরং আল্লাহর সাহায্যে সহসাই মেঘ কেটে যাবে এই আশায় উজ্জীবিত। তবে জনশক্তি ও মাঠের দায়িত্বশীলদের অনেক কথা আছে যা যথাযথ ফোরামে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে না শুনলে ব্যাপক গীবত চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

৫) কিন্তু বাস্তব কথা হলো, মহান আল্লাহর রহমতে এই জালেম সরকার পরিবর্তন এবং তদস্থলে একটি (আমাদের অনুকুল) সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের শ্রদ্ধাভাজন দায়িত্বশীলগণের মুক্তি, বিচার প্রক্রিয়া রহিতকরন এবং এসব হৃদয়বিদারক জুলুম হয়রানী থেকে মুক্তির কোনও আপাত সম্ভাবনা নেই।

৬) বর্তমান জুলুমবাজ অবৈধ সরকার পরিবর্তনের প্রধান পথ হলো তীব্র আন্দোলনে তাদেরকে পদত্যাগে বাধ্য করে একটি সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য সরকার প্রতিষ্ঠা করা। যে সরকার যে কোনও কারণে আমাদের প্রতি দরদী হবে এবং

আমাদের প্রতি কৃত অন্যায় অবিচার রহিত করবে। ফলে আমরা আবার স্বাভাবিক তৎপরতায় ফিরে আসতে পারব।

৭) কিন্তু বর্তমান স্বৈর সরকার যদি সহসা বিদায় না হয় কিংবা আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনও পন্থায় যদি এই সরকারের পতন হয় এবং সেক্ষেত্রে অন্য কোনও পক্ষ বা শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়, তাহলে আমাদের বর্তমান কঠিন পরিস্থিতি আরও দীর্ঘায়িত হবে এবং তা নতুন এক ধরনের অনিশ্চয়তা আমাদের জন্য ডেকে আনতে পারে।

এমতাবস্থায় আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মনে করছি, আমাদের সামনে তিনটি সম্ভাবনা উপস্থিত:

ক) সম্ভাবনা (উত্তম):

তীব্র গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করে এই সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা এবং জোটের ভিত্তিতে আন্দোলন, নির্বাচন করে একটি সহযোগী মনোভাবের সরকার প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু প্রশ্ন হলো বিএনপির সাথে এখন জামায়াতের যে মানসিক দূরত্ব, আমাদের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের বিএনপির ব্যাপারে যে নেতিবাচক মনোভাব এবং কার্যকর গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে বিএনপির যে ব্যর্থতা তাতে কাঙ্ক্ষিত আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়টি বড় একটি চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া সরকারের "যুদ্ধাপরাধের বিচার কার্ড" এই যুক্ত আন্দোলনে বার বার বাঁধার সৃষ্টি করেছে। এটা জামায়াত এবং বিএনপি যৌথভাবে অনুধাবন করে এর মোকাবিলা কৌশল ঠিক না করলে আবারও তা আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

খ) সম্ভাবনা (মধ্যম):

বিএনপি-জামায়াত ২০ দলীয় জোটের ব্যর্থতায় অন্য কোন পক্ষ ভিন্ন কোনও পন্থায় এই সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করতে পারে। দেশে জরুরী পরিস্থিতি বিরাজ করতে পারে এবং সেটা জামায়াতের জন্য সহসা কোনও ভালো ফল আনতেও পারে, নাও আনতে পারে। তবে জামায়াত যেহেতু প্রাসাদ রাজনীতি এবং বিদেশী দুতিয়ালীতে সিদ্ধহস্ত নয়, তাই এটা আখেরে জামায়াতের জন্য ভালো না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

গ) সম্ভাবনা (অধম):

এর বাইরে যে সম্ভাবনা থাকে তা হচ্ছে আওয়ামীলীগের ক্ষমতা আরও প্রলম্বিত হওয়া। সেক্ষেত্রে জুলুম নিপীড়নের মাত্রা আরও চরমভাবে বৃদ্ধি পাওয়া, জামায়াত নেতাদের একের পর এক ফাঁসি দেয়া, জামায়াতকে নিষিদ্ধ করে এর উপর মিশরীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা ইত্যাদি। এর বাইরে বিএনপিকে বিভক্ত করার

চেষ্টা, জামায়াতকে চাপ প্রয়োগ করে নির্বাচনে নেওয়ার চেষ্টা ইত্যাদির মাধ্যমে মধ্যবর্তী নির্বাচন দেয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

উদ্ভুত সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে জামায়াত কী করছে বা ভাবছে? কীভাবে সামনের দিকে আমরা পথ চলব? বিশাল এই জনশক্তি এবং সংগঠনের আমানত আজ যে পরিস্থিতিতে উপনীত তাতে আমদের কর্মকৌশল বা পরিকল্পনা কী? এসব নিয়ে একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে আমি চিন্তিত। বিরূপ পরিস্থিতির কারণে এখন আমাদের শুরা কার্যকর নয়। গঠনতান্ত্রিকভাবে পুরো পরিস্থিতিতে কর্মপ্রণালী নির্ধারণ নির্বাহী এবং কর্মপরিষদের উপর ন্যাস্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নির্বাহী এবং কর্মপরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কারাগারে অন্তরীণ। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমার যে মতামত ও পরামর্শ তা আমি নীতিনির্ধারণী ফোরামে আপনার মাধ্যমে পেশ করতে চাই।

পরামর্শ (১) – বর্তমান এবং সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় প্রসঙ্গে যেভাবেই হোক কর্মপরিষদ ও শুরার সদস্যদের মতামত এবং পরামর্শ (ব্যক্তিগতভাবে হোক অথবা ছোট ছোট গ্রুপে হোক) নেয়া প্রয়োজন।

পরামর্শ (২) – শুধু একটি সম্ভাবনাকে চিন্তায় না রেখে সম্ভাব্য অন্যান্য পরিস্থিতি সংঘটিত হলে কীভাবে মোকাবিলা করা হবে তা নিয়ে পূর্ব পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন।

পরামর্শ (৩) – আমাদের নেতাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অন্যায় বিচার, একে কেন্দ্র করে বিএনপির সাথে মানসিক দূরত্ব এবং আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বিএনপির নির্বাহী কমিটির সাথে বিষয়টি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হওয়া দরকার। এ ব্যাপারটি তাঁরা অনুধাবন করে কি না, তাদের মতামত কী ইত্যাদি জানা প্রয়োজন।

পরামর্শ (৪) – জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার যে প্রক্রিয়া এবং এ ব্যাপারে মিডিয়ায় যে বিরূপ প্রচারণা তার প্রেক্ষিতে ময়দানের মনোভাব নিরপেক্ষভাবে জানা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষ, মধ্যপন্থী বুদ্ধিজীবী, এমনকি আমাদের জনশক্তি-শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও মতামত জানা যেতে পারে।

পরামর্শ (৫) – জামায়াত নিষিদ্ধের ব্যাপারে সরকার চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেয়ার আগেই আমাদের কর্মপন্থা ও পরিকল্পনা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। জনশক্তি এবং সম্পদ রক্ষায় পর্যাপ্ত চিন্তার সুযোগ পাওয়ার পরও আমরা যদি ঘটনা ঘটে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করি, তাহলে আমি মনে করি তা হবে সুন্নাতের খেলাপ এবং দুর্ভাগ্যজনক।

পরামর্শ (৬) – বর্তমান পরিস্থিতি মুকাবিলায় খুব অল্প সংখ্যক দায়িত্বশীল ভাইদের উপর পুরো চাপ পড়ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। অধিকতর কল্যাণ ও বরকতের জন্য দেশের সর্বস্তরের দায়িত্বশীলদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় আরও সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র স্বল্প সংখ্যক দায়িত্বশীলদের পরামর্শে সংগঠনের অতি মৌলিক বিষয়য়াদি দীর্ঘসময় ধরে পরিচালিত হওয়া কল্যাণকর নয় বলে আমি মনে করি।

পরামর্শ (৭) – সার্বিক পরিস্থিতিতে সরকার যেভাবে আমাদেরকে নেতৃত্বশূন্য করতে চাচ্ছে সে প্রেক্ষিতে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী নেতৃত্ব গঠনের পরিকল্পনা হাতে নেয়া প্রয়োজন।

অত্যন্ত সবিনয়ে জানাচ্ছি যে একজন শুরা সদস্য হিসেবে নিঃসংকোচে মত প্রকাশের দায়িত্বানুভুতি থেকেই আমি আপনার মাধ্যমে এ বিষয়গুলো উপস্থাপন করছি। জ্ঞান বা তথ্যগত সীমাবদ্ধতার কারণে আমার কোনও পর্যবেক্ষণ, মতামত বা পরামর্শ যদি ভুল হয় তা আশা করি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

মহান আল্লাহ এক কঠিন সময়ে দ্বীনের জিম্মাদারি আমাদের উপর অর্পণ করেছেন। তিনি যাতে হক এবং যথার্থতার সাথে সে দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার তাওফিক দেন। আমীন।

মা'আসসালাম।

মজিবুর রহমান মন্জু,
সদস্য, কেন্দ্রীয় মজলিশ-ই-শূরা।

২.

১৬ নভেম্বর, ২০১৫ ঈসায়ী

বরাবর
আমীর (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

মাধ্যম: সেক্রেটারি জেনারেল (ভারপ্রাপ্ত)।

বিষয়: তদন্তপূর্বক সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ, চরিত্রহনন, অপপ্রচার, সাংগঠনিক পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সংগঠনের অভ্যন্তরে গ্রুপিং সৃষ্টির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

জনাব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আশা করি মহান আল্লাহর রহমতে সার্বিক সুস্থতার সাথে কঠিন সময়ে দ্বীনের এক মহান জিম্মাদারী পালন করছেন। রাহমানুর রাহীমের কাছে আপনার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ প্রার্থনা পূর্বক নিম্নোক্ত বিশেষ বিষয় অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি।

১) আমি মজিবুর রহমান মন্জু বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বাইয়াতবদ্ধ একজন সদস্য (রুকন)। দীর্ঘদিন হতে বর্তমান পর্যন্ত আমি ঢাকা মহানগরী শাখা ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।

২) গত ১২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে আমি ঢাকা মহানগরী শাখার দুইজন সদস্য (রুকন) দায়িত্বশীল মারফত জানতে পারি যে, সংগঠনের আইনজীবী থানা শাখার টীম বৈঠক ও রুকন বৈঠকে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য এডভোকেট মশিউল আলম ও মহানগরী শাখার শূরা সদস্য আইনজীবী বিভাগের দায়িত্বশীল এডভোকেট কামাল উদ্দিন আমার নাম উল্লেখপূর্বক আমার সম্পর্কে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ও অভিযোগ উপস্থাপন করেন। আমি সংগঠনের আরও কিছু ভাইকে সাথে নিয়ে ভিন্নমত ও চিন্তার প্রচার, আলাদা জ্ঞান চর্চা ও বৈঠকের মাধ্যমে পৃথক গ্রুপ সৃষ্টির চেষ্টা করছি মর্মে তারা অপবাদ আরোপ করেন। কেন্দ্র ও মহানগরী শাখার

নির্দেশক্রমে আদিষ্ট হয়ে তারা আমার বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য উপস্থিত সকলকে হুশিয়ার করেন এবং জনশক্তির নিকট কৌশল ও গোপনীয়তার মাধ্যমে তা পৌঁছে দেয়ার আহবান জানান।

৩) একইদিন ফেসবুকের ইনবক্সে একজন থানা দায়িত্বশীল মারফত আমি জানতে পারি ঢাকা মহানগরী শাখার কলাবাগান ও নিউমার্কেট থানার যৌথ দায়িত্বশীল বৈঠকে থানা আমীর জনাব মাওলানা মোশার্রফ হোসেন ও অধ্যাপক সিরাজুল করিম মানিকের উপস্থিতিতে মহানগরী শাখার সহকারী সেক্রেটারি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মনজুরুল ইসলাম ভূঁইয়া আমার নাম উল্লেখপূর্বক আমার বিরুদ্ধে একই রকম কুৎসা রটনা ও অপবাদ আরোপ করে নির্দেশনা প্রদান করেন। এখানেও তিনি এ নির্দেশনা কেন্দ্র ও মহানগর সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে মর্মে অবহিত করেন।

৪) আপনি জানেন যে আমি এ আন্দোলনের শারীরীকভাবে চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ও অসুস্থ একজন কর্মী। বর্তমান সরকারের অন্যায় অবিচারের শিকার হয়ে দীর্ঘ প্রায় ৩ বছর যাবৎ বেকারত্ব মাথায় নিয়ে জীবন সংগ্রামে রত আছি। তথাপি বিগত মাসাধিক কাল যাবৎ ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় আমাকে ফেরার জীবন যাপন করতে হচ্ছে। সংগত কারণে আমার ফোন বন্ধ। আমার বিরুদ্ধে চরিত্র হননকারী যে কথা রটানো হচ্ছে আমি তার সঠিক কারণ ও সত্যাসত্য যাচাই করতে পারছি না। প্রতিদিনই সামাজিক যোগাযোগ মাধমে অনেকে এ বিষয়ে আমার অবস্থান ও মত জানতে চাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আমি বিস্মিত ও মানসিকভাবে মর্মাহত-বিপর্যস্ত।

৫) আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে গত কয়েকদিন পূর্বে ঢাকা মহানগর আমীর ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য রফিকুল ইসলাম খান আমাকে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের জন্য ডাকেন। কথা প্রসঙ্গে নানা বিষয়ে আমি বর্তমান দায়িত্বশীলদের কিছু নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতার জন্য বিনয়ের সাথে তাঁকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সময়োচিত সঠিক সিদ্ধান্তের অভাবে সংগঠন ও এর জনশক্তি অপরিসীম ক্ষতিগ্রস্ততার সম্মুক্ষীন হচ্ছে এবং এতে হতাশার বিস্তার ঘটছে বলে তাঁকে জানাই। তিনি আমার মতামতে কিছুটা রুষ্ট হলে আমি বিনীত ভাবে এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত, অতএব নিঃসংকোচে মত প্রকাশের অধিকারে বলছি বলায় তিনি শান্ত হন। তিনি সম্প্রতি মহানগর কর্মপরিষদ সদস্য জাহিদুর রহমানের গ্রেফতার, তাঁকে জড়িয়ে আমার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের এবং এডভোকেট শিশির মনিরের গুলেন মুভমেন্ট সম্পর্কিত মেসেজ নিয়ে বিভিন্ন বিষয় জানতে চান। আমি এ সকল বিষয়ে যতটুকু জানি তা তাঁকে অবহিত করি। তিনি আমাকে আমার কোন অসাংগঠনিক আচরণ বা শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা নিয়ে ঘুর্ণাক্ষরেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। বরং আমার মতামতকে গুরুত্বপূর্ণ অভিহিত করে যথাশীঘ্র সম্ভব দ্রুত সময়ে আমার সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার আশা পোষণ করেন। তাঁর সাথে সাক্ষাতের ২-৩ দিনের মাথায় তাঁর নির্দেশনায় আমার বিরুদ্ধে এত জঘন্য মিথ্যা ও চরিত্রহননকারী অপবাদ রটানো সম্ভব তা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

৬) জামায়াত একটি নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন। আমি মনে করি এর গঠনতন্ত্র ও নিয়মশৃঙ্খলা আমাদের জন্য আমানত। আমরা কেউ নিয়মের ঊর্ধ্বে নই। কারও যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তাহলে নিয়ম অনুযায়ী তাকে সংশোধনের বা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধিবদ্ধ নিয়ম রয়েছে। আমার বিরুদ্ধে যে অপবাদ, অপপ্রচার ও চরিত্রহননকারী কুৎসা রটানো হয়েছে তা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত বলে আমার ধারণা। এর মাধ্যমে সংগঠনের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের পদস্থ ব্যক্তিগণ চরমভাবে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। ক্ষমতা ও পদ ব্যবহার করে আমার বিরুদ্ধে জনশক্তির মাঝে মিথ্যা ধারণা ও ঘৃণা উস্কে দিয়েছেন, যা আমার সম্মান এবং জীবনের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। তাদের এই ভুল নির্দেশনার কারণে সংগঠনের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি, গ্রুপিং, এমনকি সংগঠন সম্পর্কে জনশক্তির মাঝে বিরূপ ধারণা ও হতাশা জন্ম নিতে পারে।

অতএব, এতদ বিষয়ে যথাযথ তদন্তপূর্বক উল্লিখিত দায়ী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে গঠনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংগঠনের শৃঙ্খলা ও আমানত রক্ষায় আপনার দৃঢ় পদক্ষেপ কামনা করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন, আমীন।

নিবেদক

মজিবুর রহমান মন্জু
মজলিশে শূরার সদস্য, ঢাকা মহানগরী
ও
সদস্য, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

অনুলিপি অবগতির জন্য (আমীরে জামায়াতের অনুমতি সাপেক্ষে):
১) সদস্যবৃন্দ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ।
২) সদস্যবৃন্দ, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ।

৩.

২২ ডিসেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী।

সম্মানিত আমীরে জামায়াত,

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

আসলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আশা করি মহান আল্লাহর রহমতে ভালো এবং সুস্থ আছেন।

গত ১৮/১২/২০১৫ ইং শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকা মহানগর আমীর মুহতারাম রফিকুল ইসলাম খান, মহানগর নায়েবে আমীর মাওলানা আব্দুল হালিম, মহানগর সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম বুলবুল এবং মহানগর এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিনের সাথে আমার এক যৌথ সাক্ষাৎ (গ্রুপ কন্টাক্ট) অনুষ্ঠিত হয়।

আপনি জানেন যে গত ১৬ নভেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী তারিখে ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেলের মাধ্যমে আমি আপনার বরাবরে মহানগর আমীর ও মহানগর সংগঠন কর্তৃক আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, চরিত্রহনন, সাংগঠনিক পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সংগঠনের অভ্যন্তরে গ্রুপিং সৃষ্টির বিষয়ে তদন্তপূর্বক সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে একটি আবেদন করি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি এবং ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল আমাকে মহানগর আমীরের সাথে সাক্ষাৎ করে কথা ও মোহাসাফা করতে বলেন। মূলত আপনাদের উপদেশ অনুযায়ী দীর্ঘসময় চেষ্টার পর মুহতারাম মহানগরী আমীর আমাকে গ্রুপ কন্টাক্টের জন্য গত ১৮/১২/২০১৫ ইং শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় সময় দেন। উক্ত গ্রুপ কন্টাক্টে তিনজন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলের (নায়েবে আমীর, সেক্রেটারি, এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি) উপস্থিতিতে মহানগর আমীরের সাথে আমার যা আলাপ হয়েছে তা আপনার সদয় অবগতির জন্য নিম্নে তুলে ধরছি:

১) আলোচনার শুরুতে আমি আমার তিনটি লিখিত বক্তব্য দায়িত্বশীলগণের হাতে হস্তান্তর করি এবং তিনটি বক্তব্য হুবহু পাঠ করে শুনাই।

২) লিখিত বক্তব্যে আমি তাঁদেরকে সবিনয়ে জানাই যে, আমি বর্তমানে সংগঠনের কোন শাখা, বিভাগ বা ইউনিট কোন পর্যায়েরই দায়িত্বে নিয়োজিত নেই, আমার অধীনে কোন জনশক্তি নেই। ফলে আমার পক্ষে সংগঠনের কল্যাণ, অকল্যাণ, উন্নয়ন, বিভক্তি বা পর্যালোচনামূলক কোন সভা ও বৈঠক আহবান করা সম্ভব নয়। আমার

সে অধিকার বা কর্তৃত্বও নেই। এ ধরনের কোন বৈঠক ডাকার বা তাতে অংশ নেয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

৩) ব্যক্তিগতভাবে একজন মিডিয়া কর্মী হিসেবে আমি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার লোকদের সাথে মেলামেশা করি। সেই সূত্রে আমি বেশ কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, এনজিও, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী ইউনিয়ন, মানবিক সংস্থা, সমিতি ও ব্যবসায়িক উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত। সেসব সংস্থার বিভিন্ন সভা, বৈঠক, অনুষ্ঠানে আমি প্রায়ই অংশগ্রহণ করি। কোথাও কোথাও বক্তব্য রাখারও সুযোগ হয়। এ সকল আর্থ-সামাজিক সংস্থার বিধি, গঠনতন্ত্র প্রণয়নেও আমি ভূমিকা রাখি। আমি মনে করি, এ সকল সংস্থার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বা সভায় ভূমিকা রাখার জন্য আমি কারও অনুমতি গ্রহণে বাধ্য নই এবং এটা আমার সাংগঠনিক দায়িত্ব ও ভূমিকার সাথেও সাংঘর্ষিক নয়, বরং অনুকূল। তথাপি আমার এ জাতীয় সমাজ সচেতনতামূলক কাজে সংগঠন সবসময় আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছে, যার জন্য আমি অনুপ্রাণিত ও কৃতজ্ঞ।

৪) আমি তাদেরকে জানাই, সম্প্রতি গুলেন মুভমেন্ট নিয়ে আমাকে জড়িয়ে যে সমস্ত কথা বিভিন্ন দায়িত্বশীল ভাইয়েরা থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রচার করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মিথ্যা, ধারণাপ্রসূত ও এক ধরনের পরিকল্পিত অপপ্রচার। বাস্তবে এ সম্পর্কে আমি কাউকে কখনো কিছু বলিনি, কোন মেসেজ দেইনি, কারও কাছ থেকে কোন মেসেজ পাইনি। এ বিষয়ে আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে চ্যালেঞ্জ করছি সংশ্লিষ্টদের তা প্রমাণের জন্য, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।

৫) সংগঠন পরিচালনায় মহানগর আমীর হিসেবে জনাব রফিকুল ইসলাম খান এবং তাঁর অধীনস্থ বেশ কয়েকজনের ভূমিকা ন্যায়সঙ্গত নয় বলে আমি তাদেরকে সরাসরি এহতেসাব করি। সংগঠনের দায়িত্বশীলদের মাঝে ভেদ-জ্ঞান করা, সংগঠনের শৃঙ্খলা ও গঠনতন্ত্রের রীতি-নীতিবিরুদ্ধ চর্চা করার বেশ কিছু উদাহরণও আমি এহতেসাব হিসেবে উপস্থাপন করি। এগুলোর ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া একান্ত জরুরী বলে আমি তাদের জানাই।

৬) আমি আরও বলি, আমার ব্যাপারে সম্প্রতি যে কুৎসা ও অপপ্রচার চালানো হয়েছে তা মহানগর আমীর রফিকুল ইসলাম খান এবং মহানগর সেক্রেটারি নূরুল ইসলাম বুলবুল ভাইয়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশে হয়েছে বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সংগঠনকে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি এবং সে আলোকে প্রতিবিধান কামনা করছি।

৭) আমি তাদেরকে আরও জনাই, আমরা কেউই নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলার ঊর্ধ্বে নই। কারও ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ ছাড়া তাকে ভিন্ন মতাবলম্বী বা সাংগঠনিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা অন্যায় ও জুলুম। আমার ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকলে বিধি

মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আমার দায়িত্বশীল হিসেবে তাদের সামনে আমি নিজেকে সেজন্য পেশ করি।

৮) আমার লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনানোর পর আমি মহানগর আমীরের নিকট তা রেকর্ড হিসেবে সংরক্ষণের জন্য কপি প্রদান করি।

৯) আমার বক্তব্য উপস্থাপনের পর তিনি আমার কাছ থেকে নিম্নোক্ত কিছু বিষয় জানতে চান:

ক) আমি কেন মহানগর আমীর এবং সেক্রেটারিকে দায়ী করেছি?

খ) আমি কার কার মারফত তথ্যাদি জেনেছি?

গ) আমি আর্ক স্কুল, প্রিন্স রেস্টুরেন্ট, আমার বাসা ইত্যাদি স্থানে কোন মিটিং করেছি কিনা?

ঘ) প্রিন্স রেস্টুরেন্টের সভায় আমি একটি পেপার প্রেজেন্ট করেছি তাতে "আওয়ামীলীগ ও বিএনপির কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যত নাই। জামায়াতও সফল হবে না বা ব্যর্থ"– এ রকম কোন কথা লিখেছি কিনা? ইত্যাদি।

১০) তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমি নিম্নোক্ত জবাব প্রদান করি:

ক) আমার জানা মতে, মহানগর আমীর আমার বিষয়ে ব্রিফ করার জন্য জরুরী কর্মপরিষদ বৈঠক আহ্বান করে সবার মাঝে আমার ব্যাপারে সতর্কতা জারী করেছেন এবং মহানগরী সেক্রেটারি বিভিন্ন জনকে ডেকে ডেকে আমার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করছেন। অথচ আমি সময় চাওয়ার পরও আমাকে ডাকছেন না বা সময় দিচ্ছেন না। তাছাড়া বৈঠকে তাদের দুজন ছাড়া সেলিম উদ্দিন ভাইসহ অন্য দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন মর্মে আমার কাছে তথ্য নেই। তিনি জানান, আমাকে যে তথ্য দিয়েছে সে সঠিক তথ্য দেয়নি। কর্মপরিষদ বৈঠকে সেলিম উদ্দিন ভাইসহ সবাই উপস্থিত ছিল।

খ) আমি কার মারফত এসব তথ্য অবগত হয়েছি তা জানতে চাইলে আমি তাঁকে জানাই, আমার লিখিত আবেদনে আমি তা উল্লেখ করেছি। এর বাইরে আমি এডভোকেট সাইফুর রহমান এবং পরোক্ষ তথ্যদাতা হিসেবে পল্টন থানা আমীরের নাম উল্লেখ করি।

গ) আমি আর্ক স্কুল, প্রিন্স রেস্টুরেন্ট, আমার বাসা ইত্যাদি স্থানে কোন মিটিং করেছি কিনা প্রশ্নের জবাবে আমি তাঁকে জানাই আমার লিখিত বক্তব্যে আমি বলেছি আমি সামাজিক-সাংস্কৃতিক বহু সংস্থার বৈঠকে অংশ নিয়ে থাকি এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তব্য ও মতপ্রকাশ করে থাকি। সে অনুযায়ী আর্ক স্কুলে এফএসসি (ফোরাম ফর সোশ্যাল কানেকটিভিটি), প্রিন্স রেস্টুরেন্টে বার্ডস (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব রিসার্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট), আমার বাসায়

সিইউএক্স (চিটাগাং ইউনিভার্সিটি এক্স স্টুডেন্টস ফোরাম)-এর সেমিনার ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও জনপরিষদ, ইটিসি ফাউন্ডেশন, স্প্রেড ট্রাস্ট, ফেনী ফোরাম ঢাকা, আরপিডিটি, আরএস সমিতিসহ আরও বেশ কিছু সংস্থার বৈঠকে আমি নিয়মিত অংশ নিয়ে থাকি। এসব সভায় কারা উপস্থিত থাকে জানতে চাইলে আমি তাকে বেশ কিছু নাম উল্লেখ করি।

ঘ) আমার প্রদত্ত কোন পেপারে আমি 'আওয়ামীলীগ ও বিএনপির কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যত নাই। জামায়াতও সফল হবে না বা ব্যর্থ'– এ রকম কোন কথা লিখেছি কিনা? প্রশ্নের জবাবে আমি তাকে জানাই, আমি যদি কোন পেপার প্রেজেন্ট করে থাকি তার কপি আমি তাকে সরবরাহ করার চেষ্টা করবো। সেখানে হুবহু এই কথা লেখা আছে কিনা তা পরীক্ষা করে তাকে জানাবো।

১১) মহানগর আমীর ১০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে মহানগর কর্মপরিষদ বৈঠক করে আমিসহ কয়েকজনের প্রসঙ্গে যে সতর্কতার নির্দেশনা জারী করেছেন তার সত্যতা স্বীকার করেন। তবে সেটা কেন্দ্রীয় সংগঠনের নির্দেশনার আলোকেই করেছেন মর্মে জানান। কেন্দ্রীয় সংগঠন পরিস্থিতির কারণে দেশ ও দেশের বাইরে এ বিষয়টি জানিয়েছে। তবে তারা এ সতর্কতামূলক নির্দেশনায় কারও নাম (অর্থাৎ আমিসহ কারও নাম) উল্লেখ করেননি বলে জানান।

১২) আমি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলি, আমি ও আরও কয়েকজনের নামসহ কর্মপরিষদ বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে এবং আমরা সংগঠন নিয়ে গুলেন মুভমেন্টের আদলে ভিন্ন চিন্তা করছি– এ কথা জানিয়ে স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে রুকনদের নিকট তদন্ত করলে বিষয়টি জানা যাবে।

তারা জানান, হয়তো নির্দেশনা পৌঁছাতে গিয়ে কেউ কেউ একটু বাড়িয়ে বলতে পারে। তবে আমরা তদন্ত করে দেখবো।

১৩) আমি তাদেরকে সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও মহানগর পর্যায়ের নানা অনিয়ম ও অগঠনতান্ত্রিক বিষয় যেমন, মীর কাসেম আলীর উদ্যোগে মিয়া মোঃ আইউব কর্তৃক পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন নিয়ে বিতর্ক, ২০১০ সালে ছাত্রশিবিরের নেতৃত্ব পরিবর্তন নিয়ে অগঠনতান্ত্রিক চর্চা, ভারপ্রাপ্ত আমীর-সেক্রেটারি মনোনয়ন প্রক্রিয়া নিয়ে শূরায় প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া, কয়েকজন এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি থাকা অবস্থায়ও রফিকুল ইসলাম খান ভাইয়ের একইসাথে মহানগর আমীর ও ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হওয়ার প্রক্রিয়া উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করি। মহানগর সংগঠনে কীভাবে অসাম্য এবং বিভেদের চর্চা হচ্ছে, প্রয়োজনে তা লিখিতভাবে বিস্তারিত জানানোর আগ্রহ প্রকাশ করি।

১৪) কথা প্রসঙ্গে আমি ২০১০ সালে ছাত্রশিবির নিয়ে শীর্ষ দায়িত্বশীলগণ যে অগঠনতান্ত্রিক অনিয়মের ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তা নিয়ে "ছাত্রশিবির: আমার

প্রেরণা, স্মৃতি ও বেদনা" শীর্ষক একটি দীর্ঘ লেখা লিখেছি মর্মে অবহিত করি। দায়িত্বশীলগণ চাইলে আমি তাদেরকে সেটা দেবো বলে জানাই। মহানগর আমীর সেটা তাকে দিতে বলেন এবং ফেসবুক বা কোথাও প্রকাশ না করার অনুরোধ করেন।

১৫) কথার সূত্র ধরে আমি তাদের নিকট এও জানাই যে, সংগঠনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ কেন খারাপ হচ্ছে, সক্রিয় জনশক্তি কেন ক্রমে নিষ্ক্রিয় হচ্ছে, সদস্যগণ কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের সম্পর্কে কেন কটু মন্তব্য করছে, দায়িত্বশীলদের সংগঠন থেকে গৃহীত ভাতার পরিমাণ, ব্যক্তিগত বাড়ি-সম্পদ নিয়ে কেন পেছনে পেছনে রসালো অনৈতিক আলোচনার বিস্তার ঘটছে? এগুলো কারা করছে সেটা অনুসন্ধানের পেছনে না ছুটে এ ধরনের চর্চার কারণ গবেষণা করে বের করা এবং পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করার অনুরোধ করি।

১৬) মহানগর আমীর বিষয়টি নিয়ে তারা এখন আর এগুচ্ছেন না জানিয়ে বলেন, সংগঠন পরিচালনা করতে গেলে এরকম সমস্যা হয়। তারপরও আমরা আপনাদের ব্যাপারে কী প্রচার হয়েছে সেটা খতিয়ে দেখবো। তিনি আমাকে এসব বিষয়ে ফেসবুকে কিছু না লিখতে অনুরোধ করেন।

১৭) আমার ব্যাপারে জনশক্তির মাঝে যে কথা ছড়ানো হয়েছে তা নিরসনের জন্য প্রয়োজনে থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে বৈঠক করা এবং আমাকে সেখানে উপস্থিত রাখার জন্য আমি অনুরোধ করি। কেউ যদি আমার প্রসঙ্গে জানতে চায় তাহলে আমার পক্ষে তাকে এসব বিস্তারিত জানানো ছাড়া উপায় থাকবে না, কারণ এটা আমার হক বলে আমি তাদের জানাই।

১৮) আমি তাদের নিকট বিনীতভাবে অনুরোধ জানাই, আমি কোথায় গিয়েছি, কী বলেছি, কী বৈঠক করেছি, কার কার সাথে দেখা হয়েছে ইত্যাদি অসৌজন্যমূলক প্রশ্ন ভবিষ্যতে যেন আর না করা হয়। বিষয়টি নিয়ে আমি বিরক্তবোধ করছি, এ জাতীয় গোয়েন্দাগিরি বা প্রশ্ন অপমানজনক। আমার ব্যাপারে যদি সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ বা প্রমাণ থাকে, তাহলে সে ভিত্তিতে তদন্ত এবং যে কোন সাংগঠনিক ব্যবস্থা আমি মাথা পেতে নেবো বলে তাদেরকে জানাই।

১৯) এছাড়াও বৈঠকে আরও বেশকিছু আলোচনা হয়েছে যা ৪ জন দায়িত্বশীলের নিকট থেকে জানা যেতে পারে। এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি জনাব সেলিম উদ্দিন ভাইয়ের নিকটও কিছু আলোচনা লিখিত আকারে সংরক্ষিত রয়েছে।

২০) আমার সার্বিক আলোচনা ও বক্তব্য সংশোধন ও এহতেসাবের উদ্দেশ্যেই আমি করেছি এবং কেউ যেন আমার কথায় মনোকষ্ট না নেন, সে বিষয়ে আমি তাদের সবিনয় অনুরোধ জানাই।

উপরোক্ত আলোচনার বিষয়টি আমি আপনার নিকট সুবিবেচনার জন্য উপস্থাপন করলাম।

মহানগর দায়িত্বশীলদের বক্তব্য অনুযায়ী আমিসহ কয়েকজনের ব্যাপারে সংগঠনের দেশ ও প্রবাস শাখায় যে নির্দেশনা জারী করা হয়েছে তা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের আলোকেই হয়েছে। অথচ আপনি আমাকে এ বিষয়ে কিছুই বলেননি বা দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। আমি আপনার নিকট মৌখিক ও লিখিত আবেদনের পরও আপনি আমাকে জানাননি যে এটা কেন্দ্রের নির্দেশনা ছিল, বরং মহানগরী আমীরের সাথে আলাপ এবং মোহাসাফা করতে বলেছেন। বিষয়টিতে আমি সন্দিগ্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত যে প্রকৃত সত্য কোনটি?

আমি মনে করি একজন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্যদের ব্যাপারে তাকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, তাকে না জানিয়ে তার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা ময়দানে ছড়িয়ে সংশ্লিষ্টগণ শপথ, শৃঙ্খলা ও সংগঠনের আমানত ভঙ্গ করেছেন।

গত ১৬ নভেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী তারিখে আপনার নিকট যে আবেদন আমি পেশ করেছি তার আলোকে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবারও আপনার নিকট সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। পরকালীন জবাবদিহিতা হৃদয়ে ধারণ করে দায়িত্ব পালনের তাওফিক দান করুন।

আ-মীন।

নিবেদক

মজিবুর রহমান মন্জু
মজলিশে শূরার সদস্য, ঢাকা মহানগরী
ও
সদস্য, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

অনুলিপি অবগতির জন্য (আমীরে জামায়াতের অনুমতি সাপেক্ষে):
১) সদস্যবৃন্দ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ।
২) সদস্যবৃন্দ, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ।

৪.

১৩/০২/২০১৯ ইং

বরাবর
জনাব মকবুল আহমদ
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

মাধ্যম: আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ঢাকা মহানগরী উত্তর।

বিষয়: আমার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচার প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ।

জনাব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আশা করি মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে ভালো এবং সুস্থ আছেন।

আপনাকে অতীতে অনেকগুলো সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে মৌখিক এবং লিখিতভাবে আমি অবহিত করেছি। আজ আবারও আমার প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কিছু প্রচার এবং ধারণা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই-

১) আপনি জানেন যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আমি বিভিন্ন সময়ে আমার মত প্রকাশ করে থাকি। ঢাকাসহ দেশের নানা স্থানে কিছু সামাজিক আড্ডা ও অনুষ্ঠানে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে আমি স্বাধীনভাবে আমার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরি। গত ৪/২/২০১৯ ইং তারিখে আমি আমার ব্যক্তিগত ফেসবুক ওয়ালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বহীনতা ও ব্যর্থতার প্রসঙ্গ টেনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে তরুণ সম্ভাবনাময়দের বেরিয়ে এসে নতুন রাজনৈতিক প্লাটফর্মের সূচনা করার আহবান জানাই। সে আহবানের পর আমার পরিচিত অনেকেই ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে আমার সাথে কথা বলেছেন। আমার কাছ থেকে এর সম্ভাব্যতা, ইতিবাচক, নেতিবাচক বিশ্লেষণ জানতে চেয়াছেন। সম্প্রতি পেশাগত ও ব্যক্তিগত ভ্রমণে সিলেট, কক্সবাজারসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গেলে আমার স্বজন-শুভার্থীদের সাথে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলেছি।

২) অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমি জানতে পেরেছি জামায়াতের সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল জনাব ডা. শফিকুর রহমান ও ঢাকা মহানগরী উত্তর শাখার আমীর জনাব সেলিম উদ্দিনসহ বেশ কিছু দায়িত্বশীল আমার এই মত প্রকাশ ও আলাপ-আলোচনাকে নেতিবাচকভাবে গ্রহণ করে আমি জামায়াতের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির প্রচেষ্টা করছি বলে অপপ্রচার শুরু করেন। আমি আরও জানতে পেরেছি, তাঁরা আপনার অগোচরে সংগঠনের বিভিন্ন শাখায় আমার বিরুদ্ধে মৌখিক সার্কুলার জারী করেছেন। আমার কাছ থেকে কোন আত্মপক্ষ বক্তব্য না শুনে বা জবাবদিহিতা জানতে না চেয়েই তাঁরা সংগঠনের অধঃস্তন শাখাগুলোতে এই মর্মে প্রচার চালিয়েছেন যে, আমিসহ বেশ ক'জন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সংগঠনে ভাঙ্গন সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছি। আপনি জানেন যে শুধু এবারই নয়, ইতিপূর্বেও সম্মানিত জনাব ডা. শফিকুর রহমান সাহেব আমিসহ আমাদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি মিথ্যা সংবাদ ও সরকারের দায়ের করা ষড়যন্ত্রমূলক মামলাকে কেন্দ্র করে একই রকম বিভ্রান্তিকর মৌখিক সার্কুলার জারী করেছিলেন। একটি সেমিনারে আমার লেখা প্রবন্ধকে ভুল ব্যাখ্যা করে তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন আমি নতুন দল গঠনের ষড়যন্ত্র করছি। যার প্রেক্ষিতে আমি আপনার বরাবরে তৎকালীন ঢাকা মহানগর আমীর রফিকুল ইসলাম খান ও সেক্রেটারি জনাব নুরুল ইসলাম বুলবুলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে আপনিসহ আরও ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলেরা বসে বিষয়টি সমাধা করার চেষ্টা করেছিলেন। আমি মনে করি, সিনিয়র দায়িত্বশীলেরা সংগঠনের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার শপথ নিয়েছেন। আমার মতো একজন নগণ্য জনশক্তির আলোচনা ও মত প্রকাশকে যাচাই-বাছাই বা অনুসন্ধান না করে সংগঠনের অভ্যন্তরে এরকম উত্তেজনা ও শঙ্কা ছড়িয়ে দেয়া খুবই অসহিষ্ণু আচরণ। এতে সংগঠনের শৃঙ্খলা ও ঐক্য বিনষ্টের সম্ভাবনা তৈরি হবে। আমার বিনীত আরজ এ বিষয়ে শুধু একপক্ষীয় বয়ান না শুনে, নিরপেক্ষ তদন্ত করে আপনার ন্যায়ানুগ পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

৩) আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আমি জামায়াতের কোন পদস্থ নেতা নই। সামান্য একজন সাধারণ সদস্য মাত্র। জামায়াতের ক্ষুদ্র একটি ইউনিটের বৈঠক ডাকার এখতিয়ারও আমার নেই। সম্প্রতি শেষ হওয়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে আমি জামায়াতের কোন সভা বা মিটিং এ যোগদান করিনি। অতএব, আমার দ্বারা জামায়াতে বিভক্তি সৃষ্টির অভিযোগ খুবই হাস্যকর ও ষড়যন্ত্রমূলক। জামায়াত ঢাকা মহানগর উত্তরের আমীর মোঃ সেলিম উদ্দিন আমি কোথায় যাচ্ছি, কাদের সাথে কথা বলছি, কোন অফিসে মিটিং করছি এগুলো প্রতিনিয়ত মনিটরিং করছেন। যা আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। আমি যা বলছি এবং করছি তা খুবই স্পষ্ট এবং স্বচ্ছতার সাথে করছি। একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে থেকেও আমি নিজের নাম এবং ছবি ব্যবহার করে ফেসবুক চালাই। সরকারের স্বৈরনীতির প্রতিনিয়ত সমালোচনা করি। অতএব, আমার কার্যক্রম সম্পর্কে আমার

কাছে জানলেই হয়। কোন গোয়েন্দাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আমি আশা করি, এ বিষয়ে আপনি সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

৪) আপনি জানেন, ইতিপূর্বেও লিখিত ও মৌখিকভাবে আমি আপনাকে জামায়াতের অভ্যন্তরীণ অনেক অনিয়ম প্রসঙ্গে অবহিত করেছি। বিশ্ব পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলারদের মতামতের আলোকে মৌলিক আদর্শ অক্ষুণ্ন রেখে কর্মকৌশলগত দিকে জামায়াতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের আবেদন জানিয়েছি। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গে জামায়াতের দ্বিমুখী নীতি ও অপরিচ্ছন্ন-ধোঁয়াশাপূর্ণ অবস্থানের অবসান ঘটানোর পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেছি। শুধু তাই নয় ইতিপূর্বে জামায়াতের সিনিয়র নেতা শহীদ কামারুজ্জামান, শহীদ মীর কাসেম আলী, ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকসহ আরও অনেকে বহু আগেই কৌশলগত ও রাজনৈতিক সংস্কারের লিখিত দাবি জানিয়েছিলেন। সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ফোরামে তাঁরা নিয়মানুযায়ী একাধিকবার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই যুক্তিকে শুধু অগ্রাহ্যই করা হয়নি, বরং তাদেরকে সংগঠনে বিতর্কিত ও কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আব্দুল কাদের মোল্লা, মীর কাসেম আলী, ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, সাইফুল আলম খান মিলন, আব্দুল্লাহ মোহাম্মাদ তাহের, জসিম উদ্দিন সরকার, চট্টগ্রামের শাহজাহান চৌধুরী ও অধ্যাপক মফিজুর রহমানের মতো বহু সিনিয়র ও সম্ভাবনাময়, প্রাজ্ঞ দায়িত্বশীল এখানে বঞ্চনার শিকার। তাঁদের সমস্যাগুলো হলো তাঁরা কেউ হয়তো স্পষ্টবাদী, সংস্কারবাদী অথবা জনপ্রিয়। আমার কাছ থেকে এরকম তীর্যক ও স্পর্শকাতর সমালোচনা শুনে আপনি বিরক্ত হয়েছিলেন। আমি তখন বিনয়ের সাথে বলেছিলাম, আপনি এই কাফেলার জিম্মাদার; অতএব, আপনার কাছে নির্ভয়ে, নিঃশঙ্ক চিত্তে মন খুলে কথা বলা আমার দায়িত্ব। আপনি তখন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সংগঠনের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও অভ্যন্তরীণ অসাম্য এবং ভেদনীতি দূরীকরণে কোন পদক্ষেপ নেননি। আমি পরিষ্কারভাবে বিশ্বাস করি, সংগঠনের বেশীরভাগ জনশক্তি নীতি ও কৌশলগত পরিবর্তন চায়। ৭১-এর স্বাধীনতাবিরোধী ট্যাগ থেকে তাঁরা মুক্তি চায়। কিন্তু অধিকাংশ জনশক্তির চাওয়া এখানে উপেক্ষিত। আপনি যদি আমার এ মতামতকে যাচাই করতে চান তাহলে নিরপেক্ষভাবে সকল কর্মীর মাঝে জরিপ চালিয়ে দেখতে পারেন।

৫) আমি মনে করি, সময়মতো প্রয়োজনীয় সংস্কার না করার কারণে জামায়াতে এখন আর কোন সংস্কার বা পরিবর্তন কার্যকর হবে না। এখন জামায়াত যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই তাদের জন্য নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে। জামায়াতের উচিত সকল পর্যায়ের জনশক্তির খোলামেলা মত গ্রহণ করা। কর্মী, শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভানুধ্যায়ী সকলের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া। জামায়াত যদি অতীতের মতো কতিপয় লোকের চিন্তা আর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে আরও ব্যাপক মাত্রায় রাজনৈতিক সংকট জামায়াতকে মোকাবিলা করতে হবে বলে আমার আশঙ্কা।

৬) আমি জানি ভিন্নমত ও সংস্কার আকাঙ্ক্ষী হওয়া সত্ত্বেও আপনি আমাকে খুব স্নেহ করেন এবং ভালোবাসেন। এই মহান আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে গিয়ে আমি আমার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে গৃহ বিতাড়িত হয়েছিলাম। সংগঠন তখন আমার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিল। আন্দোলন সংগ্রামে জেলে গিয়ে, প্রতিপক্ষের দ্বারা নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়ে যতবারই আমি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলাম ততবারই সংগঠন আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল। বছর কয়েক আগেও আমি যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গিয়েছিলাম সংগঠনের দায়িত্বশীল ও ভাইয়েরা আন্তরিকভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ডা. শফিকুর রহমান ও শিবিরের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ইয়াসিন আরাফাত আমাকে বিদেশ পাঠিয়ে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। মেরুদণ্ডে আঘাতজনিত কারণে স্থায়ী শারীরিক সমস্যা হয়ে যাওয়ায় বছরে এক চতুর্থাংশ সময় আমাকে কোন না কোন হাসপাতালে কাটাতে হয়। হয়তো এসব কারণে আপনি আমাকে একটু আলাদা মমত্বের দৃষ্টিতে দেখেন। সেজন্য প্রায়ই ফোন করে শারীরিক খোঁজ খবর নেন। আমি বিশ্বাস করি আমাদের এই আন্দোলন আমাদের পরিবারের চাইতেও আপন। মূলত এসব কারণে আমি চাই এই সংগঠন তার ভেতরকার দুর্বলতা দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিক। ব্যাপক সংস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক। এই আন্দোলনই আমাদেরকে নফস ও অন্যায়-অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শিখিয়েছে। আত্মসমালোচনা করতে, ভয়ভীতি উপেক্ষা করে হক কথা বলতে এই সংগঠনই আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। অতএব, সমালোচনাকে নিরুৎসাহিত না করে সংশোধনকে প্রাধান্য দেয়া দরকার।

উপরোক্ত মত, অনুভূতি এবং পরামর্শ একান্তভাবে আমার নিজস্ব। আশা করি মনোকষ্ট না নিয়ে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মহান আল্লাহ আপনার সহায় হোন, আমীন।

বিনীত
আপনারই স্নেহধন্য

মজিবুর রহমান মনজু

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

‘পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন কর্মকৌশল গ্রহণ সময়ের দাবি’ শীর্ষক চিঠিটির কপি

১

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন কর্মকৌশল গ্রহণ সময়ের দাবী

১. বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ইতিহাসের একটি কঠিনতম সংকটকাল অতিক্রম করছে। ১৯৭১ সালে একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর মাত্র দুই দশকের মধ্যে ইসলামী আন্দোলন পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার মাত্র দু'বছরের মাথায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বাংলাদেশে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এধরনের ঘটনা ঘটেনি। অর্ধশতাব্দীর বেশী কাল যাবত মিশরের ইসলামী আন্দোলন আল-ইখওয়ানুল মুসলেমীন বা মুসলিম ব্রাদারহুড এখনও পর্যন্ত নিষিদ্ধই রয়ে গিয়েছে। তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনকে অনেক বার নাম পরিবর্তন করে অনেকটা সেকুলার-আদর্শ ধারণ করছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার-পরও বাস্তব কারণেই এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করেছে।

২. এত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী স্বনামে আবির্ভূত হয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হওয়ার পিছনের মূল কৃতিত্ব এদেশের তরুণদের। সবার অবদানই ইসলামকে একটা জীবনদর্শন দিয়েছে এবং সংগঠনকে ধরন দিয়েছে। কতিপয় কারণগুলোর ঘটনা ইসলামী আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক শক্তি যুগিয়েছে। জামায়াতে ইসলামী বর্তমান পর্যায়ে এসেছে, তার দ্বিতীয় যে শক্তি তা হলো সারাদেশে জামায়াত ও শিবিরের নিবেদিতপ্রাণ সক্রিয় কর্মীদল।

---

* **সূত্র:** http://imbdblog.com/wp-content/uploads/2015/04/Jamaat-Reform-Proposal-Shaheed-Kamaruzzaman1.pdf

২

সুশিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত ইসলামের জন্যই তারা এই আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া মুসলমান কর্মীবাহিনী পৃথিবীতে খুব কমই দেখা যায়। তৃতীয়ত: জনগণের মধ্যে একটি বিপুল অংশ যাদের সংখ্যা কম করে হলেও ১০-১৫% ভোটার হবে তারা ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সমবেদনা পোষণ করেন।

৩. কিন্তু বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী তথা বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন যে সংকটের মুখোমুখি তা খুবই ব্যতিক্রমধর্মী। জামায়াতে ইসলামীকে দল হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী এবং উক্ত দলের বর্তমান নেতৃত্বকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে বিশেষ এক পরিস্থিতিতে একটি ইসলামী দল হিসাবে বিশ্বের অন্যতম প্রধান একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করার বিরুদ্ধে তথা পাকিস্তান নামক দেশটিকে এককাট্টা রাখতে অবস্থান নিয়েছিল জামায়াত। তখনকার জামায়াত মনে করতো পাকিস্তান একত্রে থেকে সেখানে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ব ও পশ্চিমের অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার অবসান হবে। ~~কিন্তু [illegible]~~ জামায়াতের আরও আশংকা ছিল পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এখানে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু জামায়াতের এবং আরো যারা পাকিস্তানকে

৬

এবং রাখার পক্ষে ছিলেন তারা। মুজিবের বিপরীতে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সেনা ভারতের হাতে বন্দী হয়। সেনাপতি লাঞ্ছিত হয়ে অবশেষে নিজের নতুন স্বাধীন দেশ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে। জামায়াত যদিও পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে ছিল তথাপি বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নেয়। বাংলাদেশে, সমস্ত ধর্মভিত্তিক দল সমূহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২০শে সে জামায়াত নিজস্ব নামে আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করে।

৪. ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসন দাসত্বের, অবসানের, সময় উপমহাদেশ রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল। অনেকেই ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তান দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠিত হয়, দেশকে খণ্ডিত হয়। যারা পাকিস্তান চেয়েছিলেন তাদের অনেকেই ভারতেই থেকে যান। কেউ তাদের, স্বাধীনতা বিরোধী আখ্যায়িত করেনি। যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে সেই মুসলিম লীগের নেতারা ভারতে রয়ে, যান, এবং অনেকেই থেকে যান, এবং অদ্যাবধি ভারতে মুসলিম

৪

লীগ হয়েছে। তাহলে সে স্বাধীনতাবিরোধী হবার কথা নয়। কিন্তু বাংলাদেশের আওয়ামী- স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ ও বিপক্ষ— এমনভাবে প্রচারণা চালাচ্ছে হয়- যার ফলে গোটা জাতিসত্তাই বিভক্ত- হয়ে গেছে। রাজনৈতিক প্রস্তাব দাবী দিলে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সবাইকে মেনে নিয়ে দ্বিতীয় জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা কিন্তু যে জাতি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শোষণের আন্দোলনে সেদিন তারা রাজনৈতিক সীমানা যায়, তার অনুসারে যারা দেয়নি সেই জাতিই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর কাজে ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অবদান, বিভেদ এবং প্রতিহিংসা ও প্রতিহিংসার- দাগ দেশকে ঠেলে দেয়। বাংলাদেশের কল্যাণের মধ্যে বিভাজন ও বিভক্তি বিরাট বাধার হয়ে একটি অনিশ্চয়তাবাদী কৌশল। বাংলাদেশে যাতে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি না হয়, তার জন্যই জাতিকে বিভক্ত রাখা, এই কৌশল গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ যদি রাজনৈতিক হানাহানি মুক্ত হয়, তাহলে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতা অর্জন করবে। বাংলাদেশের বিকাশ করার পথে দখলে রাখতে চায় তারা কিন্তু এটা চায় না যে রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল প্রত্যক্ষ এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হোক বাংলাদেশ। জাতিকে তাই কি অনিশ্চয়তাবাদী জাতি একত্রে, ঐক্যবদ্ধ

৫

একাত্তরের আমাদের অর্জন ম্লান। আর বাংলাদেশকে রাজনৈতিক ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা সহজ হয়েছে। বাংলাদেশকে আর কখনও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি অভিহিত করে দেশকে স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ দুই ভাগে বিভক্ত করে, রাজনৈতিক প্রচারণা চালানো হচ্ছে এবং নতুন প্রজন্মকে সেভাবেই বুঝানো হচ্ছে। অথচ ভারত তো [illegible] বিরোধী এবং [illegible], আসলে, শক্তি বলে কিছু নেই। বরং আমরা ভারতীয় ও মুসলমানদের ঐক্যই [illegible] হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি যা [illegible] এবং [illegible] ভারতীয় [illegible] একপ্রকার করছে, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি এমন যে আক্রমণাত্মক [illegible] দেওয়া হচ্ছে [illegible] প্রমাণ সত্যেও [illegible]। অথচ আমরা [illegible] সাম্প্রদায়িক [illegible] স্বাধীনতা অগ্রাধিকার পাচ্ছেই। তবে আসলে, ভারতীয় সমাজ ভারতীয় ধর্ম বুঝতে পারেন না [illegible]। কিন্তু বাংলাদেশকে ১৯৭১ এ [illegible] যে মত [illegible] পক্ষ ও বিপক্ষ [illegible] মুক্তির [illegible] এবং [illegible] বিরুদ্ধে। [illegible], [illegible], [illegible] ইসলামী [illegible], [illegible] এবং [illegible]। কিন্তু বাংলাদেশকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে,

৬

পরে সকল ইসলামী দল ও সংখ্যাগুরু বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিয়ে, নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। আর, আসলে ১৯৪৭ সালে যদি পাকিস্তান না হতো তাহলে যে আজকে স্বাধীন বাংলাদেশ হতো না। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তানের মাধ্যমে যদি না হতো আজকে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার একটি প্রক্রিয়ার অংশ হতো। তাছাড়া স্বাধীনতা সর্বপ্রকার সর্বদলীয় মর্যাদার পেতো না।

৫. জামায়াতে ইসলামীর জন্য সংকটটি সৃষ্টি হয়েছে এই কারণে যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি দল হিসেবে অংশগ্রহণের পরও পাকিস্তানবাদী শক্তি এবং ইসলামের দুশমন ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মহীন শক্তি এই সংগঠনকে বাংলাদেশবিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী দল চিহ্নিত করে খুব বেশি, কলামে, এর বিপুল অংশে, সাথে চিহ্নিত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকেও জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী দল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাহিত্য, নাটক, উপন্যাস, সকল মিডিয়া, সিনেমা, টিভি চ্যানেল, পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে অনবরত একতরফা জামায়াত বিরোধী প্রচারণা এবং জামায়াতের নেতৃবৃন্দের চরিত্রহনন করা হয়। স্বাধীনতা বিরোধিতার অভিযোগ বা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ খুবই গুরুতর এবং স্পর্শকাতর অভিযোগ। বাংলাদেশে জামায়াত অত্যন্ত সততার সাথে

৭

সৎ ও যোগ্য নেতাদের সমন্বয়ে নিয়মতান্ত্রিক ও গঠনমুখী নেতৃত্বের আন্তরিকতার সাথে পরিচালনা সত্ত্বেও জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করার জোর প্রতিপক্ষ কর্তৃক সুপরিকল্পিত অপপ্রচার করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে খুব একটা আসন না থাকলেও বিশেষ কারণে এমন কিছু না পেলেও জামায়াত রাজনীতি সচেতন এবং এলিট শ্রেণী দ্বারা আদর্শের দেশীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ শক্তি সক্রিয় রাজনীতি চর্চা করে আসছে, এরই ফলে ক্রমেই জামায়াতের ক্ষমতাকে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

৮. দেশপ্রেমিক এবং সমাজের কল্যাণমুখী সৎ মানুষদের এই দলটির দুর্ভাগ্য হিসাবে গণ্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি রং লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে এই সত্যতা নেই বরং বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে দলটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তুরস্কে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ফিলিস্তিনে সেখানকার ইসলামী আন্দোলন দৃঢ় ইহুদীদের বিরুদ্ধে একনিষ্ঠ ভূমিকা অর্জন জাতীয়তাবাদী ইহুদীদের প্রতিরোধে অবদান রেখেছেন। আলজেরিয়া, আফগানিস্তান ও সুদানে সেখানকার ইসলামী আন্দোলনগুলোই স্বাধীনতার অন্যতম ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় ইসলামী আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। পাকিস্তানে সর্বত্রই ইসলাম

৮

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা। ইসলামের নামে যাঁরা পাকিস্তানের এই একই যুক্তিতে যে দেশটি ইসলামের, পাকিস্তান এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে, ইসলামপন্থী অনেকেই পাকিস্তান এবং আন্তর্জাতিকভাবে তাদের দেশটির সংহতি রক্ষার, তাই অসংখ্য পাকিস্তান তাদের নিয়েছে, আর সেজন্যে দেশের পাকিস্তান। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান নেতৃত্ব যারা পাকিস্তান আমলে ১৯৭১ জামায়াতের নেতৃত্বে ছিলেন না এবং অধিকাংশই জামায়াতে সম্পৃক্ত ছিলেন না তখনও তারা স্বাধীনতা বিরোধীতার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং তাদেরকেই যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার দাবি করা হচ্ছে।

৭. এখানে বলা যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি একটি মীমাংসিত ইস্যু। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজেই বিষয়টি নিষ্পত্তি করে গিয়েছেন। পাকিস্তানের ১৯৫ জন সামরিক কর্মকর্তার বিচারের জন্য ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আইন পাশ করা হয়েছে ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ-পাকিস্তান ও ভারত-এই ত্রিদেশীয় চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫ জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীকে ক্ষমা করে পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। এর আগে দালালদের জন্যই যে সাধারণ ক্ষমা দেয়া হয়েছিল তা বিচারাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ৩০শে নভেম্বর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এতে প্রায় ৩৭৫০০ ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে, তবে যাদের হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের মতো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিলনা তাদের মুক্তি দেয়া হয়।

৯

২০০০ এর নির্বাচন হয় এবং এতে ৭৫২ জন বিভিন্ন [illegible] নির্বাচিত হয়। [illegible] অনুগামীদের বিরুদ্ধে সরকার প্রশাসন না থাকায় যখন সবকিছু চলছিল তখন এই একটি পরিস্থিতিতে মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী [illegible] জনগণ সাথে [illegible] বিদ্রোহী [illegible] সরকার আইনের বাতিল হয়। তখন সরকার আইন আর ও সংখ্যালঘু [illegible] আইনী মুক্তিসংগ্রাম, [illegible] শুধুই মুক্তিসংগ্রাম হওয়া। কিন্তু এখনও [illegible] ৬ [illegible] আমরা আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধ হিন্দু সম্মান পায়নি। তবে সময় [illegible] একটি মুক্তিযুদ্ধের মত একটি স্বাধীন সার্বভৌম এবং সাম্প্রদায়িক হিন্দু এখানে পুনরুদ্ধার সমান সম্মান অর্জন হলো? বিষয়টি খুবই পরিস্থিতির বাংলাদেশের জনগণ, যারা প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে মুক্ত এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে [illegible] [illegible] সমানে আসার হয়।

৮. ২০০১ সালের নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্যের ফলে আওয়ামী লীগের বিরোধী [illegible] বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব [illegible] যদি অব্যাহত থাকে এবং আরো সম্প্রসারিত হয় তাহলে ভারত [illegible] [illegible] বা [illegible] [illegible] [illegible] আওয়ামী [illegible] হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ এই বিষয়টি এখনো [illegible] [illegible] বুঝতে পারছে। এর দিকে তারা [illegible] [illegible] যে, "আওয়ামী লীগ এবং [illegible] দল বিএনপির মত একটি দুর্নীতিগ্রস্ত [illegible] ভোট [illegible] আওয়ামী লীগের [illegible] [illegible] [illegible]। আওয়ামী লীগ [illegible] বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট থেকে বের হয়ে আসে। অন্যদিকে তারা বিএনপিকে [illegible] [illegible] 'আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একটি দল। আওয়ামী লীগের দাবি [illegible] [illegible], মুক্তি–

১০

হবেনা। স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতকে সাথে নিয়ে আমাদের দেশ চালাচ্ছেন, এমনটি হয়নি। যুদ্ধাপরাধীদের, মুক্তিযোদ্ধা [illegible] আমাদের মন্ত্রিসভায় বসিয়েছেন। তাদের এই দুঃসাহস, যাদের [illegible] কোটি শহীদের রক্তের সাথে না হলেও বিএনপির কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধার মতো তার চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। বিএনপি শুধু ক্ষমতাসীন দলের নিকট বিএনপি-জামায়াত জোটের মত এমন কিছু উচিত নয়। মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এমন আরো যুক্ত হওয়া উচিত ছিল তার আগেই ছিল। যেহেতু জামায়াত ও বিএনপি-জোট যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক বিএনপির হয়ে এবং বিরোধিতাকারী এবং ক্ষমতায়, অংশীদার হয়েছেন যেহেতু বিএনপির সাথে তাই একসূত্রে, ইসলামে জামায়াতকে দায়ভার নিয়ে সমর্থন হবে তা ফলত: বিএনপিকে জোটবদ্ধতার দায়ভার বহন করতে হবে।

৯। আওয়ামী লীগের পক্ষে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাথে ১৯৯৬ সালে জামায়াতের অবস্থান বিএনপি সরকার বিরোধী আন্দোলনে সময় এবং পর্যায়ে জামায়াতের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জামায়াতের অবস্থান সময়, আন্দোলন সময় বিএনপি জামায়াতকে সাথে নিয়ে না দেখে আওয়ামী লীগের দিকে ঝুঁকে [illegible]। আওয়ামী লীগের অনেক চতুর্থে সাথে জামায়াত ও জাতীয় পার্টিকে সাথে নিয়ে, যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তুলে এবং রাজনৈতিকভাবে বিএনপিকে পরাজিত করে। পরে ২০০১ সালের নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোটকে সাথে নিয়ে, ক্ষমতায় আসতে পারেন।

২২

বাংলাদেশে ৩০০ আসনেই নির্বাচন হবে। নির্বাচনে [illegible] নিরাপত্তা দেখা যায় প্রায়ই অনেক জেলায় [illegible] হিন্দুদের ও [illegible] ভোটের অধিকার [illegible] হয়। যদি কোন সমস্যা হয় এবং হিন্দুরাও বাংলাদেশে ভোট [illegible] না হয় তবে [illegible] স্বাধীনতার ১৯৭১ সালে নির্বাচনে [illegible] সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের। ২০০১ এর নির্বাচনে হিন্দুদের-বাঙালির ভোট [illegible] [illegible] নির্বাচনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে [illegible]। [illegible] [illegible] বিএনপি এবং তাদের [illegible] [illegible] যুদ্ধাপরাধী [illegible] [illegible] [illegible]।

২০. বিচার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ইস্যুটিকে একটাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই ইস্যুকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নির্বাচনে [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং তাদের, [illegible] বিচার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, ইস্যুটিকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ২০০৩ [illegible] [illegible]

১২

আইনজীবী সংগঠনসমূহ নয়, বুদ্ধিজীবীগণ, বিদেশি, অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষক-ইত্যাদি নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ মানুষও, বস্তুতঃ বহুতর বিকৃতি, জামায়াত এই ইমেজ তৈরি এখন এর দায়ভার আমার মনে হয় যাতে সেক্যুলারপন্থী কোন যুদ্ধাপরাধ-বিচারের সমর্থক, হয় এর অপরিহার্য বিচার দাবি হচ্ছে।

১১. জামায়াতের বর্তমান নেতারা ১৯৭১ সালে ২/৪ জন ছাড়া কেউই জামায়াতের সদস্য ছিলেন না, তাদের অনেকে ছাত্রসংগঠনের দায়িত্বশীল নয়, সাধারণ কর্মী ছাত্রসংঘ ও ইসলামী কোনো দায়িত্বশীল পদে বা অন্য কোনো ভূমিকায়, যুদ্ধেও অংশ নেননি। এসব বিষয়- আন্তর্জাতিক নেতাদেরও জানা কিন্তু রাজনীতিতে এখনো এর বিরুদ্ধে যাতে-অসত্য অপবাদ আরো বিস্তৃতই হচ্ছে। জামায়াতের নেতৃত্বকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে প্রমাণের চেষ্টায়, বিদেশের ট্রাইব্যুনাল ইতিমধ্যেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বিচার প্রক্রিয়াকে তাদের আক্রমণ বিশেষে অবিশ্বাস্য ও মুক্ত-চিন্তা প্রতিবেদন ও রাষ্ট্রসংশোধন, বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা হচ্ছে। বিশেষ বিচার ব্যবস্থাকে স্বচ্ছতা নেই, এবং আন্তর্জাতিক ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল লেজিসলেশনে জামায়াতের পক্ষে কোনো সুযোগ আইন অনুযায়ী নেতাদের দোষী প্রমাণ। বিচার ব্যবস্থায় সংশোধনের কয়েকটি পর ১৯৭৩ সালে প্রণীত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল এক্টের বিধি সমূহ

১৬

এবং সংশোধিত হয়েছে। ১৯৭০ সনে এই [illegible] আইনটি প্রথম জারি করা হয়। এই আইনের সাথে সম্পর্কিত অনেক প্রশ্নের [illegible] নেই। বিশেষত: সেটেলমেন্ট অফিসের এই আইনের সংশোধন করা হয়েছে। সংবিধানেও সেটেলমেন্ট অফিসের [illegible] আইনটি [illegible] (তবে- তার প্রয়োগ হচ্ছে (সংবিধানের, প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে) সরকার, যেখানে যেখানে প্রয়োজন, তা বিভিন্ন নামে প্রয়োগ করে আসছে বিভিন্ন ভাবে।

১২. ইতোমধ্যেই সরকার দলীয় লোকজনের দুর্নীতির বিষয়ে, প্রশাসনের- এবং অন্যান্য- সংস্থার সাথে বিবাদ বিস্তারিত দিয়েছে। কিন্তু এমন লোকদের ইতোমধ্যেই- ক্ষমতাসীন- প্রশাসনের [illegible] [illegible] এবং নির্বাচনী এলাকার [illegible] বিভিন্ন [illegible] নিযুক্ত [illegible] [illegible] ক্ষমতার [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়েছে। এই দুর্নীতির [illegible] [illegible] রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। তাদের সরকার, [illegible] নির্বাচনী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রশ্রয় [illegible] [illegible]। মজুতদার-চোরা-কারবারি-অসাধু ও দুর্নীতি সরকার [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible], চাঁদাবাজি, (টেন্ডারবাজি, দখলবাজি, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]। দুর্নীতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

১৪

জামায়াতের মধ্যে, দুঃখ ও [illegible], [illegible] সামাজিক [illegible] [illegible] হয়েছে। [illegible] [illegible] এবং জামায়াত [illegible] - বিরোধী [illegible] এবং বিরোধী [illegible] নেতা-কর্মীদের [illegible]। [illegible] সংস্কারপন্থী [illegible] [illegible] মুক্তি [illegible]। রাজনৈতিক [illegible] [illegible] জামায়াতের অনুসারীদের নেতা-কর্মীদের, বিশেষ করে [illegible] [illegible] [illegible]। দুই [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। জামায়াতের [illegible] [illegible] [illegible]।

১৩. এই পরিস্থিতিতে কি হতে পারে? জামায়াতের ভবিষ্যৎ কি? এক — [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] জামায়াতের নেতৃত্ব [illegible] দিতে পারে। জামায়াতের [illegible] ও [illegible] দিতে পারে। [illegible] [illegible] ও দিতে পারে। এবং

১৫

অনেকগুলি [illegible] সাহায্য দিতে পারে। অথবা, [illegible] বাংলাদেশের সেক্টরে, নির্বাচনের [illegible], [illegible] [illegible] করতে পারে এবং [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] করতে পারে। [illegible] [illegible] বাংলাদেশের [illegible] করতে পারে, [illegible] [illegible] [illegible] করতে পারে।

দুই: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিতে পারে। বাংলাদেশের [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাংলাদেশকে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] করতে পারে।

তিন: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিতে পারে।

চার: বাংলাদেশকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] দিতে পারে এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিতে পারে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাংলাদেশের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের [illegible] [illegible], [illegible]।

২৬

বিচার না হয়, যদি মুক্তিযুদ্ধে হত্যা ও ধর্ষণ অপরাধ ও
স্বাধীনতাবিরোধী এবং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে যে অভিযোগ
রয়েছে তা, তবে সেখান থেকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে
জামায়াত কি আত্মপক্ষ জামায়াতের মুক্তি দাবি আসবে?
বিচার যে বিতর্ক উঠেছে তার জবাব জামায়াতকে
দিতে হবে না জামায়াত আত্মসমর্থন করবে, না
অন্যথায় রাজনীতিতে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার প্রশ্ন এবং
কি আবার হবে? নতুন প্রজন্ম সমাজ জামায়াতকে
গ্রহণ করবে কি না? তাহলে জামায়াত কি
বিষয়টি ভাবতে পারবে?

২৪. পরিস্থিতি যাই হোক বর্তমান সরকার সমস্যা, আমার
অবস্থা, জামায়াতের নেতৃত্বের নেতৃবৃন্দ মুক্তি পাচ্ছেন না এবং
ভোটাধিকার নিশ্চিত। আগামী নির্বাচনে যে সরকার পরিবর্তন
হবেই এমনটি নিশ্চিত করে বলা যায় না। যদি সরকার পরিবর্তন
হয়, তবুও নতুন সরকার জামায়াতের সাথে কি আচরণ করবে তা
নিশ্চিত নয়। বর্তমান সরকার তো জামায়াতকে প্রায় জান্তা
দিয়েছে। জামায়াতকে অফিস খোলা স্বাভাবিক
কাজ করতে দিচ্ছে না। সমাবেশ করতে দিচ্ছে না। সাংগঠনিক
বিভিন্ন সভা-সমাবেশ করতে দিচ্ছে না। অসংখ্য জামায়াত-শিবির নেতা
কর্মী এখনও পলাতক। জামায়াত বা শিবির, কোনোটাই ঘরোয়া
বৈঠক করলেও পুলিশ সেই বৈঠককে গোপন বৈঠক আখ্যা
দিয়ে, গ্রেফতার, অত্যাচার চালাচ্ছে। ইসলামী ছাত্রশিবিরকে

১৭

বিদেশী ও দেশী বই খুব সহজলভ্য হয়ে গিয়েছে। উপরন্তু, হুমায়ুন রেজা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক, সমাজ ভাষান্তরে সম্পন্ন [illegible] এবং ভাষান্তর বৈজ্ঞানিক সমস্যা অবস্থার উন্নয়ন, সহায়ক বিষয় এককভাবে বিশেষ ও বিজ্ঞানের দায়, গ্রন্থের মূল্য, মান নির্ণয়, এতদ্ব্যতীত, সাধারণ, সর্বোপরি ভাষান্তরের বিষয়ে সমূহগত অবস্থার বিশেষ ও উদ্দেশ্যমূলক বিকৃতি প্রকাশ করে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদপত্রও তাদের ব্যবস্থাপনার মূল্য দিচ্ছে। সুতরাং ভাষান্তরের নির্মূল ও খতম করা, মুক্ত করা, দেয়া হচ্ছে। সরকার ও তার নিজস্ব সাহায্যে ভাষান্তরকে খতম করতে চায়।

১৮. এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভাষান্তরের সময়ে কি শব্দ বা কৌশল ব্যবহৃত হতে পারে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিস্তারিতভাবে মন্তব্য জানান।

এক: একটি মৌলিকত্বের এই হচ্ছে আসল যে, কোথাও কোন পরিবর্তন কি হয় বা ভাষান্তরের প্রয়োজন কি হয়। যে অবস্থায় ছিলাম সে অবস্থাতেই অবস্থান করতে চাই। যদি ভাষান্তরের নামে যাও খুশি, সাহেব, মাথা নত, দোষ ত্রুটির উপর দোষ যাচ্ছে কি না যায়। তবুও, মাথা নত, দেশের আগামী নিরাপদ না দিও না।

দুই: যেহেতু রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ভাষান্তরকে সমর্থন অনিবার্য, যেহেতু ভাষান্তরকে স্বাধীনতা বিরোধী এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের দল হিসেবে চিহ্নিত হয়, দলটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যেহেতু এমনকি, সেনাবাহিনী, মন্ত্রী ভাষান্তর সমর্থন

১৮

বিব্রতকর অবস্থা, ভুল বোঝার অবস্থা। নেতিবাচক ইমেজের অবস্থা, যেহেতু বর্তমান জামায়াতের নেতৃবৃন্দ দলের, দেশের, নিজের ক্যারিয়ার ও নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলেছে, বাংলাদেশের জনগণের অনুভূতির সাথে একাত্ম হতে পারেনি, এবং যেহেতু একাত্তরের ভূমিকার কারণে জামায়াত নামটির প্রতি এলার্জি আছে এবং সমসাময়িক জামায়াতের প্রতি আস্থা কম এবং জামায়াতের সততা ও আন্তরিকতা থাকলেও জামায়াতকে অনেকের এমন একটি বলয়ের মধ্যে রেখে আছে যাতে, সাংগঠনিক নিরাপত্তা নেই — এইসব সমস্যার চিন্তা করে দেখা জামায়াতের আন্দোলনের কৌশল পরিবর্তন করা সময়ের দাবী। জামায়াত যেভাবে আছে থাকুক তবে একটি নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা এবং ইতিবাচক যে সংগঠনের আশপাশে তার বিরুদ্ধে সকল প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং জামায়াতবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে গড়ে তোলা। জামায়াত সিদ্ধান্ত নিয়ে, তাদের (লোক দিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলা। অন্যথায় - জামায়াতের [illegible] হবে।) দুইটি বিকল্প হচ্ছে জামায়াতের বর্তমান নেতৃত্ব ১৯৭১ সালের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন নতুন প্রজন্মের হাতে জামায়াতের নেতৃত্ব থেকে তাঁরা সকলেই সরে দাঁড়াবেন এবং সম্পূর্ণ নিউ জেনারেশনকে জামায়াত গঠন করুক। নতুন নেতৃত্বের হাতে জামায়াতকে ছেড়ে দেয়া এবং যেহেতু ১৯৭১ সালের ভূমিকার কারণে অনেকের জামায়াতের উপর, সুযোগ নয় হচ্ছে তাই এদেশে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা এবং শক্তিশালী করা। সুতরাং বর্তমান নেতৃত্ব যদি সাহস দেখান তাহলে ইসলামের, মুসলমানদের, দেশের কি বাধা? তবে ইসলামের, দেশের সবাই খুশী হবে জানি, কিন্তু

১৯

ঔপনিবেশিক বা ইসলামিক শক্তির অভিযোগসমূহ কোন প্রকার হচ্ছেনা।

২৩. এখানে উল্লেখ্য যে ইসলামী দলগুলির নতুন সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে। পুরানো কোন সংগঠন হলে বিচ্ছিন্নতাবাদ, মৌলবাদ এর অভাবেই সুযোগ পেতনা। দলগুলির, যেহেতু ইসলামী আদর্শবাদের প্রবীণ নিষ্ঠাবান যেহেতু, এই দলগুলোতে বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাসী শক্তি। দলগুলোর, ভাবধারায় সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদী ভেতরেই বেশী অন্তর্নিহিত। দলগুলোর, বাইরে তাদের সাধারণ বিশ্বাসের দলগুলোর মধ্যে অনেক বেশ সংগঠিত আছে তাদের, হাতে কোন আদর্শ নেই। ক্ষমতাসীন যে ক্ষমতা, যেতে অন্যান্য দলের ও ব্যক্তিবিশেষের নেতৃত্ব দাবী ওরা দলসংগঠনের কাজকে তেমন কিছু নেই। তাঁরা মার্কস, লেনিন, মাওসে তুং, ঠাট কালচার, মিথ কালচার ও অন্য সংগঠনের নীতিকে প্রাধান্য। উপরন্তু ব্যক্তি পূজার যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি তাদের মধ্যে লোকের উপায় হতে হলে আদর্শিক রাজনীতির কোন বিকল্প নেই।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, সমাধান, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের বিষয় জানতে হবে। দলগুলোর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব-কর্মী যে যাই আসুক হবে। জ্ঞান চর্চা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, খেলাধুলা, সাহিত্য সংস্কৃতি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উন্নত নৈতিকতা ও চরিত্রগঠনের উপায় অধিকতর গুরুত্ব

২০

প্রয়োগ করতে হবে। সেজন্যই রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা ও সমাজকে পথ দেখাতে হবে।

২৭. জামায়াতের সামনে যে তিনটি বিকল্প-এর কথা আমি উল্লেখ করেছি আমার মতে প্রথম বিকল্পটি হবে যদি দ্বিতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করা হয়। জামায়াত যেহেতু ৬০ বছরের অধিককাল থেকে বাংলাদেশে কাজ করছে এবং দেশের ভোটারদের ১০% ভোট জামায়াতের একটি সমর্থন জামায়াতের প্রতি আছে তাই এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে জামায়াতের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। তাছাড়া বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি যে একটি অবস্থান তৈরি করেছে তা জামায়াতের আন্দোলনেরই অবদান। জামায়াতের সাথে অনেক সংগঠন, একটি আন্দোলন, সমাজে রয়েছে এবং জামায়াতের প্রবীণ নেতা-কর্মীরা জামায়াতকে এই কাজে আরও সহায়তা, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক এবং সমাজ-কল্যাণমূলক জামায়াত সংগঠনের, সংস্থার যে ইসলামী দাওয়াত, সহায়তা করতে পারবে। জামায়াত যদি একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা নিজের সর্বাত্মক শক্তি নিয়োজিত করে এবং সেই সাথে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, তাহলে সেই প্লাটফর্মকে রাজনৈতিক ভাবে সহযোগিতা প্রদান করতে পারবে না।

২৮. জামায়াতের যত সমালোচনাই উঠুক না কেন শক্তি থাকবে ততদিন জামায়াতকে অযথা দোষ দিয়ে কোন কিছু করা উচিত হবে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে লোকজন যতটুকু চায়, ইসলামী জামায়াত

২৯

দিতে হবে। কিন্তু বিভাজিত স্বাধীন হতে দেয়া যাবে না। ১৯৪৬ সালে
পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে [illegible] উঠেছে, বাংলায়
প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার [illegible] মুসলমানদের একটি
স্বাধীন আবাসভূমির স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ও সোচ্চার সেই সময়
নতুন একটি দল বাংলাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের
ভারত বিভাগের আগে [illegible] সম্মেলনে [illegible]
[illegible] বাঙালিদের [illegible]
[illegible] প্রদান করা হয়। বাঙালিদের প্রতিশ্রুতির
[illegible] হিন্দুমহাসভা [illegible] পাকিস্তানের [illegible]
বাঙালিদের একটি বড় অংশ [illegible] যান। তাদের
[illegible] নিয়ে [illegible] যান।
কিন্তু পাকিস্তানে বাঙালিরা তা [illegible]
পরিবর্তন আনে। বাঙালিরা রাজনৈতিক [illegible]
[illegible] নেয়। অর্থাৎ বাঙালিদের [illegible]
[illegible] পরিবর্তন আনা হয়। এ সময় বাঙালিরা ধর্মনিরপেক্ষ-
তার [illegible] ভাবতেন। কিন্তু [illegible] হয়
[illegible] ধর্মনিরপেক্ষতার
[illegible] হয়। [illegible] বাঙালিরা
[illegible] দিতেন। [illegible] বাঙালিরা
[illegible] না। [illegible]
[illegible] বাঙালিদের-
[illegible] অনুমতি [illegible]
[illegible] বাঙালিরা হিন্দুদের বাঙালিরা [illegible]

২২

অর্থাৎ স্বাধীন জামায়াত হওয়ায়, তারা নির্বাচনে অংশ নিয়ে থাকে। এতদসত্ত্বে, জামায়াত তার আমীর দলীয় প্রার্থীর নির্বাচনে মনোনয়ন দিত না। এখন এই নীতির পরিবর্তন করা হয়েছে। আমীর নিজেও মনোনয়ন নেন এখন। মহিলাদেরকে সংসদে সরাসরি নির্বাচিত করা হতো না। এমনকি নির্বাচনে মহিলাদের ও মনোনয়ন দান হয়েছে। বিগত উপজেলা নির্বাচনে ২৪ জন মহিলা প্রার্থীকে জামায়াতের এবং তাদের ১২ জন নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। জামায়াত নির্বাচনী প্রচারণায় আগে কখনও ছবি ব্যবহার করতো না। এখন ছবি ব্যবহার করে। ইতিপূর্বে সংবিধান মতে অমুসলিমদের জামায়াতের সদস্য হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। এখন থেকে অমুসলিমরাও স্বাধীন জামায়াতের সদস্য হতে পারবেন। জামায়াতের মহিলা সদস্যদের মধ্য থেকে মজলিসে শূরায় সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি কর্মপরিষদ পর্যন্ত, অর্থাৎ মজলিসে এবং কর্মপরিষদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের একটি নীতি গ্রহণ করা হয়।

১৯. জামায়াত বর্তমান সময়ে যে ইস্যুগুলো, গুরুত্বপূর্ণ মৌলবাদী হয়েছিল তাদের অনেকের সাথে জড়িত এর অনেক বিতর্কের কারণে সংগঠনের কর্মীরা হিংসাত্মক ও দুঃখজনক ঘটনা। এটা কোন ইস্যুতে নিন্দিত নয়। বরং আলোচনার মাধ্যমে ইস্যুগুলোর সমাধান সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনায় হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি ইস্যুর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইস্যুগুলোর পুনর্বিবেচনা

২৩

[illegible] নির্বাচন করেছেন। [illegible] এবং নির্বাচনেও [illegible] কোয়ালিশন সরকারও [illegible] নির্বাচনের [illegible] কোয়ালিশন সরকারও [illegible] প্রধানমন্ত্রী [illegible] প্রধানমন্ত্রী [illegible]

২৪

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

২০। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

২৫

এই রাজনৈতিক বিবেচনাটি বিলম্বে গ্রহণ করেছিলেন, যেহেতু আমরা আপাতত আর প্রতিনিধিদের একটা একমাত্র [illegible] [illegible] হতে পারি, যেহেতু আমাদের আদর্শ বিজয়ের জন্য অতিক্রম করে এখন একটি ক্ষমতা দিয়ে বিচার আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেহেতু সময় ও এবিষয়ে আমরাই একটি কিছু করতে বাধ্য করছেন, এবং যেহেতু কিছু না হলেও সমস্ত রেখেছি ও [illegible] ক্ষমতা দুর্নীতি হয়েছে এবং আমাদের একক্ষেত্রে নেতিবাচক চিন্তার সৃষ্টি করা হয়েছে, যেহেতু সাম্প্রতিক বিবেচনায় নতুন [illegible] ও [illegible] নির্বাচন দ্বারা আমাদের সমাধান হবে। আমরা যদি নতুন [illegible] সৃষ্টির পথ এই ইতিহাস আমাদের জন্য প্রতিজ্ঞা এবং আমাদের ইতিহাসের জন্য কাজ হয়ে যাবে। যখন এক বিপুল সংখ্যক সমর্থন করে আমরা আমাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের। আমাদের আত্মসম্মান সম্মান রক্ষা করে [illegible] [illegible] ঘোষণার দায়িত্ব। আমাদের, দৃঢ় প্রত্যয় বিবেক এক জাতির জীবন বিবেচিত, মুক্তি হয়েছে, স্বাধীন হয়েছে। আমাদের দেশ জীবন ও যৌবন এই জাতি নিবেদিত করে দিয়েছি। সুতরাং এখন আর, যে বিবেচনায় উদ্ভূত হয়েছে সেগুলো হয়েছিল যখন আমরা আমাদের প্রস্তাবিত হবে। তখন বিবেচনা করা যায়। সুতরাং সময় হয়েছে আমাদের কাজ করতে হবে। তিন বছর যে বিবেচনায়, উদ্ভূত গ্রহণ করেছে

২৬

সমাধান নয়। শুধু সংগঠনের অভ্যন্তরীণ [illegible] নয় বরং আন্তর্জাতিক
ইসলামি [illegible] [illegible], বলা যায় অন্তরায়। তাছাড়া [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যায়। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করতে হবে।

২৯. ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible]। [illegible] ও [illegible] [illegible] করতে হবে।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] হচ্ছে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু নেই। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] কিছু [illegible] ও [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হওয়া উচিত।

৩০: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করতে হবে।
[illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]
করতে হবে। [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করতে হবে। [illegible] [illegible]
[illegible] ও [illegible] [illegible], [illegible] কিছু [illegible] [illegible]
এবং [illegible] [illegible] ও [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible]
[illegible] [illegible] করতে হবে। [illegible] [illegible]
কিছু [illegible] [illegible] করতে হবে।

দুই: [illegible] [illegible] [illegible] করতে হবে।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

N.B. [illegible] AKP ২৩ - [illegible] IRD ২৩ [illegible] [illegible] [illegible] website [illegible]

২৭

প্রতি ডিপার্টমেন্টের [illegible] দুইজন [illegible] নির্বাচিত হবে। একজন [illegible] হবেন এবং অপরজন হবেন তার [illegible]। [illegible] ডেপুটি ডাইরেক্টর হতে হবে।

[illegible]

তিন: এখানে [illegible] থাকবে। [illegible]

[illegible] এবং [illegible]

[illegible]

চার: [illegible]

[illegible] এবং [illegible]

[illegible]

[illegible]

পাঁচ: [illegible] ডেপুটি [illegible]

[illegible]

[illegible] হবে।

[illegible] হবে।

ছয়: ডেপুটি ডাইরেক্টর [illegible]

[illegible] হবে; [illegible] হবে।

[illegible]

সাত: এখানে [illegible] ডিপার্টমেন্টের

[illegible]

[illegible]

আট: সকল ডিপার্টমেন্টের [illegible] থাকবে এবং [illegible]

[illegible]

[illegible]। সকল ডিপার্টমেন্টের [illegible]

[illegible]।

২৮

মা; (৩) একটি বিধানের মধ্যে মতৈক্য থাকবে। আমীরের মনোনয়নের ব্যাপারে সংশোধিত, অপ্রত্যক্ষ, প্রথম মজলিশের সদস্য দিবার বিশেষ যদি dispute হলে এই মতৈক্য সুতরাং আরো তার বিধানের মধ্যে এবং বেশন্থ মত বেশী আলিমের হিসাবে সব-মত।

(৪) অমুসলিমদের বন্টিত হবে :- ১) ফিকাহ, ২) মতাদর্শের, ৩) সমাজ, ৪) ফিতনা, ৫) মুসলমান-কাফির ও ৬) দুই সম্প্রদায়

এদের; (৫) বর্তমানে, বড় দুর্বল মুসলিম, মুসলিম, মুসলমান-উলামা, মুরুব্বী-আলেম বলতে হবে। আধুনিকতার বিশ্বাসে লোকের মধ্যে, বড় সমস্যার বিষয়ে, এখন দেশে-অমুসলিম স্বাধীন হবে।

২৭২; (৬) দেশের সর্বত্র- মসজিদ কেন্দ্র — মাদ্রাসা, মসজিদ, কিতাবখানা ইত্যাদির আলোচনা, বৈঠকে, সম্পর্ক দিতে হবে। মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে, সমাজের সাংস্কৃতিক দায়িত্ব হবে — স্কুলের দায়িত্ব সাংস্কৃতিক নয়।

(৭) বাংলাদেশে একটি সংস্কারের মধ্যে দেখতে হিসাবে হয়, আন্দোলনের সমন্বয় প্রতিষ্ঠার জন্য। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংস্কার করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন, আলেম ইসলামী আন্দোলন, দেশে — মাওলানা ইব্রাহীম, ইসলামের প্রচার সমিতি, মুসলমানের জামায়াত, আঞ্জুমান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও আলেমের হিসাব, তাবলীগ জামায়াত সমিতি, মুসলিম সমাজের প্রতিষ্ঠানের, (তাবলীগ জামায়াত সমিতি) আহলে হাদিস আন্দোলন, খেলাফত, আহলে সুন্নত, আল্লামা সিদ্দিকী সাহেব, মুসলিম ইসলামের দুর্গ, আল্লামা ফিরোজ দুর্গ, মাওলানা এমদাদুল, বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোট, মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম, মাওলানা নেজামী, ইসলামী ঐক্যজোট, মুসলিমদের দুর্গ এবং আরো সংস্কৃতির সংস্কার প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন, দলের উদ্দেশ্য সংস্কার করে মানুষ এখানে বিভিন্ন আন্দোলন ছিল সাংস্কৃতিক বিভাজন নয়। এসবের প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক আছে। প্রয়োজনে, এসব প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন আনতে হবে এবং সংস্কার করতে হবে। দেশের সর্বত্র ও সকল দুর্গ ও প্রতিষ্ঠানের আলেম ও সাধারণ, প্রতিষ্ঠানের সাথে করতে হবে। জামায়াত ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের সমূহ

২৭

এই সময়ে আমরা আন্দোলন বিস্তারে চাঁদপুর জেলা [illegible] বিভিন্ন থানায় প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, অধিনায়ক, ওখানেই একটি বাড়ীতে থাকে আমি সেখানকার বিভিন্ন প্রতিরোধের সাথে যোগাযোগ করতাম। আমাদের বিভিন্ন যোগাযোগের মাধ্যমে সেসব প্রতিরোধের খবর জানা প্রতিরোধীদের আমরা অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য। প্রত্যেক জেলায়, প্রথম শ্রেণীর সুনাম ছিল, এখানে [illegible] জেলায়, সর্বত্র সেখানকার, বিভিন্ন দিয়ে সাহায্য।

সেনাবাহিনীর আগমনে, যে কটি [illegible] জেলা প্রশাসন অবরুদ্ধ [illegible] আন্দোলন, [illegible] হয় করায়, [illegible] সাথে [illegible] [illegible] একটির [illegible] — [illegible] যেতে পারি। [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] যেতে আসতে হয়। [illegible] [illegible] [illegible] প্রয়োজনে [illegible] যেতে আসতে হয়। [illegible] ও [illegible] প্রয়োজনে [illegible] [illegible] যেতে হয়।

খেলাধুলা: ক্রিকেট, ফুটবল ও হকি [illegible] সাধারণত হয় ইউনিয়ন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এখানে প্রায়ই [illegible] [illegible] সাধারণ [illegible] যেতে পারে।

স্বাস্থ্য: একটি [illegible] [illegible] [illegible] যেতে পারে, [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible], [illegible]। [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যেতে পারে।

যোগাযোগ: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবস্থা [illegible] হয়। এছাড়া [illegible] ও [illegible] [illegible]।

৩০

সতের: জেলায় জেলা সংগঠনের ভিত্তি নিয়ে একটা রাজধানী কেন্দ্রিক ও মুখ্য সমন্বয় করতে হবে হবে। [illegible] সংস্কারপন্থীদের (বিশেষ ও ইসলামপন্থীদের) তৈরী হবে– বিভিন্ন সংগঠনের ও ছাত্রদের যুক্ত হতে হবে। একমাত্র নির্বাহী ও সাধারণ আদর্শ তৈরী করতে হবে। এজন্য বিশেষ বিভাগে দায়িত্ব চালু করতে হবে।

আঠার: নির্বাহী কমিটি ও সকল অফিস সংস্থাগুলো বর্তমান অবস্থান থেকেই আলাদা চরিত্রে ও কর্মসম্পাদন সম্পন্ন হতে হবে। [illegible]-সরকারের উর্ধ্বে, সাংগঠনিক সংস্কার ও চরিত্রের এবং কাঠামোর পরিবর্তন ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন করতে হবে।

হাত

উনিশ: প্রতিষ্ঠানসমূহ সংস্কারসহ, [illegible] যেখানে সাধারণ ও আর্থিক স্বচ্ছতার নিশ্চিত চালু করতে হবে। এ জন্য বিশেষ সেলকে নিয়োজিত করা হবে– যে দায়িত্ব পালন করতে হবে। উপদেষ্টাদের, আর্থিক বিশেষ কোন নিয়োজিত করতে হবে।

বিশ: তৈরী- প্রোগ্রাম কিংবা ক্লাসিংয়ে, অর্থ এবং ব্যবস্থাপনা- প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে একটি বিশেষ দল, যার দায়িত্ব হবে। এখানে সুনির্দিষ্ট নিয়ে আলাদা সচেতনতা সৃষ্টি করে- তার সুযোগ নিতে হবে। [illegible] এটা সাংগঠনিকভাবে, আর্থিক অনুদান সাধারণের নিকট থেকে নিয়মিত হবে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করবে। আন্তর্জাতিক ইসলামী রীতিতে স্কুলিংয়ে আরও ভাল-মন্দ ঠিক করতে হবে। কিছু আমার প্রশ্ন সামাজিক দৃষ্টিতে।

একুশ: সাংগঠনিক কার্যক্রম নির্বাহী দায়িত্ব পালন অত্যন্ত জটিল [illegible] উচিত। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] unmanageable.

৩১

সামাজিক শান্তি স্থাপন করতে হবে। সুতরাং সুধীজন পরিবৃত্ত সমাজের বিভিন্ন পেশা ও বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের উপর আর্থিক ও নৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে। রাজনীতি প্রসঙ্গে, পরিস্থিতি আনুকূল্যে প্রস্তুতি হতে হবে সামাজিক বিচার ও সমাজকল্যাণমুখী। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এই নতুন সর্বজনীন সূচনায় ব্যাপক, মুক্তচিন্তার আবার আলোচনা ও মতবিনিময় হওয়া উচিত। এজন্য প্রধানমন্ত্রী দেশের জন্য সার্বিক প্রস্তাব আলোচনা দরকার। বাংলাদেশে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে প্রয়োজন সেই সংস্কারমূলক সংকটের মুক্তি আনয়ন করতে হবে। সংকট মুক্তি থেকে সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন আনতে হবে। অর্থনীতি-বিকাশ দারিদ্র্য নির্মূল করে। দেশের ভিতরে এবং বাইরে নতুন বিশ্বকে ঘিরে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। দুঃখ, বিশ্বের সাথে দুঃখের বিস্তার নিরবচ্ছিন্ন বর্তমান কাঠামোতেই যতটা আমার মনে হচ্ছে তার সংস্কার নিশ্চিত করতে পারে। তবে তাদেরও আত্মবিশ্বাস, এখন নেই। বিশেষ করে সবাইকে বুঝাতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর নিজের অবস্থান সমস্যা সম্পর্কে সততার মাধ্যমে নিশ্চিত ইতিহাসে এই দেশে সাম্প্রতিক আলোচনায় নতুন সোপান নির্মাণ এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। আমি বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনা, সঠিক পথ দেখাবে।

সমস্যা, রাজনীতি, ইতিহাস, রাজনীতি: বিষয় আলোচনায় নির্ভর বিষয়, হ্যাঁ, আমার, মন্তব্য,— অনুভূতি সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করছি : ১) বর্তমান সরকার যতদিন ক্ষমতায় আছে আমাদের মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। এমন সরকার পরিবর্তনেরও কোন সম্ভাবনা নেই।

৩২

২) আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের মুক্ত করা হবে এমন কোনো সম্ভাবনাও নেই। আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটবে, সেরূপ আশংকাও নেই। পুরো মেয়াদ পর্যন্তই সরকার ক্ষমতায় থাকবে।

৩) বর্তমান সরকারের মেয়াদের মধ্যেই আমাদের, বিশেষ করে নেতৃবৃন্দের বিচারের নামে প্রহসন হবে। অপর ইস্যুটাকে এমন পর্যায়েই উন্নীত করা হয়েছে।

৪) অবশ্য আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের আদলে কোনো ন্যায়বিচার আমরা পাবো না। আইনটির একটি ধারাতে আইন হওয়ায় আসামি সকলেরই ফাঁসিতে তাই দেয়া যায়। তাদের সংশোধিত রায় দেয়ারই সুযোগ রয়েছে।

৫) জামায়াতের উপর এবং জামায়াতের নেতা হিসেবে আমাদের উপর সুপরিকল্পিত জুলুম হচ্ছে এবং আদালতে দুঃখ প্রকাশ বা নিন্দা জানালেও দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সহানুভূতি আমাদের তথা জামায়াতের পক্ষে অবস্থান নেবে না।

৬) আত্মরক্ষার্থে সমমনা বিভিন্ন দলের সাথে ঐক্য নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক (সঠিক) প্রশ্নে আমরা এখন ইসলামী দলের নেতাদের সমর্থন হয়তো (যে যতো আন্তরিকতার সাথেই থাকুক না কেন) ভেতরে ভেতরে তারা অনুকূলে হবে না।

৭) জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে মানবতাবিরোধী অপরাধে, যুদ্ধাপরাধের মত মারাত্মক ইস্যুতে বিচার দিয়ে শুধু জামায়াতকে সরকার নিষিদ্ধ না করলেও জামায়াতের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হবে। দেশের ভেতরে ও বাইরে জামায়াতকে যুদ্ধাপরাধী, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, স্বাধীনতাবিরোধীদের দল হিসেবে চিত্রিত করবে। ফলে জামায়াতের রাজনৈতিক ভবিষ্যত ধ্বংস হয়ে যাবে। জামায়াতের ভাবমূর্তির পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

৩৩

৮) বাংলাদেশকে নিরপেক্ষ না থেকে সক্রিয় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি
আদায় [illegible] [illegible] [illegible]। সর্বদা চাপের মুখে রাখতে।
৯) এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষ [illegible] সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা
এবং [illegible] নির্ভরশীল বাংলাদেশ- বিপ্লবী সরকারের [illegible] আমাদের
অর্জন [illegible] [illegible] হয়েছে।

১০) বর্তমান সংকটময়, যেহেতু বিশ্ব যে নিস্তব্ধ হয়ে আছে ও
বাংলাদেশ প্রশ্নে [illegible] এমন কোন সক্রিয়তাও দেখায়নি।

১১) বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি, যে রাষ্ট্রগুলো প্রকাশ্যভাবে ও [illegible]
তারা বাংলাদেশ প্রশ্নে [illegible] [illegible] [illegible] পারেনি। বাংলাদেশকে
স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং কিছু
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হবেনা।

এই অবস্থায় এসে আমরা এখন সময়ের দাঁড়িয়েছি।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য কি?

এক: যে যেখানে আছে। আমরা যেমন আছি তেমনি থাকবো।
(সেখানে এই লোকগুলোই আমাদের আশ্রয় হয়েছে।)
দুই: পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বিপ্লবী [illegible] [illegible]
থেকে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তুলতে। এই সংগঠন সুষ্ঠু ও
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুক্তিযোদ্ধার মত।
তিন: আমাদের সকল শিবিরে [illegible] [illegible] [illegible] হবে
এবং বাংলাদেশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং সম্পূর্ণ

৩৪

নতুন নেতৃত্বের হাতে জামায়াতকে ছেড়ে দেয়া। অর্থাৎ এটাই New generation Jamaat হতে পারে।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় উপরোক্ত তিন অবস্থায় সুস্পষ্ট কারণ নেতৃত্ব আঁকড়ে থাকা, হতবুদ্ধিতা এবং হতাশাবাদিতা। একটি অতিক্রান্ত অধ্যায়কে এড়িয়ে সম্মুখমুখী আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেন।

তৃতীয়: যে সমস্ত নতুন নেতৃত্বের হাতে জামায়াতকে ছেড়ে দেয়া এবং বিবেচনা করা হতে পারে তাঁরা ১৯৭১ সালের বিতর্কিত এবং রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার যে বিতর্ক তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। জামায়াতের অতীতের যেভাবে ভুলত্রুটি করা হয়েছে, জামায়াত সম্পর্কে যে এলার্জি তৈরী করা হয়েছে, তাতে মুক্তিযুদ্ধ, মিডিয়া এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী যেভাবে জামায়াতকে স্বাধীনতাবিরোধী বাংলাদেশ বিরোধী দল হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে নতুন নেতৃত্ব অনেক বেশী সাহসের সাথে, নতুন প্রজন্ম এবং রাজনৈতিক মহলে জামায়াতকে সহজে গ্রহণযোগ্য করতে পারবেন।

দ্বিতীয়: যে সমস্ত কথা উপরে বলা হয়েছে, সবার মনে সংশয়মুক্ত বিবেচনায় এই বিকল্প স্বাভাবিক হবার উচিত বলে মনে হয়। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের ইসলামী আন্দোলনে এই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে বলে মনে হয়। আমাদের সামনে তুরস্ক, মিশর, আলজিরিয়া, সুদান, ইয়েমেন, মরক্কো, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বর্তমানে পাকিস্তানসহ সকল ইসলামী আন্দোলনে পরিবর্তিত কৌশলের

৩৫

নতুন যোগের আন্দোলন আগেই এসেছে মনে হয়। তাছাড়া আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচ্য। সম্প্রতি অনেক দেশে দেখা দিয়েছে ইসলামী আন্দোলন, যেগুলো বিদেশী স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিরোধীতা হওয়া মত অতি সাম্প্রদায়িক চিন্তা অভিযান নেই। এর সাথে সাথেই হয়, যে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের মুখেই সাম্রাজ্যবাদ-আন্দোলনের হওয়া সত্ত্বেও এই দুর্ভাবনাকে আশঙ্কা ও সাম্প্রদায়িক অভিযান আন্দোলনের, তাদের ও মুসলমানদের সাথে বড় রাজনীতি সংঘাত ছাড়া আছে। ইসলামী আন্দোলন-গুলোর আসলে, বিদেশ যুদ্ধ ও সৈনিক আকারে সামনে এসে, নিয়েছে। রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত বিভিন্ন দেশে না থাকায়, মানুষ অনেক কারণেই বিভিন্ন অভিযান সামনে নিয়ে এসেছে বিভিন্ন, সর্বত্রই। যেমন ১৯৭৯ সালে ইরানেও নেতৃত্ব দিয়েছিল, আফগানিস্তানে রাজনৈতিকভাবে সোভিয়েত দখলের বিরুদ্ধে [illegible] যুদ্ধে [illegible], নেতৃত্ব দেয় তো দূরে থাক, আফগানিস্তানে বিদেশ-অভিযান [illegible] যুদ্ধ [illegible] কাহিনী ও [illegible]। আফগানিস্তান, [illegible], সৌদি আরব, [illegible], [illegible] [illegible]। আর রাজনৈতিক [illegible] রাজনৈতিক [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]। আফগানিস্তান, বিদেশ [illegible] অভিযানসমূহ [illegible] বিষয়। [illegible] ইসলামী আন্দোলনের [illegible] [illegible] [illegible]। আমরা নেতৃত্ব থেকে তাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না থাকে। এছাড়া

৩৬

একটি অবস্থান গ্রহণ করলে সাময়িকভাবে আমাদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে অপমানজনক মনে হলেও কোন সার্বিক মঙ্গলের দৃষ্টিতে হবে অনেক ভালো আমার বিশ্বাস। আমাদের আন্দোলনের তো বয়সও হয়েছে। সর্বোপরি আন্দোলনে থাকলেই কি আমরা আর কতটা অবদান রাখতে পারবো? সুতরাং সবাই মিলে দ্বিতীয় যে বিকল্পটির কথা উল্লেখ করেছি তা সামনে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হবে কাংখিত এবং যুক্তিযুক্ত। দোয়া করি, আল্লাহ সুবহানাহু ও তায়ালা আমাদেরকে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

— মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
২৬শে অক্টোবর, ২০১০।
৭ সেল (বকুল), ২নং কক্ষ।
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-২

English Translation of Kamaruzzaman's Letter on the Strategy for Change

This article presents an English translation of a prison letter written by Muhammad Kamaruzzaman, the progressive Assistant Secretary General of Jamaat-e-Islam Bangladesh, to the acting leadership of the organisation. Kamaruzzaman faces an imminent death penalty from Bangladesh's flawed and vendetta-driven War Crimes Tribunal.

The letter was titled Strategy for Change and is dated 26th November 2010, by which time the author had already been detained without formal charge for over four months. It articulates a view from the progressive tendency within the party, concerned for the welfare of its members, the public at large and the political stagnation taking hold of the party.

It met with dismissal by a leadership 'stunned' by the Awami League government's persecution on one side and resistant, or unable, to reform on the other. Following a frosty reception with its intended readership, it was leaked and published in the vernacular daily Kaler Kontho newspaper.

Our knowledge of Muhammad Kamaruzzaman's experience in the dock at the country's War Crimes Tribunal is less developed than those of more headline hitting leaders. A website (http://kamaruzzaman.info) developed by his family goes some way to humanise him and elaborate on the trial proceedings and highlight discrepancies. The son of a Sherpur businessman, Kamaruzzaman turned 19 during the Bangladesh war and later studied journalism at

---

* **Source:** https://web.archive.org/web/20150305175712/http://www.khichuri.org/jamaats-kamaruzzaman-and-his-strategy-for-change-progressive-yet-condemned/

Dhaka University. He denies the charges ranged against him, for which the Tribunal has sentenced him to death.

In recent weeks, Geoffrey Robertson QC, an independent and international authority on crimes against humanity published a report detailing the structural and procedural unfairness of the Tribunal. The report is constructive, inclusive and critical, outlining clear steps for internationalisation, truth and reconciliation on the issue.

Kamaruzzaman's party, despite the rhetoric of its avowed enemies and many of its supporters, is not monolithic. This letter's discussion presents us with the opportunity to listen for internal debates to which the public rarely have access. It is our hope that making this letter accessible to the English-reading audience humanises an individual who has been demonised and persecuted. In order for meaningful societal dialogue to occur, we are required to allow different parties to communicate in their own terms and listen to each other.

Notes on the translation

This letter has been sub-titled for English reading audiences at home and abroad and edited for brevity. The full text of the Bangla language original can be found online. The translation is verbatim, with the exception of editorial notes for clarification that are to be found distinguished by square brackets. The letter precedes a number of major relevant world events, notably the Arab Spring/Winter.

We enter the letter at the point where Kamaruzzaman begins to outline a three-pronged fork in the road for the party, to deal with its current situation. Previously he has introduced Jamaat's experience in Bangladesh with respect to other Islam oriented parties in the Middle East and the extraordinary crisis confronting it. This crisis is discussed as the successful and continual labelling of Jamaat as anti-liberation for the purposes of Divide and Rule. The campaign of vilification is said to have been, and is, most successful amongst the elite, educated class.

Highlighting the strategic public interest basis of Jamaat's alliance with the BNP, and its history, he relates various arguments deployed by the Indian side to try and pull constituent partners apart and how the war crimes issue, used against many people who were not even members of the party during the war is a political instrument in the narrowest sense, and is socially amplified through the media. In addition, the Tribunal is argued to distract the public from political misrule, social degeneration and the release of dangerous criminals into the populace.

Before addressing the three options for Jamaat as he saw them, Kamaruzzaman discusses the government's strategy on the party from where he was in 2010, and that most of the cards were the governments to play.

The long extract can be read here:

A Strategy for Change

Thoughtful and wise decisions are needed to fix Jamaat's strategy under these circumstances.

One of the strategies is just to wait for the end and to see what is in store for Jamaat in future; to just continue and run the organisation as before. If the government terminates its activities against Jamaat then we shall see what we can do at that time. Otherwise, we should not ease our efforts and struggles.

Considering the total picture, it is very important for Jamaat to change its strategy. This is because:

- The government has made Jamaat a political target
- Jamaat has been accused of serious allegations like war crimes and has been branded as the party of war criminals

- A section of our people has reservations, misconceptions and negative impressions of Jamaat
- The image of many Jamaat leaders has been shattered awfully, though they are very popular among party workers and well-wishers
- A section of our people shows an extremely intolerant attitude towards Jamaat
- Most importantly, a considerable part of our population has faith in Jamaat and support Jamaat for its honesty, integrity and sincerity

Another option would be to let Jamaat continue its activities from its current position. However, now it is high time that we built a new political platform and a social movement to contest the orchestrated anti-religious [Islamophobic] efforts.

Jamaat should form this party with the consent of its members. Otherwise it will not be acceptable to the workers and supporters of this organisation.

The third alternative is the retirement of those Jamaat leaders from politics who have been accused of war crimes committed during the Liberation War of 1971, and the reorganisation of Jamaat with entirely new leaders. The leadership of Jamaat should be handed over to the new generation. Since Jamaat has been enduring unjust torture and persecution since 1971, for the sake of the continued development of the country's Islamic movement and for the purpose of increasing its dynamism if the present leadership step aside, then what will the Islamophobic quarters have to say? It is however true that whoever works for Islam will face no shortage of allegations from the anti-religious entities.

It is mentionable here that Islami Chattra Shibir was only able to spread and reach its present respectable status due to its establishment under a new name. The organisation would not have been able to operate under any previous name. However, since Chattra Shibir is the primary recruiting centre for the Islamic

movement, it has been made controversial by the non-religious forces as well. The parties most concerned by the rise of Shibir are the communist forces and the power hungry; hence the prevalence of a torrent of lies and falsehood against Shibir. The other student organisations that work amongst the students lack any viable moral based ideology. They are usually sister parties of the ruling party or other parties solely focused on going to power and based on following respective personalities. Such student outfits have little to offer for the nation and are usually deeply involved in corruption, tender grabbing, possession politics, admission business and seat business among others for their mere existence. If the nation is to business and seat business among others for their mere existence. If the nation is to be recovered from the politics of personality worship, there is no alternative to moral based ideology politics.

Besides reforming Jamaat, reform in the student's wing is also necessary. Students should not work as a political tool and should be kept away from direct political activities. Importance should be given on seeking knowledge, debate, discussion, building character and sound physical and mental health. They must say no to party politics, addictions and narcotics.

I believe it would be wiser for Jamaat to take the second among the three alternative strategies I have mentioned here. Jamaat has been working in this country for more than 60 years and at least 10% of Bangladesh's population support Jamaat. So, they should not do anything or take any step that will ruin their image.

The fact is, the ground for Islamic politics that has been created in Bangladesh is actually an outcome of Jamaat's movement and struggle. Jamaat has developed a passionate relationship with the people of Bangladesh and the senior leaders of Jamaat have contributed a lot to achieve this success. It is thanks to their honesty and sincerity that now Jamaat is the largest and most influential Islamic movement in Bangladesh. If Jamaat uses all of its strength to establish a political platform and tries to organise a social movement, then nobody will be able to directly attack that political platform.

Responding to the Changing Situation

The anti-religious quarter may run massive propaganda campaigns against Jamaat, but it will be a mistake for them to overlook Jamaat. In this extraordinary situation Jamaat has to take the decision of adopting an alternative strategy. Jamaat was established in 1941 when the Pakistan movement was at its peak, after the approval of the 1940 Lahore Resolution. At that time millions of Indian Muslims were dreaming of a separate state of their own. In 1947 even before Partition Jamaat leaders gave directives on their working procedure in a divided India by holding several regional conferences. Although the founder of Jamaat [Maulana Maududi] with some of his followers moved to Pakistan, many of its workers and leaders stayed in India. They continued their activity there but in Pakistan Jamaat brought revolutionary changes to its movement and started open political activities.

At one-point Jamaat did not allow lawyers to be party members [since many of the legal injunctions are not in accordance with Islamic principles of justice] but to cope with reality these criteria was changed and the lawyers were allowed to join Jamaat with full membership. Earlier Jamaat did not participate in general elections, even just to cast their vote. The Indian Jamaat still does not participate in the general elections. Members were allowed to cast their vote only once in its history: when Indira Gandhi imposed the state of emergency in India. In Kashmir, Jamaat is separate from the Hindustan Jamaat. They are independent and they take part in general elections. In the past Jamaat used to nominate only its senior members to participate in elections using their ticket. Now they have changed their mindset and have opened their nomination to their supporters and other workers also. They have decided to send female members to parliament and have even nominated them for elections.

In the last Upazila Elections (2009) Jamaat nominated 24 female candidates and 12 of them won the elections. Then Jamaat did not use photographs of candidates in their publicity materials such as on posters and banners. However, now they are using photographs.

Jamaat has amended its constitution and opened party membership for non-Muslims so now a non-Muslim too can be a registered member of Jamaat-e-Islami. Female Jamaat members can be elected onto the party's advisory council. All these reforms have been undertaken for the sake of the movement to meet the demands of the current situation.

Learning from Transnational Experiences

In today's difficult and challenging situation, it is a demand of wisdom and vision that Jamaat should search for alternative strategies. It is not at all any kind of deviation. Rather it is a positive evolution, which is essential for any kind of political movement. We can take example from the Muslim Brotherhood of Egypt. Without reviving the party, they are taking part in the general elections independently or under the banner of different political parties. The Brotherhood is 'not there' however its existence is everywhere. They have been working for years patiently and participating in the general elections. In Jordan, the Brotherhood have been maintaining a relationship of cooperation with the government and playing an important role in the country's politics and elections; they have participated in the coalition government.

The Brotherhood in Algeria have separated itself from the original Brotherhood and been working as Islamic Front. In Yemen the have been working with traditional Islamic parties under the banner of Al Islah Party. Having been in a coalition government earlier on, now they have left the coalition. In Morocco the Brotherhood have been working as the Justice and Development Party. They are now the main opposition party and have the possibility to return better results in the coming elections. In Sudan Islamists have been working as the Islamic Movement of Sudan and alongside the government of General Hassan Al Bashir. However, there is a conflict with a senior leader and he is not in the government. His name is Dr Hassan Turabi, the former Prime Minister of Sudan.

The Islamic movement in Turkey has changed its name many times. After inter- party split following disagreement with former Prime

Minister Nazmuddin Erbakan, a movement called The Justice and Development Party (AKP) formed and established government; they have been running the country successfully under the leadership of Abdullah Gul and Recep Tayyep Erdogan. They are empowered by the members and resources of the Nur Jamaat movement formed by Bediüzzaman Said Nursî. After winning the recent referendum, AKP leader and Premier Erdogan thanked Fethullah Gulen for his immense contribution [the author writes at a time prior to the AKP-Gulen split]. Fethullah Gulen was one of the leaders of the movements established by Bediüzzaman Said Nursî which has been pushing the Islamic movement of Turkey to a successful future. They have kept themselves behind the scenes. Islamic movements in Indonesia and Malaysia have adopted realistic strategies to cope with the current situation. Therefore, under the current challenging circumstances it is high time for Bangladeshi leaders to take the movement to a new dimension by adopting realistic alternative strategies.

Seizing the Opportunity

There is an attempt to strangle the Islamic movement and eliminate it by bringing false allegations of war crimes and labelling it anti-liberation. We have failed to address or resolve this political conflict; many of us thought that this issue would resolve itself at one time anyway. This matter is being used as a burning issue against us, which was beyond many of our imaginations. The government is determined to do something in this regard. The image of the party and the leadership have been devastated by this issue and the people have developed a negative impression against the party and the leadership. For all these reasons it is now of utmost necessity to adopt a new strategy and a new political approach.

If we fail to adopt a new strategy, history will not forgive us. We shall be responsible to history because we had raised hopes among a large number of people. Hundreds and thousands of people have expressed their solidarity with us. Many of our students and youth have sacrificed their entire life; they have embraced martyrdom, lost limbs and are still fighting for the sake of the movement.

Therefore, if we take the first way and let the movement go as it is, we will prove ourselves a worthless party. We should be on alert beforehand. The third way is also not a solution. Not only the local anti-religious quarter, but the international entities with similarly aligned interests are also a major threat. They are also waiting to hinder our development. For this reason, such an alternative strategy will not prove very helpful right now. Our adopted strategy should keep ensuring the faith and loyalty of the people at the fore.

The situation is critical. We should think neutrally and altruistically. We will not be able to obtain any solutions if we think only from our own point of view. It is not at all harmful if it looks like Jamaat has been broken apart. Rather we should take this path for organising a new movement for the sake of our deen [way of life].

Expanding on the Second Option

1. Considering the Constitution of Bangladesh, we should form an organisation that will not face any constitutional questions. Justice and good governance should be its motto. In this regard the organisation can be formed along the lines of the structure and manifesto of the AKP. However, their structure and manifesto are too repetitive and lengthy. For Bangladesh, it has to be brief and adapted for the conditions and demands of the Bangladeshi populace, and certain issues of public demand have to be highlighted.

2. The concept of a shadow cabinet has to be adopted with an equal number of departments formed corresponding to each ministry. A full member would have to be the responsible person for each department and an associate member would assist them. A central committee would be formed with these members and a single member should not be given more than one role. The organisational structure should be more decentralised.

3. An advisory council would be established and senior citizens, experts and Islamic scholars would be its members.

4. A council of Islamic scholars, or a Shariah Board will exist which will conduct research on various issues and will draw solutions to various problems. There must be dedicated effort to ensure Islamic unity.

5. Nobody would remain as President or District President for more than three terms at a stretch. Bengali language has to be used for party titles and posts. Usage of information technology has to be ensured in all steps of the organisation.

6. Representatives from all professions would have to be included in the central committee and a definite manpower analysis has to be conducted in this regard. Manpower shortage in any particular sector in one year would have to be pre- determined.

7. There would be a secretariat that will observe the function of various departments but will not control their activities. They would coordinate but not enforce anything.

8. There would be a committee in every department. Those committees will run independently. Highest usage of technology would be ensured in the committees.

9. There will be a Legal Aid committee. Besides providing legal assistance, it will solve internal problems of the party and will also work as an arbitrary court on behalf of the centre.

10. The priority should be given to: a) Education b) Social Work c) Health d) Media e) Business and Commerce f) Student Movement

11. In elections, at first priority should be given to local government elections. Potential candidates should run their activities from now on to build personal capacity for the election.

12. Counselling campaigns should be organised at the district level for people of different professions such as lawyers, teachers, businessmen, etc.

13. Jamaat has already established an infrastructure. It has many associated organisations and these should be re-activated. They have been running dimly and now change is essential. They all have resources and gradually they have to be changed and made dynamic. There are many resourceful organisations and trusts at the district level. Educational institutions can be developed into world-class institutions. A plot owned by WAMY [World Association of Muslim Youth, of which Shibir is an affiliate] in Safipur can be utilised to establish an institution of global standards. Besides these the organisations that are working in divisional headquarters can be extended and reinforced. By establishing top quality schools and colleges in every district we can recruit the best manpower of our society.

14. The fact is if we can utilise our existing resources in the mentioned sectors, we will be able to reach a considerable stable stage in our movement within five or ten years. If necessary, we will call back our expatriates to the country and when necessary we will export our resourceful manpower abroad.

15. Cricket, football and hockey teams should be formed under the youth department. Clubs for different sports can be formed.

16. A professional institute for international language training can be formed where students will be able to study different spoken languages such as English, Arabic, French, German, Mandarin, Japanese, Korean, etc.

17. Activities of the University of Thought must continue under any circumstances. It has to be dynamic, extended and reinforced.

18. We can purchase the Daily Bhorer Dak newspaper and it can be converted successfully into a four-page capital centred daily. A pool of journalists has to be developed and they

would be designated to different media (print and electronic). A think tank has to be developed.

19. Children's welfare activities and cultural activities can be run under the current structure but should be more dynamic.

20. A social and working relationship would be developed with the non-Muslim community. A band of highly dedicated workers is necessary in this sector. A group will work dedicatedly for welfare of the indigenous people.

21. A group has to be established immediately by and for the RMG [readymade garment sector] workers. It can be a huge employment opportunity; this sector will prove a lifeline for Bangladesh's economy.

22. A campaign should be launched to drum up support for proportional voting. It is necessary to decentralise governance by dividing Bangladesh into several provinces. 160 million people face towards the capital and this is causing a severe problem for good governance. The movement should be more social than political.

Under these changed circumstances, discussion should be conducted among the members regarding accepting the new strategies. Wholehearted effort is necessary to reach a consensus in this regard.

Jamaat has taught us discipline and we must maintain this within the organisation. We should bring change to our organisation while maintaining this discipline. Our manpower is searching for an alternative strategy. Our country and the international community will welcome the new direction gladly.

Those without foresight or who want to maintain the organisational inertia might oppose the proposal, but they are also very sincere. Everybody should be counselled with patience. Under

this crucial circumstance and at this historical turning point, adopting an alternative strategy by reaching a consensus or at least by the vote of the majority is now what the situation demands

On Being Captive

Here I am writing my feelings once again on my captive life; captivity under false charges, which are the results of political rivalry and the rise of anti-religious politics.

1. There is no possibility of my release until the current government moves from power, which is not at all possible in the near future.

2. There is no possibility that any movement will be able to free us. There is no possibility that any street movement or agitation will be able to overthrow the government.

3. In this tenure of the government some of us will face mock trials because this issue has reached the point of no return.

4. We will not get any justice from the so-called tribunal. It is a black law. The government will be able to do whatever it wants to do with us according to this black law.

5. Many countries may express their regret recognising that Jamaat's leaders are being persecuted, but they will not do anything to support us.

6. The international community may raise questions on the transparency of the trial process but they will not be unhappy to see an Islamic party cornered and weakened by this process.

7. Even though Jamaat will not be banned, the image of its leadership will be destroyed after their trial on war

crimes and sensitive issues like opposing the nation's liberation.

8. Even if the government does not ban Jamaat, they will never permit Jamaat to work in comfort and will always keep the party under pressure.

9. Under these circumstances Jamaat will never be able to become a platform of the mass people; it will be impossible for them to form government by winning a landslide victory in the general election.

10. I can see no possibility for Jamaat to achieve good results in the next election after this term of the government.

11. Due to our love and emotion for the party we cannot think of anything without Jamaat. If anyone wants to do something bypassing the party, misunderstanding and vendetta will be inevitable. That will not be acceptable to our manpower.

Taking Action

We have become stunned at this point in time. Now the question is, what is actually in store for our future?

1. Let it be. We will remain as we are now. (Currently we are following this strategy)

2. Considering the changing circumstances, Jamaat will organise a new platform and remain behind the scenes. This organisation will tackle the anti-religious quarter with wisdom and determination.

3. Among us, those who have been convicted of war crimes will step down from leadership positions and hand over the party reigns to an entirely new leadership.

According to my understanding the first way is actually the act of foolishness and pessimism. A dynamic movement cannot take such an outdated strategy.

We could compromise with the third strategy if we could solve the issue of 1971 politically. However, the way Jamaat's image has been destroyed in the media, in the textbooks and to our youth, it will not be able to revive its image even if it brings new leadership in its pavilion.

According to my thoughts the second strategy is the most pragmatic one. Other Islamic countries have become successful by following this strategy. We have a lot of examples in front of us like Turkey, Egypt, Sudan, Yemen, Morocco, Indonesia, Malaysia and Jordan where the Islamic movement has adopted an alternative strategy.

Beside it we should also consider another point. In no other country have the leaders of an Islamic movement faced such sensitive allegations like war crimes and opposing the country's struggle for independence. We must admit that though the Islamic movement in Bangladesh has the potential to become a successful movement, these allegations have produced a massive obstacle to achieve political success and acceptance. For the time being the opponents of the Islamic movement have succeeded.

We are being tried at present as we have failed to solve this issue politically. We did not lead Jamaat in 1971, and although Jamaat supported it politically, they were not involved with the Liberation War. Those of us who are facing allegations at this moment, we did not participate in war nor were we part of any military or paramilitary body. It is out of the question that we committed crimes like rape, plundering and destruction. Today Jamaat is the victim of political vengeance for being politically active. The allegations against us are all false and fabricated. The government is spreading misconceptions against the Islamic movement by blaming us with false charges.

Therefore, we should resign from our positions so that there will be no chance of confusion and misinterpretation.

If we take this kind of initiative, for the time being it may look like degradation for us but in the long run it will be considered

as an icon of greatness and pragmatism. Many of us are now quite old too. How much can we contribute to the movement at this age?

Therefore, we should think of the second strategy collectively. I pray and hope that Allah will enable us to take the right decision at the right time. Ameen.

Muhammad Kamaruzzaman
November 26, 2010
7 Cell (Bokul), Room No. 2
Dhaka Central Jail, Dhaka, Bangladesh.

পরিশিষ্ট-৩

‘শিবিরের অভ্যন্তরীণ সংকটে জামায়াতের হস্তক্ষেপ’ সংক্রান্ত চিঠির কপি

* চিঠিটি জনাব কামারুজ্জামানের পরিবারের সাথে ঘনিষ্ট একটি সূত্র থেকে সংগৃহীত।

[illegible]

[illegible] Programme [illegible]

[illegible] Immigration [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ঠিক এবং দেরী হয়েছে। অনেক বড় বড় [illegible] সিদ্ধান্ত [illegible] হয়েছে। [illegible] হয়েছে। [illegible] মজলিসে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে। [illegible] [illegible]।

সেক্রেটারী জেনারেল [illegible] জামায়াতে [illegible] হয়েছে [illegible] মত। [illegible] ইসলামী ছাত্র [illegible] ও শিবিরের [illegible] সিদ্ধান্ত [illegible] শিবিরের [illegible] সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শিবিরের [illegible] শিবিরের [illegible] শিবিরের [illegible] [illegible] শিবিরের [illegible] শিবিরের [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible] out [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] concluding [illegible]
[illegible]

ধারাবাহিক ইংরেজি শিক্ষা-কার্যক্রম বিষয়ক সভা ৪ঠা ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, বেলা ১১টা। স্থান: সভাকক্ষ, উপজেলা পরিষদ ভবন, নীলকুঠি। সভাপতি: জনাব মোঃ আবদুল হাকিম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নীলকুঠি। সভায় উপস্থিত ছিলেন ১৭ জন কর্মকর্তা। সভার শুরুতে সভাপতি ইংরেজি শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের মধ্যে ৯টিতে ইংরেজি শিক্ষার ফলাফল জেলা গড়ের নিচে রয়েছে। তিনি ৩১শে ফাল্গুনের মধ্যে একটি কার্যকর পরিকল্পনা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

সহকারী কমিশনার (শিক্ষা) জনাব ফারহানা ইয়াসমিন চৌধুরী ৫ম শ্রেণির ইংরেজি বইয়ের ১২টি পাঠ পুনর্লিখনের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, বর্তমান পাঠগুলো শহরকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে লেখা, যা গ্রামের শিক্ষার্থীদের কাছে অপরিচিত। তিনি ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে নতুন পাঠের খসড়া জমা দেওয়ার অনুরোধ করেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রতিটি পাঠে অন্তত ৩টি স্থানীয় উদাহরণ থাকতে হবে।

উপজেলা প্রকৌশলী জনাব মোঃ রফিকুল আলম ভূঁইয়া ৩১শে ফাল্গুনের মধ্যে ৪টি ইউনিয়নে ৪টি ইংরেজি শিক্ষা কর্নার স্থাপনের ঘোষণা দেন। প্রতিটি কর্নারে ৫০টি বই, একটি ছোট ব্ল্যাকবোর্ড এবং একটি ম্যাপ থাকবে। তিনি বলেন, কাজ শেষে ছবি ও ব্যয়ের হিসাব ৭ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। সভায় ৩৫ হাজার ২০০ টাকা বরাদ্দের কথা জানানো হয়।

সভায় ৩টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথমত, ১লা চৈত্র থেকে ১৫ই চৈত্র পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী ইংরেজি শিক্ষা পক্ষ পালন করা হবে। দ্বিতীয়ত, ৩১শে ফাল্গুনের মধ্যে ৪টি ইউনিয়নে ৪টি ইংরেজি শিক্ষা কর্নার স্থাপন করা হবে। তৃতীয়ত, ১লা চৈত্র থেকে ১৫ই চৈত্র পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী ইংরেজি শিক্ষা পক্ষ পালন করা হবে। সভা বেলা ১টা ৪০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

[illegible]